গল্পময় ভারত



সুশীল জানা



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ হ্যারিসন রোড : কলিকাতা ৯

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

ফাল্গুন, ১৩৬৩ : মার্চ, ১৯৫৭

মূল্য : চার টাকা

প্রকাশক : শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৯। মুদ্রক : শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু, জ্ঞানোদয় প্রেস, ১২ মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯।

উৎসর্গ

স্মৃতি, বাচ্চু ও ক্রান্তিকে

ভূমিকা

এ গল্প সংকলনের শুরু সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদে এবং শেষ হয়েছে বৃটিশ আধিপত্য শুরু হওয়ার আগে—বাঙলার নিজস্ব কথা-কাহিনীর রাজ্যে। এই সুদীর্ঘ কালের সাহিত্য প্রায় সবটাই ছন্দে পাঁচালীতে রচিত—কিছু বা নাটকে, কিছু বা সংস্কৃত গদ্যে। সব বৈচিত্র্য নিয়ে এই বিরাট কালের সৃষ্টি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বিস্ময়কর। সে বিস্ময়ের সবটুকু এখানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি, স্বীকার করি।

পরম লজ্জার সঙ্গে এ-ও স্বীকার করে নিতে হয় যে, জাতির এত বড় একটা বিস্ময়কর ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার কোনও আয়োজন নেই। অথচ প্রত্যেকটি সভ্য জাতিই তার প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তিগুলিকে শ্রদ্ধা ও গর্বের বস্তু বলে মনে করে এবং তাই সেগুলিকে বহু মূল্য উত্তরাধিকার হিসাবে এক যুগ আর এক যুগের হাতে তুলে দিয়ে যায়। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা এই ভাবেই কাল থেকে কালে প্রবাহিত হয়ে চলে, এই ভাবেই একটি জাতির উন্নত চিন্তার ধারা ও সৃষ্টির নৈপুণ্য নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়ে চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই মহামান্য রাজ্যটি রক্ষা করে রাখবার জন্য সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই দেখা যায় তাই নানা আয়োজন—নানা বয়সের উপযোগী করে তারা ওই চিরায়ত বস্তুগুলিকে পরিবেশন করে, আস্বাদন করে। দুঃখের বিষয়, সেদিক দিয়ে আমরা দরিদ্র, আত্মবিস্মৃত।

অথচ এই দারিদ্র্য ও আত্মবিস্মৃতির পেছনে আমাদের ঐশ্বর্যপূর্ণ কত বড় একটা রাজ্য পড়ে আছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের গল্প-কথার রাজ্য! দু'খানি মহাকাব্যেতেই শুধু এই সৃষ্টি-ধারার উৎপত্তি নয়—তারও অনেক আগে, সুদূর কালের ঋগ্বেদে এই কল্পনা ও সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়। সেকালের জীবন-বিশ্বাস অনুযায়ী সেগুলি রচিত, নাটকীয় কথোপকথনে সমৃদ্ধ, বাস্তব জীবনের সঙ্গে আদর্শের সংঘাতও লক্ষ্যনীয়। অবশ্য সে গল্প প্রকৃতি ও মানুষের আদিম উপাদানে রচিত। সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম উপাদান সভ্য ও চিন্তাশীল মানুষের সভ্যতার উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিম জীবন-বিশ্বাসের পশু-পাখি-আগুন, অসুর-রাক্ষস, প্রাণ ও আত্মার উপকথা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে মানুষের কথায়। বৈদিক যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগের গল্প-কথা পর্যন্ত

লক্ষ্য করলেই এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আরও একটি লক্ষ্যণীয়—বৌদ্ধ যুগের রূপকথা 'পদচিহ্নকুশলী'—যেটিকে মনে হয় আমাদের প্রচলিত রূপকথার আদিমতম রূপ—প্রথম রূপকথা। সেখানে কোনও আর্যামী না রেখেই মানুষেতর যক্ষিনীর মাতৃহৃদয়ের প্রতিও ফুঠে উঠেছে কি গভীর মমতা!

এই গল্পের রাজ্য যে শুধু সেকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবলম্বন তপোবন আর রাজসভাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল—তা নয়, সাধারণ গ্রামবৃদ্ধদের মজলিশ থেকে কোশল-কাঞ্চীর অন্দরমহল পর্যন্ত ছিল এর বিস্তার। সেই ধারায় সেই কোন কাল থেকে বয়ে এসেছে কথা-উপকথার 'মানুষ' নায়ক—রাজা আর্থারের মত অসাধারণ মানুষ উদয়ন, সাধারণ মানুষ চারুদত্ত। তাদের নিয়ে রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের চিরায়ত সাহিত্য—শ্রেষ্ঠ নাটক।

শুধু স্বদেশেই নয়, জগতের বহু দেশে ভারতবর্ষ তার গল্প-কথার রত্নগুলিকে অকৃপণ হাতে বিলিয়ে এসেছে। গান্ধারের কোন সরাইখানা থেকে অথবা মণিমুক্তার কোন বাণিজ্যতরণী থেকে কে কবে এগুলিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল জানি নে—তবে ম্যাকসমূলার সাহেব প্রাচীন বৈদিক কথার অনেক ইওরোপীয় সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, আমাদের 'করটক ও দমনক'-কথা সিরিয়া ও আরবে যথাক্রমে 'কলিলগ ও দমনগ' এবং 'কলিলা ও দিমনা' রূপে বেশ বদলেছিল, আমাদের জাতকমালার আরও বহু গল্প ঈশপের হাতে নূতন করে পরিবেশিত হয়েছিল।

এই প্রাচীন রাজ্যের পরিক্রমণ শেষ করেছি বাঙলায় এসে—ভারতে ইংরাজ প্রভুত্বের প্রথম প্রদেশে। তবে আমাদের সংকলনের কাহিনী শেষ হচ্ছে ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব কালে—যখন আমাদের পল্লী-কবি ও কথকের কণ্ঠে গোপীচন্দ্র ও কাজলরেখার করুণ কাহিনী তরঙ্গিত হচ্ছে, গ্রামের মেয়ে ও বধূর কণ্ঠে উঠছে সূর্যের পাঁচালী গান। সময়ের হিসেবে এর পরে পাশ্চাত্য প্রভাবে রচিত হয়েছে আমাদের নূতন ধারার সাহিত্য। এর আগে প্রাচীন যুগ যেন কাজলরেখার মতই তার শান্ত গ্রাম্যতা, নির্বোধ সহিষ্ণুতা ও নিঃশব্দ আবেদন নিয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেছে। সূয্যিঠাকুরের গ্রাম্য বধূটির কান্নার মতই ধীরে ধীরে তা গ্রামের অন্ধকারে চিরকালের মত কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। তবু, সবটি মিলে আনন্দ-বেদনায় বিচিত্র আমাদের এ সাহিত্য। আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে সেই ক্রমপরিণত ও বিস্মৃত গল্পরাজ্যটিকে তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

—লেখক

সূচীপত্র

মধ্য যুগ :

বাঙলা :



সত্যপালন

একদা দেবতাদের রাজ্যে শোনা গেল মহা হট্টগোল। দেবতাদের যতগুলি গোরু ছিল সব কারা যেন চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে। সেই দুঃখে দেবতারা সব 'হায় হায়' করছেন। এবার ভোগের মধ্যে সেরা যে ভোগ দুধ, ঘি, ছানা, মাখন—সব বুঝি বন্ধ হয়।

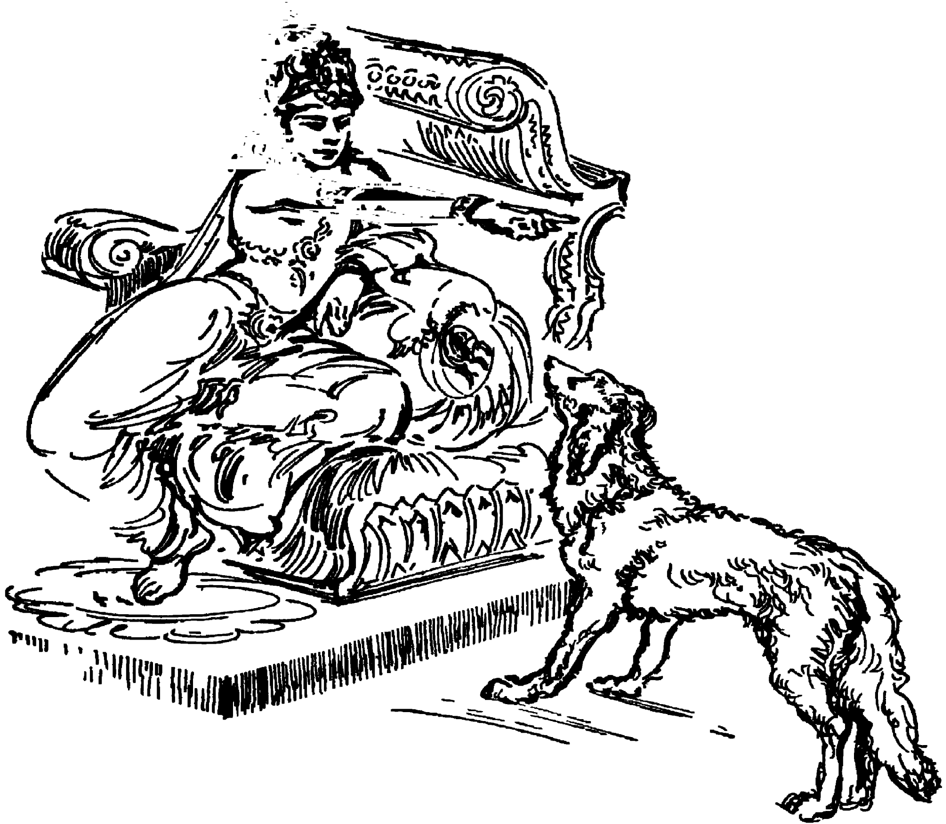
দুঃখে দেবতারা মুষড়িয়ে পড়লেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাঁকে খুশী রাখবার জন্য অপ্সরারা নাচগান শুরু করতে যাচ্ছিল—ইন্দ্র তাদের বকে দিলেন। একে বকলেন—ওকে বকলেন। ইন্দ্রাণী রাগ করে গোসা-ঘরে ঢুকলেন। বসন্ত ভয়ে চির-শীতের রাজ্য হিমালয়ে গিয়ে লুকাল। কোকিল আর ডাকল না। নন্দনকাননের পারিজাত আর ফুটল না। স্বর্গরাজ্য ম্লান।

হা-হুতাশ করতে করতে দেবতারা গেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। দেবরাজ সমস্ত দেবতাদের নিয়ে সভা করে বসলেন। জোর আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত সব দেবতা মিলে ঠিক করলেন—গোরু-চোরের সঙ্গে লড়াই করা হোক।

লড়াই তো হবে কিন্তু সে চোর কোথায়? সে চোরই বা কে? এটাই যে এ মহা মুশকিলের কথা। দেবতারা ফাঁপরে পড়লেন।

দেবসভার এককোণে কুকুর-জননী সরমা কুণ্ডলী পাকিয়ে দেবতাদের সমালোচনা ও হুঙ্কার শুনছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাকে

ডেকে বললেন, 'সরমা, চোর খুঁজে বার কর। এ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।'

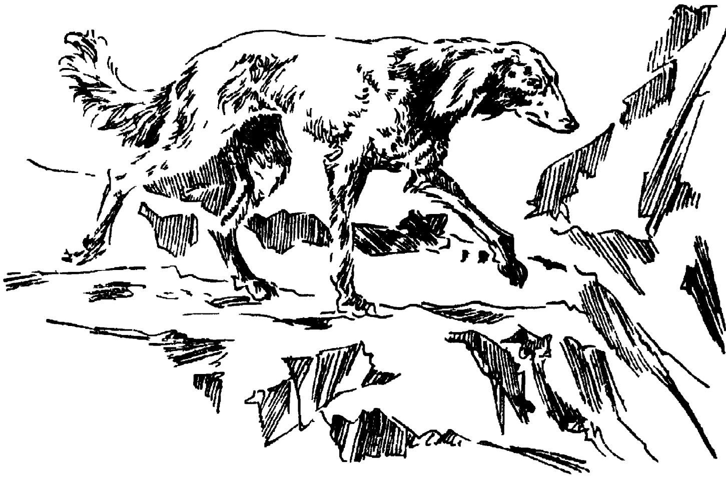


দেবরাজের কথায় সরমা উঠে বসল। কিন্তু তার মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। মনে তার দুঃখ। দেবলোকের কুকুর হলে কি হবে, তার ভোগের মধ্যে দেবতাদের দুধ, ঘি, ছানা, মাখনের ছিটেফোঁটাও নেই। সময় ও সুযোগ পেয়ে সে মনের দুঃখের কথাটা বলে ফেলল, 'দেবরাজ ইন্দ্র, যেমন করে হোক গোরুর সন্ধান আমি এনে দেবই। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের একটু করে দুধ খেতে দেবে বল।'

ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, তাই হবে! তুমি চোর আর গোরু খুঁজে বের কর।'

শিকারী কুকুরের মত সরমা ছুটল গোরুর সন্ধানে। অনেক পাহাড় নদী জঙ্গল পার হয়ে সরমা ছুটল। নদী তাকে ভয়ে পথ ছেড়ে দিল, পাহাড় জঙ্গল তার পথ করে দিল। অনেক দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে সরমা ক্লান্ত। তবু তার বিরাম নেই। দেবতাদের কাছে কথা রাখতে হবে। তা ছাড়া, এতদিন পরে তার সন্তানদের কপালে একটু দুধ খাবার সুযোগ এসেছে—তা নষ্ট করলে চলবে না। সরমা দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে গোরু খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় দেবতাদের গোরু?

হঠাৎ একদিন সে পাহাড়-ঘেরা এক দেশের সীমান্তে এসে গোরুর ডাক শুনতে পেল। একটি দুটি গোরু নয়—একপাল গোরু-



বাছুরের ডাক। সরমা থমকে দাঁড়াল। কান খাড়া করে শুনল—পাহাড়ের দিকেই যেন গোরু-বাছুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। গেল সে পাহাড়ের দিকে। কিন্তু কোথায় গোরু? পাহাড় জঙ্গল সে পাতি পাতি করে খুঁজল, গোরুর দেখা পেল না। অথচ পাহাড়ের

দিকেই বাতাসে যে গোরুর ডাক কাঁপছে। সরমা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যেমন করেই হোক এ রহস্য ভেদ করতে হবে।

পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে সরমা চলল লোকালয়ের দিকে।

সে রাজ্য হল পণি নামক অসুরদের। তারা বণিক—ধনবান। সরমাকে আসতে দেখে তারা অবাক হয়ে দাঁড়াল। এমন সুন্দর কুকুর তারা কখনও দেখেনি। যতই হোক, কুকুর-জননী সরমা দেবলোকের কুকুর! তার রূপে পথ আলো। সবাই তাকে আদর করে ডাকল, যত্ন করে খেতে দিল। সরমা পেল নূতন আশ্রয়, ভালো ভালো খাবার আর সকলের আদর যত্ন। পণিদের সঙ্গে সরমা দিব্যি বন্ধুত্ব করে নিল। তারপর ধীরে ধীবে তাদের মাঠ-ঘাট, ঘর-দুয়ার সব জেনে ফেলল। কিন্তু গোরু কোথায়? সেটাই সে কোন রকমে জানতে পারল না। অথচ গোরু-বাছুরের ডাক শোনা যায় পাহাড়ে জঙ্গলে আকাশে বাতাসে।

পণিদের ক্ষেতখামার, ধনসম্পদ পাহারা দিতে দিতে একদিন সে গোরুগুলোর সন্ধান পেয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখল পণিরা দেবতাদের গোরুগুলোকে পাহাড়ের গভীর গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছে।

এতদিনের এত সন্ধান, এত কষ্টের শেষ হল। সরমাকে তখন আর পায় কে! পণিদের দেশ ছেড়ে একদিন সে ধরল আবার দেবলোকের পথ।

পণিরা অবাক হয়ে শুধাল, 'সরমা, কোথায় যাও।'

সরমা বলল, 'দেবরাজ ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি এসেছিলাম। দেবতাদের অনেক গোধন তোমরা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছ। ইন্দ্রের হাতে এবার তোমরা মারা পড়বে। দাঁড়াও একবার দেবলোকে ফিরে যাই।'

পণিরা বলল, 'সে যে অনেক—অনেক দূরের পথ। এ পথে আসতে হলে, একবার পেছন ফিরে তাকালে আর আসা যায় না। তা ছাড়া, পথের মাঝখানে আছে কত বড় বড় নদী।'

সরমা বলল, 'নদীর জল আমাকে ভয় পায়।'

পণিরা তখন সরমার রূপ গুণের সুখ্যাতি করে তাকে ফিরাবার চেষ্টা করল, 'শোন শোন সুন্দরী সরমা, আমাদের কাছে ফিরে এস। দেবলোক থেকে যখন এতটা পথ এসেছ তুমি—যে কটা গোরু চাও নাও। ভেবে দেখ একবার—বিনা যুদ্ধে এ সব গোরু কেউ কাউকে দেয় না।'

এ প্রলোভনে সরমা ভুলল না। বললে, 'ইন্দ্র তোমাদের পাপের শাস্তি দেবে। তাঁর শক্তি তো জান না!'

পণিরাও তখন ভয় আর হুমকি দেখিয়ে বলল, 'আমাদের গোরু-ঘোড়া ধন-সম্পদ আর এই দেশ—সব বড় বড় পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আমাদের মহাবীর যোদ্ধারা সে সব রক্ষা করছে। তা ছাড়া আমাদের কত রকমের ধারালো সব অস্ত্রশস্ত্র আছে জান?'

সরমা বলল, 'ভালোয় ভালোয় গোরুগুলি ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের দর্প চূর্ণ হবে।' এই বলে সরমা দেবলোকের দিকে চলতে লাগল।

বিপদ বুঝে পণিরা নানাভাবে সরমার মন ভাঙাবার চেষ্টা করল। নানা রকমের লোভ দেখাল। বলতে লাগল, 'শোন শোন সুন্দরী সরমা, বুঝতে পারছি—দেবতারা তোমাকে ভয় দেখিয়ে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি ফিরে এস—তোমার কোনও ভয় নেই। তোমাকে আমরা বোনের মত রক্ষা করব। আদর করব, যত্ন করব। গোরুও দেব অনেক।'

এই গোরুর দুধ একটুর জন্য সরমার মনে বড় দুঃখ ছিল। তার সন্তান-সন্ততিরা দুধ পায় না। এই দুধের জন্য ইন্দ্রের কাছে তাকে প্রার্থনা করতে হয়েছে। আর এখন পণিরা সেই সব গোরুর ভাগ দেবে

বলে তাকে কত সাধাসাধি করছে! এ দেশে থেকে গেলে সরমার কত সুখভোগ, কত আদর আর কত যত্ন!

সরমা পণিদের দিকে একবার মুখ তুলে চাইল। হয়তো সে ফিরে আসবে—এই আশায় পণিরা বার বার আদর করে ডাকতে লাগল, 'ফিরে এস সরমা সুন্দরী, ফিরে এস।'

সরমা কিন্তু আর দাঁড়াল না। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দেবলোকের দিকে চলতে লাগল। না—এখানে যত সুখই থাক, দেবলোক যে তার স্বদেশ! কেমন করে স্বদেশকে সে ভুলে থাকবে? কেমন করে সে বিশ্বাসঘাতিনী হবে?

দেবলোকের কুকুর-জননী—দেবলোকে আবার ফিরে চলল।

দেবরাজ্য তোলপাড়। শেষ পর্যন্ত সরমা শত্রুদের সন্ধান নিয়ে ফিরেছে। দেবতারা 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন। তারপর দেবরাজ্যে উঠল 'সাজ সাজ' রব। দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধেব জন্য সাজসজ্জা কবলেন। ইন্দ্রের আগে আগে ছুটল মহাঝড়ের দেবতা মরুৎ। স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে উঠল ভীষণ ঝড়। ঘন ঘন বজ্রাঘাতে পণিদের সেই পাহাড়-ঘেরা দেশে হাহাকার পড়ে গেল। গুহার গভীর অন্ধকারে বন্দী গোরুগুলিকে উদ্ধার কবে দেবরাজ ইন্দ্র একদিন আবার দেবলোকে ফিরে এলেন।

॥ ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল থেকে ॥





অগ্নির পলায়ন

সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। আদিম মানুষ ভয় পেয়ে তাকাল আকাশের দিকে। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার, আর তার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর বজ্রের আগুন! ভয় পেয়ে তারা বনের আশ্রয়ে পালাল। কিন্তু বনেও কি নিস্তার আছে? একদিন বনে দেখল দাবানল। তুটো বড় বড় গাছের ডালে ঘষা লাগতে লাগতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। পশুপাখি গাছপালা পুড়ে পুড়ে সব ছাই হতে লাগল। ভয় পেয়ে তারা পালাল সমুদ্রের ধারে। কিন্তু সেখানেও কি নিস্তার আছে? একদিন সাগরের জলে দেখল বাড়বানল। ভয় পেয়ে পালাল তারা পাহাড়ের গুহায়। হায়, সেখানেও নিস্তার নেই। একদিন পাহাড়ের বুক চিরে পাতালপুরী থেকে উঠল আগুনের হলকা ধোঁয়া আর লাভাস্রোত। অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—সর্বত্র জুড়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর আগুন। তখন সবাই আকাশের দিকে হাত জোড় করে একদিন বলতে লাগল, 'হে অগ্নিদেবতা, আমাদের রক্ষা কর—রক্ষা কর।'

সেদিন থেকে অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জুড়ে অগ্নি হলেন ত্রিভুবনের দেবতা। প্রচণ্ড তাঁর তেজ।

সেই প্রচণ্ড দেবতা একদিন যেন দয়া করেই মানুষের কাছে ধরা দিলেন। আদিম মানুষ পাথরে পাথর ঠুকতে ঠুকতে দেখল সেই প্রচণ্ড দেবতার ছোট্ট মূর্তিখানি—সামান্য একটু আগুনের ঝিলিক। সযত্নে সেই আগুনটুকুকে নিয়ে আদিম মানুষেরা কাঠকুটো এনে ধুনি জ্বালাল। আদিম মানুষের গুহার অন্ধকার আলো হয়ে



উঠল। সে আগুন দেখে বনের পশুরা ভয় পেয়ে দূরে পালাল। ধুনি জ্বেলে জ্বেলে অগ্নিদেবতার সেই ছোট্ট মূর্তিটুকু মানুষ সেদিন রক্ষা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে শিখল তারা সেই আগুনে মাংস পুড়িয়ে খেতে, শিখল ধাতু গলিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে। অগ্নি

দেবতার দয়ার আর অন্ত নেই। দেহ দান করলেন তিনি মানুষের জন্য। তাঁর সাহায্যে মানুষ একদিন জঙ্গল ছেড়ে গ্রাম গড়ল, জনপদ গড়ল, বড় বড় নগর গড়ে তুলল। গড়ে তুলল আদিকালের সভ্যতা।

কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে বড় বড় ঋষিরা তাঁর বন্দনা গান করলেন। বিরাট বিরাট আগুনের ধুনি জ্বেলে অগ্নি দেবতাকে কলসী কলসী ঘি খাওয়াতে লাগলেন।

অগ্নি ছাড়া আরও দেবতা আছেন—ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, মরুৎ। এঁদের জন্যও মানুষ কলসী কলসী ঘি জড়ো করল। তারা অগ্নিকে অনুরোধ করল, 'হে অগ্নি, আমাদের এই ঘিটুকু যদি অন্য দেবতাদের কাছেও দয়া করে পৌঁছে দাও!'

যেমন মানুষেরা অনুরোধ করল তেমনি দেবতারাও একযোগে এসে একদিন অগ্নিকে ধরে পড়লেন। বললেন, 'দেখ, ঘি তুমি একাই খাবে—এটা ঠিক নয়। মর্ত্যের মানুষ আমাদের জন্য কলসী কলসী ঘি জমা করে রেখেছে। তুমি মানুষের সবচেয়ে কাছে থাক বলেই তোমাকে অনুরোধ করছি—আমাদের ঘিটুকু বয়ে এনে দাও।'

অগ্নি দেবতা রাজী হলেন। দেবতারা সব ঘি খাওয়ার আনন্দে খুব কোলাহল করতে করতে চলে গেলেন।

সেদিন থেকে যত লোক যত দেবতার নামে যজ্ঞ করে, তার ঘিটুকু অগ্নি দেবতা সেই সব দেবতার কাছে বয়ে বয়ে দিতে লাগলেন। রোজ কত কলসী ঘি যে তাঁকে ভারে ভারে বইতে হয়, তার ঠিক নেই। শুধু কি ঘি—রুটি, মধু, গোরু, ছাগল, ভেড়া—যত রকমের জিনিস মানুষ যজ্ঞে সমর্পণ করে তা সবই কাঁধে করে স্বর্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। আর ঘিয়ের তো কথাই নেই। দেবতারা ঘি ভালোবাসেন বলে মানুষ ওই বস্তুটাই আবার যজ্ঞে বেশি করে দেয়। কিন্তু এদিকে ঘিয়ের ভার বয়ে বয়ে অগ্নি দেবতার কাঁধে প্রায়

কালশিটে পড়ে গেল। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ—এই রকম চলতে লাগল।

তারপর একদিন অগ্নি দেবতা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 'দুত্তোর' বলে মানুষের যজ্ঞ ছেড়ে পালালেন। নিজের তেজ খণ্ড খণ্ড করে লুকিয়ে রাখলেন নানা জায়গায়। কোথাও ধান, কলাই, যবের গাছে, কোথাও বড় বড় গাছে, কোথাও-বা প্রাণীদের শরীরের মধ্যে খণ্ড খণ্ড রূপে তেজকে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর স্বয়ং নিজে মোটা একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে সাগরের জলে ডুব দিলেন।

দেবতারা 'হায় হায়' করে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। মর্ত্যের মানুষের ঘি আর স্বর্গে আসে না। দেবতাদের খাওয়ার রুচি চলে গেল। ঘিয়ের দুঃখে তাঁদের মধ্যে প্রায় কান্নাকাটি পড়ে গেল। সবাই গিয়ে ধরে পড়লেন যমকে। যমরাজ চললেন অগ্নি দেবতাকে খুঁজতে।

তিন লোক খুঁজে খুঁজে যম দেখলেন—অগ্নি দেবতা নিজের তেজকে খণ্ড খণ্ড করে এখানে ওখানে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আসল লোকটা গেল কোথায়? ঘুরে ঘুরে পেয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত অগাধ জলের নীচে—কাঁথা মুড়ি দিয়ে অগ্নি দেবতা গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আগুনের দীপ্তি কি কাথায় ঢাকা পড়ে?

সঙ্গে সঙ্গে যম ছুটলেন দেবতাদের কাছে খবর নিয়ে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা দল বেঁধে ছুটে এলেন। জলের ধারে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন অগ্নিকে অনেক কাকুতি মিনতি করে।

দেবতারা বললেন, 'হে অগ্নি, তুমি কোথায় লুকোবে? একজন দেবতা যে তোমায় দেখে ফেলেছেন।'

অগ্নি দেবতা আরও একটু কুঁকড়ে গা-ঢাকা দিয়ে বসলেন।

দেবতারা বললেন, 'কেন লুকোচ্ছ তুমি! নিজেকে কোথায় ঢেকে রাখবে তুমি! নিজের তেজকে তুমি যত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছ—সব জায়গায় যে তোমাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন।'

অগ্নি দেবতা তবু গা-ঢাকা দিয়ে থেকেই বললেন, 'অমনি বললেই হল! কে আমাকে দেখতে পেয়েছে? হেঁ হেঁ—বল দেখি—আমি কোথায় আছি?'

দেবতারা হেসে বললেন, 'হেঃ হেঃ—ওই যে তুমি জলের মধ্যে ঘুপটি মেবে বসে আছ! আর তোমার তেজকে লুকিয়ে রেখেছ বড় বড় গাছের মধ্যে, ছোট ছোট ধান, যব, কলাইয়ের গাছেব মধ্যে, প্রাণীদের শরীরে। এমনি আবও কত জায়গায়!'

ধরা পড়ে গিয়ে অগ্নি দেবতা হতাশ হয়ে বললেন, 'কে আমাকে দেখেছে?'



দেবতারা বললেন, 'যম। যম তোমাকে দেখেই চিনেছে।'

শুনে অগ্নি দেবতা যমের ওপর খুব চটে গেলেন। তিনি বললেন, 'দোহাই তোমাদের—আমি আর যাব না। তোমাদের ওই ঘি বয়ে বয়ে কি আমাকে মরে যেতে বল? আমার দ্বারা ও আর হবে না।'

ঘিয়ের কথায় দেবতাদের পুরানো শোক উথলে উঠল: আহা, কতদিন তাঁরা ঘি খাননি। দেবতারা কাকুতি মিনতি করে ডাকতে লাগলেন, 'এস অগ্নি—এস। দেবভক্ত মানুষেরা কত কষ্ট করে যজ্ঞের আয়োজন করেছে, কত কলসী কলসী ঘি তারা যোগাড় করেছে। তুমি লুকিয়ে থেকে সব ভণ্ডুল করে দিয়ো না। ঘিটুকু যাতে দেবতাদের কাছে এসে পৌঁছয় তার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

অগ্নি বললেন, 'ওই যজ্ঞের ভার বইবার ভয়েই আমি পালিয়ে এসেছি। তোমরা তো জান, আমার আগের ভায়েরা ওই ঘি বয়ে বয়েই মারা গেছে। তাই আমি আর যেতে চাইনে।'

দেবতারা বললেন, 'মরার ভয় কর না, তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ু বর দিচ্ছি। তুমি মরবে না। তুমি ফিরে এস। দেবতাদের ঘিটুকু বয়ে দাও।' একটু খোশামোদ করে তাঁরা আরও বললেন, 'আহা, তোমার কি কল্যাণময় চেহারা—কি সুন্দর! তুমি সকলের কত উপকার কর—এত বড় উপকারী কেউ আর নেই। দেবতাদের এই উপকারটুকু করে দাও।'

খোশামোদে অগ্নির মন একটু গলে গেল। তিনি বললেন, 'আমি যেতে পারি—যদি তোমাদের ভাগ থেকে তোমরা যজ্ঞের প্রথম ভাগের ঘিটুকু আমাকে দাও। তা ছাড়া শেষ ভাগের ঘিও কিছুটা দিতে হবে।'

দেবতারা বললেন, 'তাই দেব—তুমি ফিরে এস।'

অগ্নি বললেন, 'তা হলে অনন্ত পরমায়ু দাও।'

দেবতারা বললেন, 'দিচ্ছি। তুমি জল থেকে উঠে এস। যে দেবতার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ হোক না কেন, আজ থেকে সব যজ্ঞের তুমিই হবে প্রধান। চার দিক তোমার কাছে মাথা নত করবে।'

শেষ পর্যন্ত অগ্নি দেবতা আবার ফিরে এলেন।

॥ ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল থেকে ॥



যজ্ঞের বলি

আদ্যিকালেব সে এক বাজা—নাম ছিল হবিশ্চন্দ্র। রাজার অন্নেব অভাব নেই—এটা খান, ওটা খান। বস্ত্রেব অভাব নেই—শীতে জলে হি-হি কবে কাঁপতে হয না! সোনা-দানা অঢেল—বাজাব মাথায মুকুট, কানে কুণ্ডল, কোমবে চন্দ্রহাব। এ সব ছাড়াও ঘব-আলো-কবা একশ' বানী। বাজাব একশ'টা শ্বশুরবাড়ি থেকে কত শত ঘোড়া ছাগল যৌতুক এসেছে গোনা-গুন্‌তি নেই!

বাজা দিব্যি ছিলেন মনের সুখে। কিন্তু যত গোলমালের গোঁসাই নাবদ মুনি এসে এক কাণ্ড কবিয়ে দিলেন। রাজাকে তিনি বললেন, 'তোমার ওসব কিছু নয়। ভাল মন্দ খেয়ে পরে সোনা-দানায় দিব্যি সেজেগুজে থাকা যায় বটে, আর বিয়ে করলেই অনেক গোরু-ঘোড়া যৌতুকও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সব থাকতেও ঘর তোমার অন্ধকাব। কারণ তোমাব ছেলেপুলে নেই।'

বাজা বললেন, 'তবে উপায?'

নারদ বললেন, 'তুমি বরুণ দেবতার কাছে মানত কর। বল যে, ছেলে হলে তাঁকে বলি দিয়ে যজ্ঞ করবে।'

রাজা মানত করলেন।

বরুণ দেবতা খুশী হয়ে বর দিলেন। রাজপুত্রের জন্ম হল। রাজা নাম রাখলেন রোহিত। আনন্দ উৎসবে রাজা আর তাঁর একশ' রানী মেতে উঠলেন।



বরুণ দেবতা একদিন এসে বললেন, 'কই রাজা, যজ্ঞ করে ছেলে বলি দিলে না তো ?'

রাজার বুক কেঁপে উঠল। আহা, ওই একরত্তি ছেলে। তার জন্মের পর দশটা দিনও কাটে নি। কিন্তু উপায় নেই—যজ্ঞের বলি রাজাকে দিতেই হবে। এমনি ছিল নিয়ম। রাজা বললেন, 'দশটা দিন যাক—তখন যজ্ঞ করব।'

শুধু দশ দিন নয়, দশ মাস গেল, দশ বছর গেল। রাজা নানান কথা বলে বরুণ দেবতাকে ফেরাতে লাগলেন। কখনও বললেন, 'দুধে-দাঁত উঠুক।' কখনও বললেন, 'দুধে-দাঁত ভাঙুক।' কখনও বা বললেন, 'আসল দাঁত উঠুক।'

বরুণ দেবতা বার বার ফিরে ফিরে গেলেন।

রাজা শেষবার বললেন, 'পশু বলি আর মানুষ বলিতে তফাৎ আছে তো ঠাকুর। রোহিত আবার ক্ষত্রিয়ের ছেলে। ক্ষত্রিয়ের ছেলে যতদিন না ধনুর্বাণ ধরতে শেখে ততদিন সে বলির যোগ্য হয় না। এই তো শাস্ত্রের নিয়ম।'

বরুণ দেবতা সেবারও ফিরে গেলেন। এদিকে রাজা রোহিতকে ধনুর্বিদ্যা শেখাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন—যাতে সে তাড়াতাড়ি একটা মস্ত বড় বীর হয়ে উঠতে পারে। হলও তাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রোহিত ধনুর্বিদ্যা শিখল—রোহিত হল মস্ত বীর। তখন নিজেকে রক্ষা করবার মত তার সাহস হল, শক্তিও হল।

এদিকে বরুণ দেবতা আবার এক দিন এসে হাজির। রাজার বুক কেঁপে উঠল। রোহিতকে ডেকে রাজা বললেন, 'বাছা, বরুণের দয়াতেই তোকে পেয়েছিলাম। কথা ছিল—তোকে যজ্ঞে বলি দেব।'

রোহিত বীরদর্পে বলল, 'তা কখন হতে পারে না!'

এই বলে সে হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেল। বলির জন্য কেউ তাকে ধরতে সাহস করল না।

কিন্তু জলের দেবতা ছাড়লেন না। রোহিতের হল উদরী রোগ —জলের দেবতা চটে মটে তার পেটের মধ্যে জল চালান করে দিলেন। পেটটা ফুলে হয়ে উঠল জয়ঢাক। শরীর হল দুর্বল। হাত-পা হল কাঠির মত। রোগে ভুগে ভুগে বছরখানেক পরে রোহিত তখন বন ছেড়ে ঘরে ফেরবার পথ ধরল। মনে বিশ্রামের আশা।

রোহিতকে ঘরে ফিরতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের কি জানি কি মনে হল—ছুটলেন তিনি ব্রাহ্মণের বেশে। হয়তো ভাবলেন—ঘরে বিশ্রাম নিতে গেলে রোহিত আর বাঁচবে না। তাই ব্রাহ্মণের বেশ ধরে রোহিতের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ওহে রোহিত, চলে বেড়াও—তাতে তোমার অনেক লাভ। বসে থাকলে সেরা মানুষেরাও অনেক কষ্ট পায়। যে চলে বেড়ায়—ইন্দ্র তার সখা। তাই বলছি, তুমি চল—চল—চল।'

পূজনীয় এক ব্রাহ্মণ তাকে চলে বেড়াতে বলছেন—এই ভেবে রোহিত গোটা একটা বছর বনে বনে ঘুরে বেড়াল। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যেমনি আবার ঘরে ফিরতে যাবে অমনি ইন্দ্র সেই ব্রাহ্মণের বেশে সামনে এসে হাজির। রোহিতের কাঠির মত পা দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, 'যে লোক ঘুরে বেড়ায় তার হাত পা হয় ফুল-ধরা গাছের মত সুন্দর, দেহ যেন হয় ফল-ধরা গাছ। চলে বেড়ানর যে পরিশ্রম—তার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই রোহিত। তাতে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলছি, তুমি চল—চল—চল।'

এমনি ভাবে রোহিত যতবার দেশে ফিবে আসতে চাইল ততবারই ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে এসে রোহিতকে বাধা দিলেন। চলে বেড়ালে যে তার লাভ হবে—এই কথাটা বার বার নানা ভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। বললেন, 'যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে, সে হল ঘোর কলির লোক। যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে—সে দ্বাপর যুগের লোক। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়—সে হল ত্রেতাযুগের লোক। আর যে চলে বেড়ায়—তার ভাগ্যে নানা দিকে লাভ, সে সত্যযুগের লোক। দেখ সূর্যের মাহাত্ম্য, তিনি চলছেন—চলছেন—চলছেন। তাই বার বার করে বলি, তুমিও চলে বেড়াও রোহিত—চল—চল।'

তাঁর কথা শুনে শুনে রোহিতও বার বার ফিরে ফিরে গেল। কিন্তু বরুণের অভিশাপে পেটে জল জমে তেমনি জয়ঢাক

হয়ে রইল। এমনি করে কেটে গেল দু'টি বছর। রোহিত বনে বনে ঘুরে বেড়াল।

শেষ বছরে রোহিত বনের মধ্যে এক ঋষিকে দেখতে পেল। ঋষি বড় গরীব। তাঁর নাম অজীগর্ত। তাঁর আশ্রম-কুটিরের অবস্থা বড়ই খারাপ। গোরু-বাছুর, ঘোড়া-ভেড়া একটিও নেই। না আছে ঘরে এক মুঠা যব ধান। থাকার মধ্যে আছে শুধু স্ত্রী আর তিনটি ছেলে। ছেলেদের নাম হল শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল। তাদের খাওয়াতে পরাতে ঋষি একেবারে নাজেহাল।

রোহিত একটা মতলব এঁটে অজীগর্তের আশ্রমে গিয়ে হাজির হল। অজীগর্তকে ডেকে বলল, 'ঋষি, তোমাকে একশটা গোরু দেব, কিন্তু তোমার একটি ছেলেকে দিতে হবে।'

অজীগর্ত বললেন, 'ছেলে নিয়ে কি করবে?'

বোহিত বলল, 'আমার বদলে তাকে যজ্ঞে বলি দিয়ে বরুণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হব।'

ঋষির বড় অভাব—তাই রাজী হলেন। কিন্তু বড় ছেলেটিকে ঋষি কাছে টেনে নিলেন। যতই হোক—সে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠেছে, বাপকে সাহায্য করতে পারবে। তার হাত ধরে ঋষি বললেন, 'আমি কিন্তু একে কিছুতেই দেব না।

একেবারে ছোট ছেলেটি এখনও অসহায়। তার মা তাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'আমি কিন্তু একে কিছুতেই দেবো না।'

বাকী রইল মাঝেরটি। সে বেচারী শুনঃশেফ। রাজার ছেলে রোহিত—ধনদৌলতের অভাব নেই। তাই একশ' গোরুর বদলে শুনঃশেফকে যজ্ঞের বলি হিসেবে পেতে কষ্ট হল না। বাপকে এসে বলল, 'বরুণের যজ্ঞে শুনঃশেফকে বলি দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।'

অজীগর্তকে একশ' গাই-গোরু দিয়ে রোহিত শুনঃশেফকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল।

হরিশ্চন্দ্র তখন বরুণকে বললেন, 'রোহিতের বদলে আমি এই শুনঃশেফকে দিয়ে তোমার যজ্ঞ করব।'

বদল হোক, যাই হোক—যজ্ঞের বলি দিতে হবে—এই ছিল তখন নিয়ম। বরুণ দেবতা খুশী হয়ে বললেন, 'সে তো খুব ভালো। ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে তো বলি হিসেবে আদর আরও বেশী। এবার তবে যজ্ঞ কর।'

হরিশ্চন্দ্র এবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন।



সে এক বিরাট যজ্ঞ। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠের মত বড় বড় ঋষিরা যজ্ঞ করতে এলেন। স্বয়ং বিশ্বামিত্র হলেন যজ্ঞের

হোতা—পুরোহিত। শুনঃশেফ বেচারী একপাশে বলির পশুর মত বসে রইল।

কিন্তু বলির সময়ে লাগল গোলমাল। শুনঃশেফকে হাড়িকাঠে বাঁধবে কে ?

কেউই রাজী হল না।

তখন গরীব অজীগর্ত বললেন, 'আমাকে যদি আরও একশ' গাই-গোরু দাও, তা হলে আমি বাঁধতে পারি।'

হরিশ্চন্দ্র তাঁকে আরও একশ' গাই-গোরু দিলেন। অজীগর্ত এগিয়ে গিয়ে নিজের ছেলেকে হাড়িকাঠে বাঁধলেন।

কিন্তু বাঁধা তো হল—তারপর কাটবে কে ?

কেউই রাজী হল না।

তখন লোভী অজীগর্ত আবার বললেন, 'আমাকে যদি আরও একশ' গাই-গোরু দাও, তাহলে আমি কাটতে পারি।'

হরিশ্চন্দ্র তাঁকে আবও একশ' গাই দিলেন। অজীগর্ত শাণিত খড্গ হাতে নিয়ে হাজির হলেন।

বেচারী শুনঃশেফ সকলের মুখেব দিকে একবার কাতর চোখে চেয়ে দেখল—কারও মুখে দয়াব চিহ্ন নেই। সবাই ব্যস্ত—যজ্ঞ যাতে ভালো ভাবে শেষ হয়। শুনঃশেফ বুঝতে পারল—এঁরা কেউই তাকে বাঁচাতে আসবে না। তাই মনে মনে সে কাতরভাবে ব্রহ্মাকে ডাকতে লাগল। ব্রহ্মা বললেন, 'তুমি অগ্নি দেবতার আশ্রয় নাও।'

শুনঃশেফ অগ্নির বন্দনা কবে তাঁর আশ্রয় চাইল। অগ্নি বললেন, 'তুমি সূর্য দেবতার আশ্রয় নাও।'

শুনঃশেফ তখন সূর্যের বন্দনা গান করে তাঁর আশ্রয় চাইল। কিন্তু সমস্ত দেবতাই এ ওর নাম করে যেন এড়িয়ে যেতে লাগলেন।

শুনঃশেফ সকলেরই বন্দনা করে আশ্রয় চাইতে লাগল। স্বয়ং বরুণ, দুইজন অশ্বিনীকুমার, শেষে দেবরাজ ইন্দ্র—সকলের স্তবস্তুতি করে শুনঃশেফ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেল দেবরাজ ইন্দ্রের। তার বাঁধন

আপনি খুলে গেল। ইন্দ্র তাকে সোনার রথ দান করলেন। ওদিকে বরুণও প্রসন্ন হলেন। তাই রোহিতের রোগও সেরে গেল—তার জয়ঢাকের মত পেটটা আস্তে আস্তে কমে গেল।

শুনঃশেফের উপব দেবতার করুণা ও আশীর্বাদ দেখে ঋষিরা খুশী হয়ে বললেন, 'আমাদের এ যজ্ঞ তাহলে তুমিই শেষ করে দাও শুনঃশেফ।'

শুনঃশেফ তখন শাস্ত্রেব নিয়ম মতে যজ্ঞ শেষ করল। ঋষি বিশ্বামিত্র তার কাজ দেখে খুব বাহবা দিলেন। যজ্ঞ শেষ করে বালক শুনঃশেফ ঋষি বিশ্বামিত্রের কোলে গিয়ে চেপে বসল। ঋষিও তাকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করলেন।

ব্যাপারটা যেন অজীগর্তের ভালো লাগল না,—না শুনঃশেফের আচরণ, না বিশ্বামিত্রের আচরণ। অজীগর্ত বিশ্বামিত্রকে ডেকে বললেন, 'ওহে ঋষি, আমার ছেলে ফিবিয়ে দাও।'

বিশ্বামিত্র বললেন, 'না। আজ থেকে এ হল আমারই ছেলে। শুনঃশেফকে দেবতারা আজ আমার হাতেই দান করেছেন।'

অজীগর্ত তখন শুনঃশেফকে ডাকতে লাগলেন, 'শুনঃশেফ, ফিরে আয়। তোর বাপ-পিতামহের বংশ কত বড় বংশ—সে বংশ ত্যাগ করে যাস নে। আমার কাছে আবার ফিরে আয়।'

শুনঃশেফ বলল, 'তুমি বাবা হয়েও একশ'টা গোরুর লোভে ছেলেকে কাটতে এসেছিলে। শূদ্রবাও এমন ঘেন্নাব কাজ করে না। তুমি চলে যাও—আমার জন্য তো তুমি তিনশ' গোরু পেয়েছ। আর কি!'

অজীগর্ত বললেন, 'আমি পাপ করেছি, দুঃখে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। তুই ফিরে আয়, যে তিনশ' গোরু পেয়েছি, সে তুই এসে নে।'

শুনঃশেফ গেল না। বলল, 'তুমি যে ঘেন্নার কাজ করেছ—তারপরে আমি আর ফিরতে পারি না। আমাদের পিতা পুত্রের পবিত্র সম্বন্ধ তুমিই চিরকালের জন্য ভেঙে দিয়েছ। তুমি ফিরে যাও।'

॥ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে ॥



আদ্যিকালের বাণী

এ সেই সৃষ্টির আদ্যিকালের কাহিনী। যা আছে, তখন তাও ছিল না—যা নেই, তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না—আকাশও ছিল না। মরণও ছিল না—জীবনও ছিল না, না ছিল রাতদিনেরও তফাত। ছিল কি? ছিল শুধু চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আর জল আর জল।

তারপর আকাশ হল, পৃথিবী হল। পিতার পিতা পিতামহ ব্রহ্মা হলেন সকলের আদি পিতা। তিনিই জীবের সৃষ্টি কর্তা—তাই তাঁর নাম প্রজাপতি। তিনি সৃষ্টি করলেন গাছপালা, পোকামাকড়, পশুপাখি। সৃষ্টি করলেন দেবতা, মানুষ, অসুর।

ওই দেবতা, মানুষ আর অসুর—ওরা যেন তিন ভাই—প্রজাপতি ব্রহ্মার তিন ছেলে। ওরা বড় হতে লাগল এক সঙ্গে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠতে লাগল ওদের আলাদা আলাদা স্বভাব। দেবতারা ছিলেন শুভবুদ্ধি—সংযমী। মানুষরা ছিল লোভী—যত পায় তত খায়—আরও তত চায়, চায় না শুধু দিতে। আর অসুরেরা ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির—দয়া করুণা তাদের বুকে নেই বললেই হয়। এরা তিন ভাই বড় হল—লেখাপড়ার বয়স হল। তখন পড়তে গেল বাপের আশ্রমে। গুরুর ঘরে যেমন করে সেকালে ছাত্ররা একাগ্র মনে ব্রহ্মচর্য করত তেমনি করে তিন ভাই পবিত্র মনে সংযম ধ্যান অভ্যাস করতে লাগল।

এমনি করে বছরের পর বছর—অনেক বছর কেটে গেল। তারপর দেবতাদেরই প্রথমে মনে হতে লাগল—স্বভাব তাঁদের নির্মল হয়েছে, মনে এসেছে বিদ্যাশিক্ষার শক্তি। তাই তাঁরা একদিন প্রজাপতি ব্রহ্মার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন—নম্রভাবে বললেন, 'আমরা বছরের পর বছর—অনেক বছর ধরে ব্রহ্মচর্য করেছি। এবার আমাদের বিদ্যা দান করুন।'

ব্রহ্মা তাদের খুব বেশী কথা বললেন না—বললেন শুধু একটি কথা, 'দ'।

ওই একটি মাত্র অক্ষরের উচ্চারণ শুনে দেবতারা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলেন। তাঁরা মনে মনে সকলেই বুঝতে পারলেন—'দ' মানে বোধ হয় 'দমন'। দীর্ঘ কয়েক বছর ব্রহ্মচর্য করতে গিয়ে তাঁরা এইটেই ভালো করে বুঝেছেন যে, রাগ, অহঙ্কার, লোভ ইত্যাদি দমন করাই হল সব শিক্ষাদীক্ষার মূল।

ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যা বললাম—তার মানে বুঝলে তো?'

দেবতারা বলে উঠলেন, 'বুঝেছি।'

ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝেছ?'

দেবতারা বললেন, 'দ-এর মানে দমন কর—দাম্যত। অর্থাৎ রাগ, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি দমনই যে সব তপস্যার মূল—এই কথাই আপনি বোধ হয় বলতে চান।'

তাঁদের কথা শুনে প্রজাপতি খুশী হয়ে বললেন, 'তোমরা ঠিকই বুঝেছ।'

তারপর ব্রহ্মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল একদিন সেই প্রথম মানুষের দল। তারাও দেবতাদের মত বলল, 'অনেক বছর ধরে আমরা ব্রহ্মচর্য করেছি—এবার আমাদের উপদেশ দিন।'

প্রজাপতি এবারেও সেই একটি মাত্র অক্ষর বললেন, 'দ'।

মানুষেরাও মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলে। তারা ছিল স্বভাবতঃ কিছুটা লোভী। তার লোভের যেন শেষ নেই—সীমা নেই; তার এটা চাই—ওটা চাই। শুধু চাই—চাই। তাই সে এর জিনিস কাড়ে, ওর জিনিস কাড়ে, আর সঞ্চয় করে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধ্যান সংযম করে নিজেদের লোভী স্বভাবটার স্বরূপ তারা ভালো করেই বুঝেছে। তাই পিতামহের 'দ' অক্ষর শুনে তাদের মনে হল—প্রজাপতি তাদের লোভ ও সঞ্চয় ত্যাগ করে 'দান' করতে বললেন।

পিতামহ তাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি—বুঝলে আমার কথা?'

মানুষেরাও বলে উঠল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝেছ?'

মানুষেরা বলল, 'দ-এর মানে দত্ত। অর্থাৎ দান কর, দান কর। ইঙ্গিতে এই কথাই আপনি বলেছেন।'

তাদের কথা শুনে প্রজাপতি খুব খুশী হলেন। বললেন, 'তোমরাও ঠিক বুঝেছ।'

তারপর সবশেষে এল অসুরেরা। দীর্ঘকাল ধ্যান সংযম করে তাদের মনও নির্মল ও পবিত্র হয়েছে। অসুররা প্রজাপতিকে বলল, 'এবার আপনি আমাদের উপদেশ দিন।'

প্রজাপতি তাদের শুধু সেই একটি অক্ষর বললেন, 'দ'।

অসুরেরাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে প্রজাপতির 'দ' শব্দটি শুনে। মনে মনে ভাবতে লাগল তারা 'দ'-এর মানে। অসুররা ছিল দয়াহীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। দীর্ঘকাল ধ্যান সংযম করার পর নির্মল পবিত্র মন নিয়ে তারাও বুঝতে পেরেছে—তাদের চরিত্রের দোষটা কোথায়। তাই প্রজাপতির 'দ' অক্ষর শুনে তারা বুঝে নিল—পিতা তাদের

বোধ হয় দয়াশীল হতে বলেছেন। প্রজাপতি যেন ইঙ্গিতে বলে দিলেন—'নিষ্ঠুরতা ছেড়ে দয়া কর, দয়া কর, প্রাণীদের দয়া কর।'

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝতে পারলে—আমি কি বললাম?'

অসুরেরা এক সঙ্গে বলে উঠল, 'বুঝেছি।'

প্রজাপতি জিজ্ঞেস করলেন 'কি বুঝেছ বল দেখি?'

অসুরেরা বললে, 'দ-এর মানে দয়ধ্বম্। অর্থাৎ দয়া কর—দয়া কর। ইঙ্গিতে আপনি এই কথাই বলতে চেয়েছেন।'

যাই হোক, তাদের কথা শুনেও প্রজাপতি খুব খুশী হলেন। হেসে বললেন, 'তোমরাও ঠিক বুঝেছ।'

সৃষ্টির সেই আদ্যিকালে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির প্রথম উপদেশ পেয়েছিল দেবতা, মানুষ আর অসুর শুধু একটি মাত্র অক্ষরে। তারই মধ্য দিয়ে দেবতা পেয়েছে দেবত্ব, লোভী মানুষ পেয়েছে অমরত্বের সন্ধান, আর নিষ্ঠুর অসুরের হয়েছে অসুরত্ব মোচন। আদ্যিকালের সে কথার আজও শেষ নেই। আকাশ যখন ছেয়ে আসে মেঘে মেঘে, অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক, মেঘের বুকে ঝিলিক মারে বিদ্যুৎ, তখন আদ্যিকালের সেই সৃষ্টিকর্তার বাণী আজও স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল কাঁপিয়ে ফেটে পড়ে মেঘের ডাকে—'দ! দ! দ! দাম্যত! দত্ত! দয়ধ্বম্!' প্রজাপতি যেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সুদূর আকাশের মেঘের আড়াল থেকে আজও ঘোষণা করেন তাঁর অমর বাণী—'দ! দ! দ! দমন কর! দান কর! দয়া কর!'

॥ বৃহদারণ্যক, ৫ম অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ থেকে ॥



শ্বেতকেতুর শিক্ষা

ঋষি উদ্দালক ছিলেন ঋষিদের মধ্যে বড় একজন গুণবান পণ্ডিত। শ্বেতকেতু তাঁর ছেলে। কিন্তু গুণবান পণ্ডিতের ছেলে হলে কি হবে, শ্বেতকেতু বার বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়ার ধার দিয়েও গেল না। অথচ ঋষির আশ্রমে বিদ্যার অভাব ছিল না। বিদ্যাচর্চার, জ্ঞানেব নানান আলোচনার জায়গাই ছিল এইসব আশ্রম।

লোকালয়ের হট্টগোল থেকে দূরে শান্ত বনের ছায়ায় ঋষিরা কুটিব বাঁধতেন। বনের হরিণ এসে ঋষিদের কুটির প্রাঙ্গণে চরে বেড়াত, কত রকমের পাখি এসে আশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ চারদিকটি কলকূজনে ভরে তুলত। একেবারে উঁচু গাছটির ডালে বসে নীলকণ্ঠ পাখি ঋষিদের মতই ধ্যান করত। ইঁদুরেরা কাঠবিড়ালীর সঙ্গে মিতালি করত, বেড়াল তাদের দেখে হাই তুলত মাত্র—কিছু বলত না। প্রজাপতিরা কত রঙের ওড়না উড়িয়ে ফুলের বনে নেচে বেড়াত। এরই মধ্যে ঋষিরা যাগযজ্ঞ করতেন, সকাল সন্ধ্যায় দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা গান করতেন। কত দূর দেশান্তর থেকে কিশোর বালক ছাত্ররা লেখাপড়া করতে আসত—আশ্রমের সকল রকম কাজ করে ছাত্ররা ঋষিদের সন্তুষ্ট করত; ঋষিরা তাদের বিদ্যাদান করতেন। কখনও বা গুরুতর বিষয়ে ঋষিদের মধ্যে তর্ক আলোচনা হত।

এই রকম আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও শ্বেতকেতুর কিন্তু লেখাপড়া হল না। বরং আশ্রমের চারদিকে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে, কোথায় কোন

পাখির বাচ্চা হয়েছে বা কোথায় কোন গাছে কি ফল পাকল তার খোঁজ করে করেই তার বারটা বছর কেটে গেল। হয়তো বা দূরের পাহাড়ের ঝরনায় ঘুরে ঘুরে, বাঁশি বাজিয়ে, শান্ত নদীর জলে সাঁতার কেটে দিন চলে যেতে লাগল।



তার ভাব-সাব দেখে ঋষি উদ্দালক ভাবনায় পড়লেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন—এখানে থাকলে শ্বেতকেতুর আর লেখাপড়া হবে না। তাই তাকে দূরে গুরুর ঘরে পাঠাবার মতলব করলেন।

একদিন শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, 'বাছা শ্বেতকেতু, তোমাকে গুরুর ঘরে লেখাপড়া করতে হবে।'

শুনে শ্বেতকেতুর মুখ শুকিয়ে গেল। হায় হায়! এখানকার বনের পাখি আর হরিণ, পাহাড় ঝরনা আর শান্ত নদীটির কোল—এ সব ফেলে তাকে কোথায় যেতে হবে! এ যে সে কোনও দিন ভাবেনি।

কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে, এ রকম বনে জঙ্গলে চিরদিন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালে কেউ যে তাকে আর ব্রাহ্মণ বলে কেয়ারই করবে না। সেকালে ব্রাহ্মণের ছেলে হলেই আর ব্রাহ্মণ হওয়া যেত না।

ঋষি উদ্দালক তাই শ্বেতকেতুকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, 'ধ্যান সংযম করে সত্যিকার জ্ঞানী না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না শ্বেতকেতু! যাও, গুরুর কাছে ভালো করে লেখাপড়া শিখে এস।'

বাবার বকুনি খেয়ে শ্বেতকেতুর মনে লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—রীতিমত সমস্ত কিছু শিখে ব্রাহ্মণ হয়ে তবে সে ঘরে ফিরবে।



একদিন সে সুদূর গুরুগৃহে যাত্রা করল। কাঠবিড়ালী দু'পা তুলে বনের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল—যাক, আপদ গেল, কেউ

আর তাদের ল্যাজ কাটবে না। নীলকণ্ঠ পাখি মগডাল থেকে দেখে শান্তির নিশ্বাস ফেলল—যাক, তার বাচ্চাগুলো এবার আর বেঘোরে মারা পড়বে না। বুড়ো হরিণ কোমর সোজা করে দাঁড়াল—যাক, কেউ আব পিঠে চড়ে বাতের ব্যথাটা বাড়িয়ে দেবে না। দূর পাহাড়ের দামাল ঝরনাটি শুধু বলতে লাগল—ঝর ঝর—ধর ধর—কোথায় যাবে শ্বেতকেতু? তার পাশে পাশে এঁকে বেঁকে কুল কুল করে বয়ে চলল সে।

গুরুর ঘরে গিয়ে শ্বেতকেতু লেখাপড়ায় মন দিল। দীর্ঘ বারটি বছর গুরুর ঘরে থেকে সে নানা বিদ্যা শিখল। জগতেব প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ—আর্য ঋষিদের জ্ঞানের আধার যে বেদ, শ্বেতকেতু তা মুখস্থ করে ফেলল। এসব পড়ে শেষ করতে করতে তার বযস হল চব্বিশ বছর। লেখাপড়া সাঙ্গ করে শ্বেতকেতু চব্বিশ বছর বয়সে সগর্বে ঘরে ফিরে এল। তার বাবা একদিন বলেছিলেন ব্রাহ্মণ হতে। এখন সমস্ত বিদ্যা একেবারে কণ্ঠস্থ করে সে সেই ব্রাহ্মণ হযে ঘরে ফিরেছে! এখন সে আর কারও চেযে খাটো নয়। বিদ্যার অহঙ্কারে কারও সঙ্গে সে ভালো কবে কথাই বলল না।

তার অহঙ্কারী ভাব-সাব দেখে ঋষি উদ্দালক আবার ভাবনায় পড়লেন।

কোথায় লেখাপড়া শিখে জ্ঞানলাভ করে শ্বেতকেতু বিনয়ী হবে, নম্র হবে—তা না হয়ে এ যে উল্টো হল! বিদ্যার অহঙ্কারে মাটিতে যেন আর পা পড়ে না! ব্রাহ্মণ বংশের এ যে আবার মহা বিপদ!

ঋষি উদ্দালক মনে মনে খুব দুঃখিত হলেন। একদিন তিনি শুধোলেন, 'কি লেখাপড়া শিখে এলে শ্বেতকেতু? বেদ পড়েছ?'

শ্বেতকেতু সগর্বে উত্তর দিল, 'বেদ তো আমার কণ্ঠস্থ।'

তার উত্তর শুনে ঋষি উদ্দালক অবাক। তার গর্ব আর অহঙ্কার দেখে উদ্দালক বললেন, 'গুরু কি তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন?'

দু'একটি কথার পরই মহাজ্ঞানী উদ্দালক বুঝতে পারলেন, শ্বেতকেতু সমস্ত কিছুই মুখস্থ করে ফেলেছে হয়তো—কিন্তু বোঝেনি কিছু। তখন ঋষি আবার নিজেই শ্বেতকেতুকে সমস্ত কিছু বোঝাতে বসলেন। শ্বেতকেতু হাঁ করে শুনতে লাগল। পৃথিবী, পশুপাখি, গাছপালা, মানুষ, মানুষের প্রাণ, বাক্য, মন—এমনি কত বিষয়ে ঋষি বোঝাতে লাগলেন। শ্বেতকেতু কিছু বা বুঝলে—কিছু বা বুঝলে না।

একদিন ঋষি বললেন, 'শ্বেতকেতু, আমাদের মন হল অন্নময়—অন্নতেই মনের শক্তি।'

না বুঝে শ্বেতকেতু হাঁ করে চেয়ে রইল।

কোথায় অন্ন আর কোথায় মন! অন্ন হল ক্ষুধার খাদ্য যা দিয়ে পেট ভরাই! বাস্—সেইখানেই তো তার কর্ম শেষ। এই তো তার সামান্য পেট ভরানোর কাজ। আর মন হল কত বড়! কত বড় বড় তার কাজ! জগতের কত বড় বড় সৃষ্টি, কত বিরাট জ্ঞানের সৃষ্টি এই মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। অন্ন আর মন—একটা কত ছোট আর একটা কত বড়! এদের সম্পর্ক কি? শ্বেতকেতুর মুখের ভাব বোকা বোকা।

উদ্দালক তার ভঙ্গী দেখে বললেন, 'বুঝলে?'

শ্বেতকেতু ঘাড় নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে না। আর একবার বলুন।'

উদ্দালক বললেন, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা তোমাকে সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজ থেকে তুমি পনের দিন উপবাস কর। কোনও অন্ন খাবে না। শুধু তেষ্টা পেলে একটু করে জল খেয়ো।'

বেচারী শ্বেতকেতু তো উপবাস শুরু করে দিল। এক দিন দু'দিনের উপবাস নয়, এ একেবারে একটানা পনের দিন।

যাই হোক, এক দিন দু' দিন করে বেচারী শ্বেতকেতুর পনেরটা দিন তো কোন রকমে কেটে গেল। এই পনের দিনে তার দেহের

জোর কমে গেল—গায়ের রঙ হল কালি। পনের দিন পরে কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে সে বাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কথা বলতে গেল—কিন্তু গলা দিয়ে ভালো করে স্বর ফুটল না। কোনও রকমে বললে, 'বাবা, এখন আমায় কি বোঝাবে?'

ঋষি উদ্দালক বললেন, 'বেদ তো তোমার কণ্ঠস্থ। এখন তার মন্ত্রগুলো সব এক এক করে বল দেখি।'

শ্বেতকেতু চোখে অন্ধকার দেখল। মন্ত্রগুলি মনে করবার চেষ্টা করল কিন্তু হায়, কিছুই যে মনে পড়ে না! মন বড় দুর্বল। ভাবতে ভাবতে তার মাথা ঘুরতে লাগল। পনের দিন উপবাস করে মনের আর কোন শক্তিই নেই। শ্বেতকেতু চিঁ-চিঁ করে বললে, 'বাবা, আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না।'

ঋষি উদ্দালক বললেন, 'তবেই এবার বোঝ, না খেয়ে খেয়ে মন তোমার কত দুর্বল হয়ে গেছে! এখন যাও দেখি—ভাল করে পেট ভরে চারটি খেয়ে এস।'

শ্বেতকেতু এবার মায়েব কাছে গিয়ে বেশ করে পেট ভরে খাবার খেল। কি আশ্চর্য! পেট ভরবার পরই মন সতেজ হয়ে উঠল। তখন সে আবার বাপের কাছে ফিরে এল। উদ্দালক ঋষি এবার বেদের মন্ত্র জিজ্ঞাসা করতেই সে দিব্যি হুড়হুড় করে বলে গেল।

ঋষি তখন বললেন, 'এবার দেখ, পেটে দুটি অন্ন পড়বার পর তোমার দুর্বল মন সতেজ হয়ে উঠেছে। তাই বলেছিলাম বাপু, অন্নতেই মনের শক্তি, মন অন্নময়। বুঝলে এবার?'

পনের দিন উপবাসের পর চারটি পেট ভরে খেতে তখন শ্বেতকেতুর শরীর আইঢাই করছে। মন যত ভাবের ভাবনাই ভাবুক—অন্ন যে কি, তা আজ সে মর্মে মর্মে বুঝেছে। অন্ন না থাকলে মনের যে কি অবস্থা হয়—তা আর তার বুঝতে বাকী নেই। তাই সে বাপের কথার উত্তরে চটপট মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝেছি।'

॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ থেকে ॥



সে এক ঘোরঘুট্টি বন—আড়ে পাঁচ যোজন তো দীঘে তিরিশ যোজন। তার মধ্যে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। গাছে-গাছে ডালে-পালায় পাতায়-পাতায় অন্ধকার। যেন বাতাসও ঢুকতে পারে না। গাছের ডালে ঝাপটা দিয়ে বাতাস যত বলে 'সর সর', সারাক্ষণ গাছের পাতাগুলো ততই বলে 'মর্ মর্—মর্ মর্'।

এ ঘোরঘুট্টি বন ছিল এক যক্ষিণীর রাজত্ব—মুখটা ছিল তার ঘোড়ার মতন বিশ্রী। এই বনের বুক চিরে দূরের রাজপুরীর দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। সে পথ দিয়ে যত লোক আসত যেত—ঘোড়ামুখী যক্ষিণী তাদের সব ধরে ধরে খেত। বনের এক পাশে ছিল মস্ত একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের এক গুহায় ছিল যক্ষিণীর আস্তানা। তার আস্তানার সামনে নরকঙ্কালের আরও একটা ছোট পাহাড়—তাতে যে কত মানুষের হাড়গোড় আছে তার লেখাজোখা নেই।

একদা এক ধনবান সুদর্শন ব্রাহ্মণ অনেক লোকলস্কর সঙ্গে করে ওই পথে আসছিলেন। যেমনি তাকে দেখা, অমনি যক্ষিণী হা-হা করে বিকট শব্দে হাসতে হাসতে ছুটে এল। এক-এক যোজন এক-এক পলকে পার। ব্রাহ্মণের লোকলস্কর প্রাণভয়ে কে কোথায় ছুটে পালাল। ব্রাহ্মণই শুধু যক্ষিণীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। যক্ষিণী তাকে পিঠে করে নিজের গুহায় নিয়ে এল।



আনল বটে কিন্তু খেল না। ব্রাহ্মণকে যক্ষিণী বিয়ে করল। সেদিন থেকে যক্ষিণীর মন কেমন বদলে গেল। সেদিন থেকে সে যত মানুষ ধরে আনত, তাদের চাল-ডাল কাপড়-চোপড় যা থাকত তা দিয়ে ব্রাহ্মণকে খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখবার চেষ্টা করত—আর নিজে মানুষগুলোকে খেত। যখন সে মানুষ ধরতে বের হত, তখনই শুধু গুহার মুখে বড় একখানা পাথর চাপা দিয়ে যেত পাছে ব্রাহ্মণ পালায়।

এমনি ভাবে ব্রাহ্মণ আর যক্ষিণী ওই পাহাড়ের গুহায় কাল কাটাতে লাগল। তারপর অনেক দিন পরে বোধিসত্ত্ব তাঁর এক পূর্বজন্মে তাদের ছেলে হয়ে জন্মালেন। ছেলের চাঁদমুখ দেখে

যক্ষিণীর আনন্দ আর ধরে না। তাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, কত আদর করে। এদিকে নানা ভাবে ব্রাহ্মণেরও সে সেবা করে। কিন্তু গুহার বাইরে যখন মানুষ ধরতে যায়, তখন গুহার মুখে সেই বড় পাথরখানা চাপা দিয়ে যায়।

দিনে দিনে বোধিসত্ত্ব বড় হলেন। তাঁর জ্ঞান আক্কেল বাড়ল ধীরে ধীরে—গায়ে হল অসীম জোর। একদিন তিনি গুহার মুখের



পাথরখানা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তারপর বাপের সঙ্গে গুহার বাইরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেন।

যক্ষিণী ফিরে এসে শুধাল, 'পাথর সরাল কে?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমি সরিয়েছি মা।'

ছেলেকে যক্ষিণী বড় ভালোবাসত—তাই সেদিন আর সে কিছু বলল না।

এর পর বোধিসত্ত্ব একদিন বাপকে শুধালেন, 'আচ্ছা বাবা, তোমাকে দেখতে এক রকম—মাকে দেখতে আর এক রকম। কেন বাবা ?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'তোর মা যক্ষিণী—রাক্ষসী ; মানুষ খায়। তার চেহারা তাই ওই রকম। আর আমরা হলাম দুজনে মানুষ।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তা হলে আমরা এখানে থাকব কেন ? চল বাবা, যেখানে মানুষ থাকে সেখানে আমরা পালাই।'

শুনে ভয়ে ব্রাহ্মণের বুক কেঁপে উঠল। বললেন, 'আমরা যদি পালাবার চেষ্টা করি তা হলে তোর মা আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তোমার কোনও ভয় নেই বাবা। তুমি ভেব না। তোমাকে লোকালয়ে নিয়ে যাবার ভার আমাব উপর রইল।'

পরের দিন যক্ষিণী যখন বাইরে গেল তখন বোধিসত্ত্ব বাপকে সঙ্গে করে পালিয়ে গেলেন।

দুরন্ত বন—কোনও দিকে মানুষজনেব ঘর-বসতি জানা নেই। বোধিসত্ত্ব ছুটলেন আগে আগে। মানুষের সমাজে মানুষ ফিরবে—তাঁর আনন্দের সীমা নেই। বনের মধ্য দিযে ছুটে চললেন তাঁরা—এক দিন—দুই দিন—তিন দিন।···যোজন যোজন বন যেন আর শেষ হয় না।

এদিকে যক্ষিণী নিজের গুহায় ফিরে দেখল—কোথায় ছেলে, কোথায় স্বামী। গুহা শূন্য। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে যক্ষিণী ছুটল বায়ুবেগে। পলকে যোজন পার। এক জায়গায় গিয়ে ধরে ফেলল ছেলে আর স্বামীকে। ব্রাহ্মণকে বলল, 'কেন পালাচ্ছ তুমি ? তোমার কিসের অভাব বল।'

ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আমাকে কিছু বল না—দোহাই। তোমার ছেলেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

ছেলেকে বড় ভালোবাসত বলে সেদিনও যক্ষিণী কিছুই বলল না। দুজনকেই অনেক রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের গুহায় আবার ফিরিয়ে আনল।

বোধিসত্ত্ব এবার নূতন ফন্দি আঁটতে লাগলেন। মনে মনে ঠিক করলেন—মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন, তার রাজত্বের সীমা কতদূর। একবার সেই সীমার বাইরে যেতে পারলে আর তাদের পায় কে!

একদিন তিনি মাকে বললেন, 'আচ্ছা মা, তোমার রাজ্য তো আমিই পাব!'

যক্ষিণী বলল, 'পাবি বই-কি বাবা, আমার আর কে আছে!'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তবে বল—তোমার রাজ্যের সীমা কতখানি।'

যক্ষিণী ছেলের মতলব না বুঝে সব বলে ফেলল, 'ওই যে একটা পাহাড় দেখা যায়, তার পাশে আছে এক নদী। ওই নদীর জল পর্যন্ত আমার সীমা। জলে নেমে পড়লে তাকে ধরতেও পারি না—ছুঁতেও পারি না। তবে তার এপাশে আড়ে পাঁচ যোজন আর দীর্ঘে তিরিশ যোজন—এর মধ্যে সব আমার!'

এর পর বোধিসত্ত্ব কয়েক দিন চুপচাপ থাকলেন।

এক দিন, দুই দিন করে তিন দিন কেটে গেল। তিন দিন পরে, যক্ষিণী যখন আহারের খোঁজে বনে বের হয়ে গেল তখন বোধিসত্ত্ব আবার বাপকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেই পাহাড় আর নদী লক্ষ্য করে বায়ুবেগে ছুটতে লাগলেন। এত ছুটেও যেন পথের শেষ নেই। কত দূর—ওগো আরও কত দূর সেই পাহাড় আর নদী।...

এদিকে যক্ষিণী গুহায় ফিরে দেখে—গুহা শূন্য। তখন সে-ও পাগলের মত ছুটতে লাগল। কোথায় ছেলে—কোথায় স্বামী?

যক্ষিণী ডাক পাড়তে পাড়তে ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। আর পলকে যোজন পার।

বোধিসত্ত্ব তার দিগন্তভেদী ডাক শুনতে পেয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগলেন। তাঁর মনে হল—পিছনে যেন একটা ঝড় ছুটে আসছে! তার বুকফাটা কান্নায় যোজনবিস্তৃত বনভূমি কাঁপতে লাগল—আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ল!

যক্ষিণী যখন সেই পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে এসে পৌঁছল, তখন বোধিসত্ত্ব জলে নেমে পড়েছেন—ব্রাহ্মণও মরি-বাঁচি করে সাঁতার কাটছেন।



রাজ্যের সীমানার বাইরে যক্ষিণীর আর হাত নেই। সে তখন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ডাকতে লাগল, 'বাছা উঠে আয়। ফিরে আয় তোর বাপকে নিয়ে। আমি তোদের কোন্ কাজটা করি না বল্। ফিরে আয়—ফিরে আয়।'

স্বামীপুত্রকে সে বার বার ডাকতে লাগল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সাঁতার দিয়া ওপারে গিয়ে উঠলেন। যক্ষিণী তখন ছেলেকেই ডাকতে লাগল, 'এমন কাজ করিস না বাছা—তুই ফিরে আয়।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মা, আমরা মানুষ—তুমি যক্ষিণী। তাই চিরকাল তোমার কাছে আমরা কেমন করে থাকব?'

'তবে ফিরবি না বাছা?' যক্ষিণী কেঁদে ফেলল।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'না।'

যক্ষিণী বলল, 'ওরে বাছা—মানুষের মধ্যে বাস করতে হলে বড় দুঃখ—বড় কষ্ট পেতে হয়।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তবু সেই ভালো। আমরা মানুষ।'

যক্ষিণী বলল, 'সেখানে যারা কোনও বিদ্যে জানে না, তারা তিষ্ঠোতে পারে না। যদি একান্তই যাবি—তবে তোকে একটা বিদ্যে শিখিয়ে দিই—শিখে যা।'

বোধিসত্ত্ব জলের মধ্যে থেকেই বললেন, 'বল।'

যক্ষিণী একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিল। মন্ত্রের নাম চিন্তামণি বিদ্যা। বলল, 'এই বিদ্যের বলে বার বছর আগেও যে লোক চলে গেছে তার পায়ের চিহ্ন দেখতে পাবি। মানুষের মাঝখানে তুই এই বিদ্যে ভাঙিয়েই খেতে পরতে পাবি।'

বোধিসত্ত্ব বিদ্যা গ্রহণ করে দূর থেকেই মাকে জোড় হাতে প্রণাম করলেন। বললেন, 'এবার তবে যাই মা।'···

যক্ষিণী ডাক পেড়ে কেঁদে উঠল, 'ওরে, তোরা না থাকলে আমি বাঁচব না—আমি বাঁচব না।'··

এই বলে যক্ষিণী সজোরে বুক চাপড়াতে লাগল। পুত্রশোকে বুক ফেটে সে সেখানেই পড়ে গেল, আর উঠল না।

মায়ের মৃত্যু দেখে বোধিসত্ত্ব থমকে দাঁড়ালেন। ওপার থেকে বাপকে ডাকলেন। তারপর দুইজনে যক্ষিণীর মৃতদেহ সৎকার করে নদী পার হয়ে চললেন বারাণসীর দিকে।

বারাণসীতে এসে বোধিসত্ত্ব বারাণসী-রাজের কাছে খবর পাঠালেন—একজন পদচিহ্নকুশলী এসেছে।

রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

রাজসভায় ঢুকে বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করলেন।

রাজা শুধালেন, 'তুমি কি বিদ্যে জান?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, বার বছর আগেও যে জিনিস চুরি গেছে—চোরের পদাঙ্ক দেখে তা আমি বার করে দিতে পারি।

'বেশ।' রাজা বললেন, 'আজ থেকে তবে তুমি আমার কাজে বহাল হলে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কিন্তু মহারাজ, আমার বেতন রোজ হাজার টাকা।'

রাজা বললেন, 'আচ্ছা, তাই তুমি পাবে।'

রাজার আদেশে রোজ তাঁকে হাজার টাকা বেতন দেওয়া হতে লাগল।

রাজপুরোহিতের কিন্তু এটা ভালো লাগল না। কে না কে—কি তার বিদ্যে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল!

একদিন রাজপুরোহিত রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, লোকটির বিদ্যের পরীক্ষা হোক। সত্যিই ও কোনও বিদ্যে জানে কিনা কে জানে!'

রাজা বললেন, 'বেশ, পরীক্ষা হোক।'

তখন দুই জনে অনেক শলাপরামর্শ করে রাজ-ভাণ্ডার থেকে বহুমূল্য মণিমানিক নিয়ে প্রাসাদ থেকে নামলেন। সোজা পথে নামলেন না—নামলেন অনেক ঘুরপাক খেয়ে। অন্ধকারে তিনবার রাজপ্রাসাদ বেড় দিলেন, তারপর পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে মই ফেলে নীচে নামলেন। আবার উঠলেন, আবার নামলেন। আবার উঠলেন, আবার নামলেন। তারপর রাজপুরীর মধ্যে যে

সরোবর আছে তার চারিপাশ তিনবার ঘুরলেন। শেষকালে মণি-মানিকের পেটিটি সরোবরের মাঝখানে পুতে রাখলেন। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।



পরদিন সকালবেলা সোরগোল পড়ে গেল—রাজ-ভাণ্ডার থেকে বহুমূল্য মণিমানিক সব চুরি গেছে। রাজপ্রাসাদ তোলপাড়—রাজপুরী তোলপাড়। রাজ্যের লোক 'হায় হায়' করতে লাগল।

রাজা যেন কিছুই জানেন না—এ ভাবে বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন, 'রাজভবন থেকে বহু রত্ন চুরি গেছে। এখন তোমার বিছার গুণ দেখাও।'

'যে আজ্ঞা মহারাজ', বলে বোধিসত্ত্ব নির্জনে গিয়ে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করলেন। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতেই বহু ঘুরপাক-খাওয়া পায়ের দাগ সব দেখতে পেলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, দুজন চোরের পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি।'

রাজা বললেন, 'চোর ধর।'

রাতের বেলা রাজা আর রাজপুরোহিত যেমন যেমন ঘুরপাক খেয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব সেভাবে তাঁদের পায়ের দাগ দেখে দেখে চললেন। শেষ পর্যন্ত সরোবরের মাঝখান থেকে রত্নের পেটি উদ্ধার করে এনে দিলেন।

ব্যাপার দেখবার জন্য তখন রাজ্যসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে। বোধিসত্ত্বের বাহাদুরি দেখে সকলে হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হল—কে জানে, এ লোকটা রাত্রির ব্যাপার হয়তো সবই দেখেছে। তাই তিনি বললেন, 'রত্ন তো পাওয়া গেল—এখন চোর ধরে দাও দেখি।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, চোর বড় পদস্থ। সে চোর না ধরাই ভালো।'

রাজা বললেন, 'কেন ?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তো নিস্তার নেই। চোর সেই রক্ষক।'

রাজা বললেন, 'তোমার ঠারে ঠুরে অত কথা বুঝি না। তুমি তোমার বিদ্যের জোরে হাতে-নাতে চোরটি ধরে দাও। বাস্।'

ওদিকে রাজ্যের লোকও তখন সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'দাও—চোর ধরে দাও। চোরকে আমরা শাস্তি দেব।'

বোধিসত্ত্ব রাজাকে বাঁচাবার জন্য বললেন, 'ঠারে ঠুরে আবার বলছি মহারাজ, যিনি সকলের ধন রক্ষার কর্তা—চোর তিনিই। এর বেশী আর জানতে চাইবেন না।'

রাজা বললেন, 'বাপু, আমি তোমার ঠার-ঠুর বুঝি না। হয় চোর ধরে দাও—নয় বুঝব, তুমিই চোর। তুমিই চুরি করে সরোবরের মাঝখানে ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলে।'

রাজার কথা শুনে ক্রুদ্ধ জনতা বোধিসত্ত্বের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল।

বোধিসত্ত্বও রাজার অপমানকর কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'তবে কি মহারাজ একান্তই চোর ধরতে চান?'

রাজা বললেন, 'চাই বই-কি।'

রাজ্যের লোকও একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'চাই।'...

বোধিসত্ত্ব মনে মনে বললেন, 'আমি এই রাজাকে রক্ষা করতে চাইলাম—কিন্তু বুদ্ধির দোষে ইনি তা করতে দিলেন না'। তারপর তিনি রাজ্যের সমস্ত লোককে ডেকে বললেন, 'তোমরা তবে শোন, যাঁরা এতদিন তোমাদের উপকার করতেন, এখন তাঁরাই হয়েছেন তোমাদের ভয়ের কারণ। তোমাদের সম্পত্তিই রাজার সম্পত্তি, রাজা তোমাদের সম্পত্তির রক্ষক মাত্র। এখন সেই রাজা আর তাঁর পুরোহিত মিলে রাজ্য লুঠ করতে নেমেছেন। রক্ষক আজ ভক্ষক। অতএব তোমরা এবার আত্মরক্ষা কর।'

শুনে প্রজাসাধারণ ক্ষেপে উঠল। কি! রাজা নিজে চুরি করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চান! অতএব ইনি যাতে আর এরকম চুরি না করেন তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। 'মার এই পাপিষ্ঠ রাজাকে'—এই বলে সকলে রাজা ও রাজপুরোহিতকে লাঠি ঢিল মুগুর—হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। মারের চোটে রাজা ও রাজপুরোহিত সেখানে মারা গেলেন। তারপর প্রজারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করে নিল।

।। জাতক থেকে ।।



করুণা

একদিন কোশলবাজ প্রসেনজিৎ গভীর বাতে ভয়ানক সব শব্দ
নে জেগে উঠে বসলেন। কারা যেন সব কান্নাকাটি কবছে।
ারপর আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকী রাতটা ভয়ানক দুশ্চিন্তায়
াটল। তাঁর মনে হল—এ সমস্ত অমঙ্গল শব্দ শোনাব পর মানুষ
ার বাঁচে না। এ অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচতে হলে নিশ্চয়ই
াহ্মণ-পুরোহিত ডাকিযে কিছু একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা দবকাব।
ইসব ভেবে কোশলরাজ ভোর ভোর গিয়ে হাজিব হলেন জেতবনে
যখানে ধ্যান করছিলেন গৌতম বুদ্ধ।

কোশলরাজ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস কবলেন, 'প্রভু, নানা রকম
শুভ শব্দ শুনেছি। আমাব কোনও বিপদ হবে না তো?'

বুদ্ধদেব হেসে বললেন, 'কেবল আপনিই যে এইরকম কান্নাকাটি
শুনেছেন তা নয়, অতীতেও রাজারা এইরকম অনেক শব্দ শুনেছেন।
শুনুন তবে একবারের কথা বলি।'

কোশলরাজ এবং বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য দুজন—আনন্দ ও
ারিপুত্র, আরও অনেক শিষ্য বুদ্ধদেবের কথা শোনবার জন্য উৎসুক
য়ে উঠলেন।

বুদ্ধদেব তাঁর আগের এক জন্মের কথা বলতে লাগলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন খুব বড়লোক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন। তিনি যখন বড় হলেন এবং তক্ষশিলায় গিয়ে সব লেখাপড়া সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরে এলেন তখন তাঁর বাপ-মা মারা গেলেন। বোধিসত্ত্ব তারপর আর সংসারে থাকলেন না। বাবার সব ধন-দৌলত বিলিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন হিমালয়ে তপস্যা করতে। বেশ কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বারাণসীতে ফিরে এসে রাজার বাগানের এক কোণে এক গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন।

এইসময়ে একদিন বারাণসীরাজ গভীর রাতে আট রকমের শব্দ শুনতে পেলেন—পশুপাখি আর মানুষের কান্না। কোথায় যেন একটা বক আর্তনাদ করে উঠল। তারপর একটা কাক করুণ ভাবে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুণ-পোকা কোথায় কটকট করে উঠল। তারপর একটা কোকিল যেন কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পরে একটা হরিণ আর একটা বানর বড় করুণ শব্দ করে উঠল। তারপর একটা কিন্নরের কান্না—এ এক অদ্ভুত জীব, শরীরটা মানুষের মত কিন্তু মুখটা ঘোড়ার ঢঙ। কিন্নরের বড় বেদনাপূর্ণ অস্পষ্ট করুণ কান্নায় রাজা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সব শেষে এক সন্ন্যাসী যেন মরবার সময়ের একটা শেষ প্রার্থনা-গান গেয়ে গেয়ে থেমে গেল।

চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার! কেউ কোথাও নেই—অথচ কান্নার শব্দ আসছে! বারাণসীরাজ রাতে আর ঘুমোতে পারলেন না। নানা দুশ্চিন্তায়, নানা অমঙ্গলের ভয়ে তাঁর বাকী রাতটুকু কাটল।

পরের দিন সকালে বারাণসীরাজ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পুরোহিত ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আসতে তিনি বললেন, 'বলুন—এসব কান্নাকাটির মানে কি?'

ব্রাহ্মণেরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে বললেন, 'মহারাজ—এসব ভয়ানক খারাপ। আপনার ভয়ানক বিপদ দেখছি। আপনাকে খুব বড় যজ্ঞ করতে হবে।'

রাজা বললেন, 'ঠিক আছে। করুন, কত বড় যজ্ঞ করবেন।'

তখন ব্রাহ্মণেরা মহা আনন্দে যজ্ঞের আয়োজন করতে লেগে গেলেন। এল হাজার মণ ঘি, হাজার হাজার পশু—বলি পড়বে। চারদিকে ব্রাহ্মণের হাঁকডাক আর তার মাঝখানে বলির পশুগুলোর আর্তনাদ—সবটা মিলে খুব হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেল।



ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি প্রধান পুরোহিত—তাঁর এক শিষ্য ছিল, তার বয়স অল্প। পশুগুলোর করুণ আর্তনাদে তার ভয়ানক খারাপ লাগছিল। সে তার গুরুকে গিয়ে বললে, গুরুদেব, এতগুলো প্রাণীকে এরকম নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলবেন না।'

গুরুদেব বললেন, 'তুমি কি জান বাপু? তোমার কাজ হল—রাজার ধন ঘাড়ে করে ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখ না, আমরা কত মাছ মাংস খেতে পাব।'

শিষ্য বললে, 'গুরুদেব, শুধু খাওয়ার জন্য এ পাপ করবেন?'

তার কথা শুনে সমস্ত ব্রাহ্মণ চটে গেল।

'বেশ, আপনারা তবে মাছ মাংস খাওযার যোগাড় করুন।' এই বলে সেই তরুণ শিষ্য রাজবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে নামল। মনে মনে ভাবতে লাগল—এমন কোনও সন্ন্যাসী কি নেই যিনি এসে রাজাকে বোঝাতে পারেন!

বেচারী একা একা মন খারাপ করে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল রাজার বাগানে। সেখানে দেখা হয়ে গেল বোধিসত্ত্বের সঙ্গে। তপস্বী বোধিসত্ত্ব তো আগে থেকেই বাগানের এক গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে আছেন। তরুণ শিষ্যটি তাঁকে প্রণাম করে বললে, 'রাজা বহু প্রাণী হত্যার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে কি বাধা দেওয়া উচিত নয়?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'নিশ্চয়ই উচিত।'

তরুণ শিষ্য বললে, 'রাজা কি সব অশুভ শব্দ শুনেছেন—তারই জন্য এই পশুহত্যার ব্যবস্থা। আপনি কি সেই সব শব্দের ফলাফল জানেন?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'জানি!'

তখন তরুণ শিষ্যটি ছুটল আবার রাজবাড়িতে। রাজাকে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আপনার বাগানে একজন তপস্বী আশ্রয় নিয়েছেন—তিনি আপনার ওই অমঙ্গলকর শব্দগুলির ফলাফল জানেন।'

'জানেন!' রাজা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন সেই তপস্বী বোধিসত্ত্বের কাছে। তপস্বীকে প্রণাম করে রাজা বললেন, 'বলুন—সে সব শব্দের কি ফলাফল।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, ওই সব শব্দ শুনে আপনার কোনও অমঙ্গল হবে না। আপনি প্রথমে যে বকের শব্দ শুনেছিলেন সে

বকটি আছে আপনার পুরানো বাগানে। সে খিদেয় চীৎকার করে কাঁদছিল। কেঁদে বলছিল—হায়, এখানে আমার বাপ-পিতামহ সুখে জীবন কাটিয়ে গেছে। এক সময়ে এখানে সুগভীর সরোবর ছিল—কিন্তু আজ তাতে জল নেই, তাই তাতে মাছও নেই। আজ আমি খেতে পাই না। অথচ এই পুবানো ঘরের মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন চায় না।'

বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন,'মহারাজ, বকের এই খিদের কান্না যদি থামাতে চান তাহলে আপনার পুরানো বাগান আর তার সবোবর সংস্কার করুন।'

রাজা অমনি মন্ত্রীকে সেই আদেশ দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'তারপব শুনেছেন আপনি কাকের শব্দ। ওই কাকটি আপনার হাতীশালের দরজার ওপরে বাসা করেছে। কিন্তু তার যতবার বাচ্চা হয় ততবাবই আপনার মাহুত হাতী নিয়ে বেরুবার সময় তাব বাসাটা ভেঙে দেয় তাই সে দুঃখে কাঁদছিল। আপনি মাহুতকে সাবধান করে দিন।'

বাজা তক্ষুনি মাহুতকে ডেকে তাকে বরখাস্ত করে দিয়ে নতুন মাহুত নিযুক্ত করলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহাবাজ, তারপর আপনি শুনেছেন একটা ঘুণ-পোকার কাঠ কাটা কটকট শব্দ। আপনার প্রাসাদের যে কাঠের চুড়ো—তার মধ্যে আছে একটা ঘুণ-পোকা। সে এতদিন কাঠেব অসার ভাগটা খেয়ে ফেলেছে। সার খাওয়াব শক্তি তার নেই। তাই সে দুঃখে কাঁদছিল! ঘুণ-পোকাটাকে বের করে দিন!'

রাজার আদেশে লোকলস্কর ছুটল ঘুণ-পোকাটা বের করবার জন্য।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এর পরে আপনি শুনেছেন একটা কোকিলের শব্দ। আপনার একটা পোষা কোকিল আছে?'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ প্রভু, আছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কাল রাত্রে সেই কোকিলটা হঠাৎ তার জন্মভূমি দূরের এক বনেব কথা ভেবে দুঃখ করে বলছিল—

এ বাজভবন হতে মুক্তিলাভ করি হায়, বনে কি ফিরিব আমি আর।
শাখা-পল্লবের কুঞ্জে গান গেয়ে কত সুখে মনে হবে আনন্দ আমার ॥'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, ওর মনে বড় দুঃখ, কোকিলটাকে ছেড়ে দিন।'

রাজা কোকিলটাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, তারপর আপনি শুনেছেন আপনাবই পোষা হরিণটার করুণ ডাক। এই হরিণটি যখন বনে ছিল, তখন সে ছিল তার দলের নেতা। সে তার সঙ্গী বন্ধুদের কথা মনে করে কেঁদে কেঁদে বলছিল—যদি একবার মুক্তি পাই তাহলে আবার সেই বনে গিয়ে সকলের আগে আগে মনের সুখে ঘুবে ঘুরে বেড়াই। সেখানে ছিলাম আমি যূথপতি—আর এখানে আমি বন্দী। মহারাজ, হবিণটিকে মুক্তি দিন।'

বাজা লোক পাঠালেন হরিণটিকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসবাব জন্য।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আপনার বাড়িতে একটা পোষা বানর আছে?'

রাজা বললেন, 'আছে, প্রভু।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ওই বানবটি ছিল হিমালয় পর্বতের এক বনে—বানবদের এক দলের নেতা। ভরত নামে এক ব্যাধ তাকে ধরে এনেছে আপনার কাছে। সে দুঃখ করে কাঁদছিল—

ভবত ব্যাধেব জাত ধরি মোবে এনেছে হেথায়।
ছেড়ে দাও দয়া কবে, মঙ্গল হইবে, এ যন্ত্রণা সহা নাহি যায় ॥

মহারাজ, ওর দুঃখ হরিণেরই মত। ওকেও ছেড়ে দিন।'

রাজা তাকেও মুক্তি দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, আপনি একটি কিন্নর ধরে এনে রেখেছেন?'

রাজা বললে, 'হ্যাঁ।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ওই কিন্নর তার ঘরের কথা, তার স্ত্রীর কথা ভেবে ভেবে কাঁদছিল। কোথায় পড়ে আছে তার স্ত্রী হিমালয়ের কাছে! আপনি ওকেও মুক্তি দিন।"

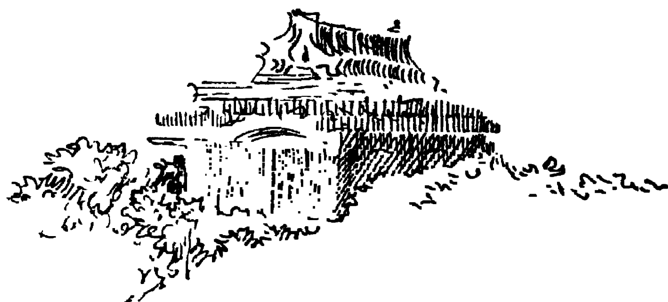
রাজা তাকেও মুক্তি দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শেষ শুনেছেন আপনি এক তপস্বীর অন্তিম প্রার্থনা গান। আপনার বাগানে এসে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তিনি ইহজন্মের দুঃখ থেকে পার পেয়ে নির্বাণ লাভ করেছেন। সেই আনন্দে তিনি তাঁর শেষ প্রার্থনা গানটি গেয়ে উঠেছিলেন। চলুন মহারাজ, তাঁর শেষ কাজ করে আসি। আপনার কোনও শব্দ থেকে কোনও অমঙ্গল হবে না। চলুন।'

রাজা তাঁর লোকলস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হাজির হলেন সেই তাপসের মৃতদেহের কাছে। ফুল-চন্দন-মালা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন তাঁর দেহ। আর বোধিসত্ত্বের উপদেশে তিনি বলির পশুগুলিকে সব ছেড়ে দিলেন। ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করে দিলেন সেই দিনই —আজ থেকে কেউ আর প্রাণিহত্যা করবে না।

পূর্বজন্মের কথা শেষ করে বুদ্ধদেব কোশলরাজকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কোনও ভয় নেই। অতীতে রাজাদের ভয় দেখিয়ে ব্রাহ্মণরা অনেক বড় বড় যজ্ঞের আয়োজন করতেন, অনেক প্রাণী হত্যা করতেন, অনেক মাছ মাংস খেয়ে পেট ভরাতেন। ভয় না করে আপনি প্রাণীদের ভালবাসুন—যজ্ঞের নামে তাদের আর বলি দেবেন না। মিথ্যে ভয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে কি হবে?'

।। জাতক থেকে ।।



বধূ বিশাখা

একবার কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাজা বিম্বিসারের কাছ থেকে একজন বড় শ্রেষ্ঠীকে চেয়ে এনে বসালেন নিজের রাজ্যে। কারণ, সেকালে শ্রেষ্ঠীই ছিল রাজ্যের গৌরব, রাজার ভূষণ, যেমন জনপদ রাজপুরীর শোভা।

শ্রাবস্তীর কিছুদূরে সাকেত। সেখানে এক মনোরম জায়গা দেখে কোশলরাজ শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের জন্য তৈরি করে দিলেন সুন্দর এক নগরী। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী সেইখানে সপরিবারে সুখে বসবাস করতে লাগল।

ধনঞ্জয়ের একমাত্র মেয়ে বিশাখা—চাঁদের কণা ছেনে তার রূপ। শ্রেষ্ঠী তাকে মানুষ করে তুলতে লাগল মনের মত করে। বাড়িতে আসে আচার্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা—তাঁদের আদর্শ আর উপদেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল বিশাখা।

সেই রাজ্যে বাস করত আর একজন সওদাগর—নাম তার মিগার শ্রেষ্ঠী, তার ছেলের নাম পূর্ণবর্ধন। তেমন নাম-ডাক নেই মিগার শ্রেষ্ঠীর—সওদাগর সে ছোটই। কিন্তু ছোট হলে হবে কি, মনের আশা তার আকাশ-প্রমাণ। একদিন ভাটদের ডেকে বলল, 'পূর্ণবর্ধনের বিয়ে দেব—খুঁজে আন সেই কন্যে—হাঁটু সমান যার কেশ, মুক্তোর মত দাঁতের পাঁতি, পদ্মের মত মুখ, আর অঙ্গ ভরে চন্দনের গন্ধ, যেন সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা। পাবে কি তেমন মেয়ে?'

ভাটবামুন কথায় ছত্রিশখানা। তারা বললে—ঢের ঢের। অমন মেয়ে ক'টা চাই ?

মিগার শ্রেষ্ঠী বললে, 'বেশী নয়—একটি শুধু খুঁজে আন।' বলে ভাটদের হাতে তুলে দিল কনে বরণের স্বুবর্ণের মালা।

এই মালা যার মাথায় জড়িয়ে দেবে—সেই হবে তার পুত্রবধূ। এমনি ছিল তখনকার ব্যবস্থা।

আটজন ভাট চলে গেল অষ্টদিকে। গেল তো গেল অষ্ট দিন, অষ্ট মাস। খুঁজে খুঁজে হয়রান—কোথায় আছে সেই দেবী প্রতিমা! ঘুরতে ঘুরতে একদিন আটজনে এসে জড়ো হল শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের নগরী সাকেতে।

সেদিন ছিল সাকেতে মস্ত এক উৎসবের দিন। রাজপথ ভরে চলেছে আনন্দ-উল্লাস। সেদিন কেউ আর ঘরে বন্ধ হয়ে নেই—সবাই বেবিয়ে পড়েছে পথে। মেয়েরা সব স্নান করতে চলেছে নদীতীরের দিকে। ভাটবাও খুঁজে খুঁজে চলল সেদিকে—যদি চোখে পড়ে যায় সেই কন্যে—হাঁটুসমান কেশ যার, মুক্তোর মত দাঁত, পদ্মের মত মুখ আর অঙ্গ ভরে চন্দনের গন্ধ, যেন সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিমা!

শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের মেয়ে বিশাখাও চলেছে নদীতীরের দিকে—সঙ্গে তার পাঁচশ' সখী। তারা যেন চাঁদের আলোয় তাবার সভা। কেযূব-কঙ্কণ-চন্দ্রহারের মণিমুকুতায় জোনাকীর ঝিকিমিকি।

এমন সময় ঝর ঝর করে নামল একখণ্ড উড়ো মেঘের বৃষ্টি। হাত ঝমঝম—পা ঝমঝম, মেয়েরা হুড়মুড় হুড়হুড় করে ছুটল নদীতীরের স্নান-ঘরের দিকে। জলে ভিজতে ভিজতে ছুটল ভাটরাও। গিয়ে আশ্রয় নিলে স্নান-ঘরের বাইরের দালানে।

সবাই ছুটে এল—কিন্তু একটি মেয়ে আর ছোটে না। ধীর-মন্থর পা ফেলে ফেলে স্বাভাবিক চলনে চলেছে তো চলেছেই—

যেন রাজহংসী। বসন-ভূষণ ভিজে গেল তার বৃষ্টির জলে। কিন্তু সেদিকে যেন তার খেয়ালই নেই। সে হল ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখা।

আটজন ভাট থমকে চেয়ে রইল বিশাখার দিকে—বুঝি বা এই সে দেবী-প্রতিমা! এতদিনের ছুটোছুটি খোঁজা-খুঁজি বুঝি সার্থক হল! চুল তো নয়, আকাশের মেঘ নেমে এসেছে যেন ওর মাথায়, ওর মুখ দেখে পদ্মও বুঝি লজ্জা পায়। এল সে চন্দনের পরিমল ছড়িয়ে—যেন ঠাকুর ঘরের লক্ষ্মী ঠাকরোনটি। কিন্তু দাঁতগুলো কি মুক্তোর মত? কেমন করে জানা যায়? মেয়েটি কথা কইবে কি হাসবে—তবে তো বুঝতে পারা যাবে। ভাটরা তখন বিশাখাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে নানা মন্তব্য করতে লাগল—যাতে বিশাখা চটে যায়।

একজন বললে, 'মা লক্ষ্মীর সব ভালো—কেবল গতরটাই যা নড়ে না। যার ঘরে যাবে, তার দিন কাটবে বাসি-আমানি খেয়ে।'

আর একজন মন্তব্য করলে, 'সবাই ছুটে এল—কিন্তু মা লক্ষ্মীর পা যেন আর ওঠে না। বড্ড অলস।'

বিশাখা বুঝতে পারলে—এ সব মন্তব্য তাকেই উদ্দেশ্য করে। কিন্তু বিশাখা চটল না—শান্ত নম্রভাবে ওদের কথার জবাব দিল। বললে, 'ছুটতে আমি সবার চেয়ে বেশীই পারি, কিন্তু ছোটাটা সব সময় ভালো না, অন্তত চারজনের বেলায়।'

কথা বলতেই ভাটরা দেখে নিলে তার দাঁত। দাঁত তো নয়, মুক্তোর পাঁতি। একজন ভাট বললে, 'কোন্ কোন্ চারজন?'

বিশাখা বললে 'প্রথম জন—রাজা। তিনি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করলে লোকে তাঁকে সাধারণ লোক ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। তাই তাঁর আস্তে আস্তে চলা উচিত। তাতেই তাঁর মহিমা। দ্বিতীয়—রাজার হাতী, তার ধীর গমনে চলাতেই রাজসম্মান। তৃতীয় জন—সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। সাধারণ

সংসারীর মত তাঁরও ছুটোছুটি করা মানায় না। চতুর্থ হল নারী—ধীর চলাতেই তার সম্মান ও সৌন্দর্য। তা ছাড়াও আমাদের আস্তে চলার অন্য কারণ আছে।'

একজন ভাট আবার শুধোলে, 'কি সে কারণ?'

বিশাখা বললে, 'ছুটোছুটি করতে গিয়ে হাত-পা খোঁড়া হলে চির জীবন আমাদের বাপের বোঝা হয়ে কাটাতে হয়। খোঁড়া নুলো মেয়ের ভার আর কেউ নেয় না।'

তার কথা শুনে ভাটরা মুগ্ধ। একজন ভাট মিগাব শ্রেষ্ঠীর দেওয়া সেই সুবর্ণের মালাটি বিশাখার মাথায় জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তোমায় আজ পূর্ণবর্ধনেব বধূরূপে বরণ কবে নিলাম।'

এই বরণের খবর চলে গেল ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কাছে। তারপর ভাটের মুখে মিগার শ্রেষ্ঠীব ছেলে পূর্ণবর্ধনের খোঁজ-খবব পেয়ে ধনঞ্জয় খুশীই হল—বাজি হল তাব সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে। তারপর ভাটবা ছুটল শ্রেষ্ঠী মিগারের কাছে।

মিগার শ্রেষ্ঠীও মেয়েব বিববণ পেয়ে খুশী। ঠিক কবে ফেললেন যাত্রার শুভদিন—শুভলগ্ন। তারপর একদিন সেজে দাঁড়াল বিয়ের বরযাত্রী।

রাজা প্রসেনজিৎ বললেন, 'শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়েব মেয়ের বিয়ে? তবে আমিও যাব সঙ্গে।' বলে সেজে বেরোলেন তিনিও। সঙ্গে চলল তাঁর হয়-হস্তী-সেনাবাহিনী।

শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের ধন দৌলতের অন্ত নেই। লোকবলের সীমা নেই। যত বরযাত্রীই আসুক, তার ভয়-ডর নেই। বিশাখাও তেমনি বুদ্ধিমতী। ধনঞ্জয় বরযাত্রীদের সব ভার তুলে দিলে বিশাখার হাতে। বিশাখা নিপুণভাবে ব্যবস্থা করলে—কোথায় থাকবেন রাজা, কোথায় থাকবেন মিগার শ্রেষ্ঠী, কোথায় থাকবে বা হয়-হস্তী-সেনাবাহিনী, কে করবে বা তাদের তদারক।

এদিকে ধনঞ্জয় ডাক দিল পাঁচশ' কর্মকারকে—মস্ত লম্বা ফর্দ দিল মেয়ের অলঙ্কারের। দিল হীরা জহরৎ মণি মানিকের কাঁড়ি। সাকেত জুড়ে শব্দ উঠল ঠুক-ঠাক ঠুক-ঠাক। দিনে কামাই নেই—রাতে ঘুম নেই। গড়া হতে লাগল নানা ছাঁদের অলঙ্কার। এমনি করে দিনের পর দিন কাটে—কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার নাম-গন্ধও নেই।

রাজা ভাবলেন, সামান্য এক শ্রেষ্ঠীর ওপরে এ বড় অত্যাচার হচ্ছে। তাই একদিন তিনি ধনঞ্জয়কে লিখে পাঠালেন, 'আর কতদিন এতগুলো লোকের ঝামেলা পোয়াবেন, এবার মেয়ে পাঠাবার দিন ঠিক করুন।'

ধনঞ্জয় বলে পাঠাল, 'ঝামেলার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নই। চার মাস এখান থেকে আর নড়তে পারবেন না—কারণ, এবার বর্ষা নামছে।'

সাকেতের বর্ষায় পথঘাট সুদুর্গম। কাক-পক্ষীটিরও ওড়া বন্ধ। অতএব রাজা আর তাঁর রাজবাহিনী রইলেন আটকা পড়ে। আর সাকেত জুড়ে চলল প্রতিদিনের উৎসব। মালাকর যোগায় হাজার হাজার মালা, সুগন্ধি সুরভি নিয়ে ছুটোছুটি করে হাজার হাজার পরিচারিকা, সকলের অঙ্গে অঙ্গে নিত্যি নতুন পোশাকের রঙিন আশনাই, সেবক-ভৃত্যদের হাতে হাতে যায় প্রতিদিন নানা রকমের উপহার। শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কোন অভাব নেই—কারণ, ঘরে তার বিশাখারূপিণী লক্ষ্মী।

এমনি করে কেটে গেল চারটি মাস—শেষ হল সাকেতের ভয়ঙ্কর বর্ষাকাল। তারপর শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় একদিন ঠিক করল মেয়ে পাঠাবার শুভদিন শুভলগ্ন।

যাওয়ার আগের দিন ধনঞ্জয় উপদেশ দিতে বসল মেয়েকে। বললে, 'শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দশটি কাজ কোনও দিন ভুলিসনে

বিশাখা! ঘরের আগুন বাইরে নিবিনে; বাইরের আগুন ঘরে আনবিনে; তাকে দিবি—যে দেয়; যে দেয় না—তাকে দিবিনে; তবু বিশেষ জনকে দিবি—তারা ফিরে দিক আর না দিক; সুখে বসবি; সুখে খাবি; সুখে ঘুমোবি; ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ভুলিস নে; মান্য করে চলিস গৃহ-দেবতাদের।'

পাশের ঘরে বসে বসে শুনছিল মিগার শ্রেষ্ঠী। ধনঞ্জয়ের উপদেশ শুনে ভাবলে, 'এ আবার কি ছাইয়ের উপদেশ! যাই হোক, ভালোয় ভালোয় এখন মেয়েটিকে নিয়ে শ্রাবস্তীতে গিয়ে পড়তে পারলে হয়।'

তারপর ওদিকে ধনঞ্জয় সাকেতের শিল্পকর্মীদের জমায়েত করে বলল, 'তোমাদের ভিতর থেকে বেছে দাও আটজন মাতব্বর গেরস্ত লোক—যারা আমার মেয়ের সঙ্গে যাবে, মেয়ের কাছে থাকবে। মেয়ে যদি আমার কখনও অপরাধ করে—তারাই তার বিচার করে দেবে।'

শিল্পকর্মীরা পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করে দিল।

মেয়ের মা বললে, 'সবই হল—কিন্তু দাস-দাসী তো পাঠালে না! আমার মেয়ের ফাই-ফরমাস খাটবে কে?'

ধনঞ্জয় বললে, 'সে আমি কারুকে জোর করে পাঠাব না। চোদ্দখানা গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যাব ডাক দিয়ে দিয়ে—যার ইচ্ছে হবে সেই যাবে।'

কিন্তু যেমন বলা—'কে যাবে আমার মেয়ের সঙ্গে'—অমনি গাঁ ভেঙে পিলপিল করে চলল যে কত লোক, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বিশাখা যে সবার প্রিয়!

কিন্তু মিগার শ্রেষ্ঠীর চক্ষু চড়ক গাছ! সে শুধোলে, 'এরা কারা?'

একজন বলল, 'তোমার পুত্রবধূর যারা ফাই-ফরমাস খাটবে—তারা।'

'হায় সর্বনাশ! অত লোককে খেতে দেব কোথা থেকে! তাড়াও—তাড়াও, মেরে তাড়াও।'

মিগার শ্রেষ্ঠীর হুকুম পেয়ে তার লোকজন মহা উৎসাহে লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাদের তাড়া করল, ছুঁড়তে লাগল বড় বড় পাথরের চাঁই।

বিশাখা বললে, 'এ কী!'

মিগার শ্রেষ্ঠী বললে, 'ভেবো না মা লক্ষ্মী! এই লাঠি-কোঁৎকা খেয়ে যে পালাবার সে পালাবে—যে যাওয়ার সে ঠিক যাবে।'

এই ভাবে বিশাখার অনুরক্ত দাসদাসী বাছাই হয়ে চলল বিশাখার সঙ্গে সঙ্গে। তাও অনেক। মিগার শ্রেষ্ঠী 'হায় হায়' করতে লাগল, 'এও যে কম নয়। খেতে দেব কোত্থেকে!'

এমনি বিরাট মিছিল আর নানা বাজনা-বাদ্যি করে বধূ বিশাখা এল শ্বশুরবাড়ি। গোটা শ্রাবস্তীর লোক দেখতে লাগল অবাক বিস্ময়ে। মানুষ-জন, হয়-হস্তী আর গোরুর এমন মিছিল, এত মণিমানিকের যৌতুক কখনও তারা দেখেনি, কখনও দেখেনি এমন অপরূপ রূপবতী কন্যা—যেন সত্যিই স্বর্গের দেবী-প্রতিমা।

এবার শুরু হল বিশাখার বধূ-জীবন। বাপের উপদেশ তার মনে গাঁথা আছে—আর গাঁথা আছে কবে সেই একবার সাত বছর বয়সে শোনা স্বয়ং বুদ্ধদেবের বাণী। প্রতিদিন মনে মনে জানায় সে তথাগতের উদ্দেশে প্রণাম। কিন্তু শ্বশুর তার জৈন সন্ন্যাসীর ভারি ভক্ত। একদিন সে একদল জৈন সন্ন্যাসীকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনল। তাদের খাওয়াল-দাওয়াল—আদর আপ্যায়ন করল। তারপব তাদের সব বিদেয় করে দিয়ে নিজে খেতে বসল বহুমূল্য আসনে। সোনার থালায় পায়েস পরমান্ন পরিবেশন করল বিশাখা।

এমন সময় দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বিশাখার সাধ হল—ওই সন্ন্যাসীকেও ডেকে খেতে দেয়। কিন্তু শ্বশুর আদেশ না করলে হয় না। তাই শ্বশুর যাতে সন্ন্যাসীকে দেখতে পান—এমন ভাবে বিশাখা সন্ন্যাসীর দিকে উঠে গেল। শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী চোখ তুলে একবার দেখল—তারপর হাঁ-ও করল না, হুঁ-ও করল না। যেমন খাচ্ছিল—তেমনি খেতে লাগল গপগপ করে।

ব্যাপারটা বিশাখার মনে বড় লাগল। সন্ন্যাসীকে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিছু হবে না—আপনি যান। উনি বাসি খাবার খাচ্ছেন।'

সন্ন্যাসী বিদায় হল। তখন শ্বশুর উঠল চটে। বললে, 'কী, আমি সোনার থালায় খাচ্ছি পরমান্ন—আর তুমি কি না ওই সন্ন্যাসীটাকে বললে, বাসি খাবার! আমি খাচ্ছি বাসি খাবার?'

আর খাওয়া হল না মিগার শ্রেষ্ঠীর—হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। তারপর হুকুম দিল নিজেব লোকজনকে, 'ওই বৌকে এক্ষুনি বিদেয় কর।'

বিশাখা নম্র ভাবে বলল, 'বাবা আমার সঙ্গে পঞ্চায়েৎ পাঠিয়েছেন—তাঁরাই সব শুনে বিচার করে দিন।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বললে, 'ডাক পঞ্চায়েৎ।'

সেই আটজনের পঞ্চায়েৎ এসে বসল ঘরে। মিগার শ্রেষ্ঠী পেশ কবল বিশাখার অপরাধ। সোনার থালার পরমান্নকে নোঙরা বাসি খাবার বলে অপমান করা কি যে-সে অপরাধ! মিগার শ্রেষ্ঠী রাগে ফুঁসতে লাগল।

পঞ্চায়েৎ শুধাল বিশাখাকে, 'এ কি সত্যি?'

বিশাখা বললে, 'দুয়োরে দাঁড়ান অতিথিকে না দিয়ে যে খাবার খাওয়া হয়—সে খাবার বাসি খাবারেরই মত। উনি যখন খাচ্ছিলেন তখন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছিলেন, উনি দেখেও দেখলেন না।'

পঞ্চায়েৎ বলল, 'তবে তো আমাদের মেয়ে ঠিক কথাই বলেছে।'

মিগার শ্রেষ্ঠী চটে বলল, 'তা না হয় হল, তবু ও ডাইনী। একদিন দেখেছি, মশাল জ্বেলে কয়েকজন সখীর সঙ্গে রাত্রে কোথায় বেরিয়ে গেল।'

পঞ্চায়েৎ বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলে, 'এ কথা কি সত্যি ?'

'না।' বিশাখা বলল, 'সেদিন একটা তেজী ঘোড়ার বাচ্চা হল। তার পরিচর্যার জন্য দেখলাম কেউ গেল না। ভালো জাতের ঘোড়ার পরিচর্যা দরকার—তাই আমি গেছিলাম।'

পঞ্চায়েৎ বললে, 'তবে তো আমাদের মেয়ের দোষ দেখি না।'

মিগার শ্রেষ্ঠী রাগে টগবগ করতে করতে বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু ওর বাবা ওকে কী সব উদ্ভট উপদেশ দিয়েছিল আসবার সময়—তার মানে কি ? সে সব কী সৎ গেরস্তের কথা ! ছি ছি !'

পঞ্চায়েৎ শুধাল, 'কি বলেছিল ?'

মিগার শ্রেষ্ঠী বলল, 'ঘরের আগুন বাইরে নেবে না। তা পড়শীর ঘরে আগুন যদি না থাকে—তাকে একটু আগুন দেবে না ?'

বিশাখা বলল, 'আমার বাবা ওই অর্থে ওই কথা বলেন নি। ও কথার মানে হল—শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীর কোনও দোষ দেখলে তা বাইরে বলবে না, তা ঘরে আগুন লাগানোর চেয়েও খারাপ।'

পঞ্চায়েৎ বললে, 'তবে তো আমাদের মেয়ের দোষ দেখি না।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু ওর বাবা বলেছিল—'বাইরের আগুন ঘরে নেবে না।' তা আমাদের ঘরে যদি কখনও আগুন নিভে যায়, তা হলে পড়শীর বাড়ি থেকে এক-আধটুক আগুন না আনলে চলবে ?'

বিশাখা বললে, 'এর মানে ওই নয়। ওর মানে হল—পাড়ায় যদি কেউ শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীর সম্পর্কে কু-কথা বলে, তা হলে তা কখনও ঘরে এসে বলবে না।'

পঞ্চায়েৎ বললে, 'তবে তো আমাদের মেয়ের দোষ দেখি না।'

কিন্তু বোকা মিগার শ্রেষ্ঠী কি তবু থামে! ধনঞ্জয়ের উপদেশগুলোর আসল মানে সে বোঝেইনি। বার বার তাই সে জিজ্ঞেস করে—আর বিশাখা তার উত্তর দেয়। সব কথার পর মিগার শ্রেষ্ঠী বুঝল—যে ধার নিয়ে শোধ দেয় না, তাকে আর ধার দিতে নেই; কিন্তু আত্মীয় কুটুম বন্ধু—তারা দিতে পারুক আর না পারুক, তাদের দিয়ে-থুয়ে খেতে হয়; শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে বসে থাকতে নেই—উঠে দাঁড়াতে হয়; শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাইয়ে-দাইয়ে তবে নিজে খাবে; তাঁদের সামনে কখনও শুয়ে থাকবে না; তাঁদের মান্য করবে স্বয়ং অগ্নির মত; তাঁরাই তোমার ইহ-জীবনের গৃহদেবতা। এসব কথার মানে বুঝে মিগার শ্রেষ্ঠীর লজ্জায় মাথা হেঁট। দশ কথায় ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মেয়েকে দিয়ে দিয়েছে সেকালের বধূ-জীবনের সব উপদেশ।

এই বিশাখাকে মিগার শ্রেষ্ঠী কি-না তাড়িয়ে দিতে চাইছিল! বিশাখা তাই অভিমানে এবার বলল, 'যাক, আপনি তো আমায় তাড়িয়ে দিতে চাইছিলেন—তা এবার আমি বাপেব বাড়ি যেতে চাই।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বলল, 'না বুঝে আমার দোষ হয়েছে মা—তুমি যেয়ো না।'

বিশাখা বলল, 'থাকতে পারি—যদি একটি অনুমতি দেন।'

'বল কি অনুমতি? তোমাকে আমি সব দেব।'

বিশাখা বলল, 'আমার বাবা বুদ্ধভক্ত, আমিও তাঁর উপাসিকা। যদি এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করেন—তা হলে থাকতে পারি।'

'কর তোমার যা খুশি'—বলে মিগার শ্রেষ্ঠী তো অনুমতি দিল। কিন্তু তার জৈন সন্ন্যাসীরা তাকে চেপে ধরল, 'খবরদার, ওদের ডেক না।'

কিন্তু বিশাখা ওদিকে স্বয়ং তথাগতকে তাঁর দলবল-সহ একদিন নেমন্তন্ন করে বসল। তারপর বুদ্ধদেব যখন এসে পড়লেন তখন সে শ্বশুরকে খবর পাঠাল—'আপনিও আসুন।'

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জৈন সন্ন্যাসীরা গিয়ে আবার চেপে ধরল মিগার শ্রেষ্ঠীকে, 'খবরদার, যেয়ো না ওই গৌতম মুনির কাছে।' মিগার শ্রেষ্ঠী দো-টানার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশাখা এসে বলল, 'অন্তত তাঁর উপদেশগুলো শুনুন।'

মিগার শ্রেষ্ঠীর যাওয়ার ইচ্ছে—দেখাই যাক না, বুদ্ধদেব কি উপদেশ দেন। কিন্তু জৈন সন্ন্যাসীরা হুঁশিয়ার করে দিয়ে আবার বলল, 'যাও—কিন্তু নিজে তুমি পর্দার আড়াল থেকে শুনবে। ওর সামনা-সামনি পড়লে তুমি জাদু হয়ে যাবে।'

কিন্তু হায়, যাঁর বাণী রাজার পরিখা-প্রাচীর ভেদ করে, সমুদ্র-পর্বত পার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়, তাঁকে কি রুখতে পারে ওই সামান্য পর্দার অন্তরাল! উপদেশ শুনতে শুনতে মিগার শ্রেষ্ঠী ছুটে এল একদিন পর্দা ছিঁড়ে। এসে লুটিয়ে পড়ল তথাগতের চরণে। দেখতে দেখতে গোটা পরিবারটি হয়ে উঠল তথাগতের ভক্ত। জৈন সন্ন্যাসীরা বিরক্ত হয়ে মিগার শ্রেষ্ঠীকে ছেড়ে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বধূ বিশাখার গুণের কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল গোটা শ্রাবস্তী। যেমন তার গৃহধর্ম—তেমনি তার ধর্ম আচরণ। ঘরের কাজ-পাট সেরে করে অন্ধ-আতুরের সেবা, অসুস্থ ভিক্ষুদের পরিচর্যা। তারপর জেতবনে যায় বুদ্ধের উপদেশ শুনতে। দেখতে দেখতে শ্রাবস্তীর গোটা নারী-সমাজ তাকে আদর্শ বলে মেনে নিল। সেবায় পরিচর্যায় তারা অনুকরণ করে বিশাখাকে, তার পেছনে পেছনে যায় জেতবন পর্যন্ত—শোনে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী।

এমনি যেতে-আসতে বিশাখা একদিন জেতবনে গিয়ে ভুলে ফেলে এল একখানা অলঙ্কার। আনন্দ সেটি তুলে রাখলেন বিশাখাকে

দেবেন বলে। বুঝলেন—এ বহুমূল্য অলঙ্কার বিশাখার ছাড়া আর কারুর নয়। কিন্তু মহাভিক্ষু আনন্দ যা হাত দিয়ে ছুঁয়েছেন তা আর বিশাখা ফেরৎ নেবে কি করে? অথচ অলঙ্কারখানা পড়ে থাকলেও তো কোনও কাজে লাগবে না ভিক্ষুদের। বিশাখা তখন সেটি নিয়ে বেচতে পাঠাল। কিন্তু শ্রাবস্তীতে তার খদ্দের পাওয়া গেল না—কে কিনবে অত মূল্যের অলঙ্কার! তখন বিশাখাই সেটি কিনে নিল কোটি কোটি টাকা দিয়ে। তারপর তথাগতকে গিয়ে বলল, 'কি করব এই টাকা দিয়ে—আদেশ করুন।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'শ্রাবস্তীর পুবদিকে ভিক্ষুদের জন্য একটা বিহার তৈরি কব।'

বধূ বিশাখার মনে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই সে শুনতে পেল—সশিষ্য বুদ্ধদেব কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন। বিশাখা ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। অভিমানভরে বলল, 'আমার যে বিহার তৈরী পড়ে রইল প্রভু!'

বুদ্ধদেব প্রশান্ত হেসে বললেন, 'যার ওপরে তোমার কাজেব ভার দিতে চাও মা—তার ভিক্ষা পাত্র চেপে ধর।'

বিশাখা দেখল, মোগ্‌গলায়নের মত কবিৎকর্মা আর কেউ নেই, ছুটে গিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র চেপে ধরল।

বুদ্ধদেব তখন তাঁকে বললেন, 'পাঁচশ' ভিক্ষু নিয়ে ফিরে যাও মোগ্‌গলায়ন, বিশাখার বিহার তৈরি করে দাও।'

মোগ্‌গলায়ন ফিরে এলেন। তাঁর অমিত কর্মদক্ষতা আর পাঁচশ' ভিক্ষুর লোকবল নিয়ে লেগে গেলেন বিহার তৈরি করতে। ন' মাস পরে স্বয়ং তথাগত যখন শ্রাবস্তীতে আবার ফিরে এলেন—তখন দেখলেন, আকাশ ছুঁয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিশাখার পূর্ব বিহার। বুদ্ধদেব বিশাখাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমার আদর্শ, তোমার কীর্তি দিকে দিকে প্রচারিত হোক।'

সেদিন বধূ বিশাখার আনন্দ আর ধরে না। আকাশ থেকে যখন নেমে এল সন্ধ্যার শান্ত ছায়া, জুঁইবনে ফুটল ফুলের রাশি, তখন বধূ বিশাখা তার ছেলেপুলে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেই গগনস্পর্শী বিহারের তলায়। বিহার প্রদক্ষিণ করে গান গাইতে লাগল মনের আনন্দে—গান তো নয়, যেন তার জীবন-জোড়া বন্দনা। কবে দেখেছিল যেন এমন স্বপ্ন—কবে জন্মেছিল যেন এমন সাধ, এমনি একটি বিহার গড়ে দেবে সে। অন্ন দেবে, বস্ত্র দেবে, সেবা দেবে—সাধ্য দেবে উজাড় করে। প্রার্থনা আজ তার সার্থক হয়েছে—স্বপ্ন-সাধ হয়েছে সফল। মনের আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে বিশাখা বিহার প্রদক্ষিণ করতে লাগল।



ভিক্ষুরা ভাবল, বধূ বিশাখার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! তারা ছুটল তথাগতের কাছে। গিয়ে বললে, 'প্রভু, বিশাখার কি মাথা

খারাপ হয়ে গেল ? তাকে গান গাইতে তো কখনও শুনিনি ! আজ সে ছেলেপুলে নিয়ে বিহারের চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে।'

বুদ্ধদেব প্রশান্ত হেসে বললেন, 'মাথা খারাপ হবে কেন, আমার মেয়ের জন্মজন্মান্তরের প্রার্থনা আজ সফল হয়েছে। তাকাও ওর জীবনের দিকে—তাকাও ওর কীর্তির দিকে।' বুদ্ধদেব কয়েক চরণ কবিতা আবৃত্তি করে বললেন, 'সুন্দর ফুলের রাশি দিয়ে মালাকর যেমন করে মালা গাঁথে—তেমনি পুণ্য কর্মের ফুলগুলি দিয়ে গেঁথে তোল তোমাদের জীবন।'

॥ বৌদ্ধকথা ধম্মপদ থেকে ॥



বন্দী ঘোড়া

অনেক কাল আগে এক রাজ্য ছিল—তার নাম হস্তিশীর্ষ। তার রাজার নাম ছিল কনককেতু। যেমন রাজার নাম, তেমনি তার রাজ্যও ছিল কনকবরণ—চারদিকে কনকের ছড়াছড়ি। রাজ্য জুড়ে ছিল বড় বড় সওদাগর—তারা হাজার দাঁড়ের জাহাজে পাল তুলে দিয়ে চলে যেত সাত সমুদ্র-পার। কোথায় কোন্ দ্বীপে আছে সোনার খনি রূপোর খনি, কোথায় আছে মণি-মানিকের খনি—সেখান থেকে জাহাজ বোঝাই করে আনত সোনা-রূপো মণি-মানিকে। সারা রাজ্য ঝলমল করত তাদের ঐশ্বর্যে।

একবার সমস্ত সওদাগর একসঙ্গে মিলে রওনা হল সমুদ্রে। বড় বড় জাহাজ দাঁড়াল সার দিয়ে—তার আশেপাশে ছোট ছোট নৌকো দিয়ে সাজান হল মস্ত এক বহর। জলে পড়ল হাজার হাজার দাঁড়। বাজল কত বাদ্যি বাজনা বাঁশি। ঘরে ঘরে উঠল শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি। কি—না, হস্তিশীর্ষের সওদাগররা চলল বাণিজ্যে। জাহাজ বোঝাই কত গজদন্তের কারুকাজ, দশার্ণ দেশের বিখ্যাত তরবারি, কত রেশম পশম মিহিন সুতোর কাপড়। জাহাজের বিরাট বহর ভেসে চলল একদিন—দুদিন—তিনদিন।

তারপর হঠাৎ একদিন সমুদ্রে উঠল ভীষণ ঝড়। জাহাজে পড়ে গেল ‘সামাল সামাল’ রব। কিন্তু সামলাবে কে! মাঝিরা হিমসিম

খেয়ে গেল—দাঁড়িরা ঘামে ভিজে নেয়ে উঠল। জাহাজগুলো ভেসে চলল ঝড়ের মুখে; কোথায়—কে জানে! দাঁড়ি মাঝি সওদাগর আর তাদের লোকলস্কর—সবাই মিলে ডাকতে লাগল তেত্রিশ কোটি দেবতাকে, যত যক্ষ রক্ষ ভূতকে। কিন্তু ঝড় তবু থামে না। সমুদ্রে উঠছে বিরাট বিরাট ঢেউ। জাহাজগুলো এই ডোবে—ওই ডোবে। ঝড়ের মুখে সেগুলো এক দিকে ভেসে চলল তো চললই। চারদিকে মেঘে মেঘে অন্ধকার। কোনও দিকে কুলের নিশানা নেই। এদিকে ছিঁড়ে গেছে জাহাজের পাল, ভেঙে গেছে দাঁড় আর হাল।

সওদাগরদের কপাল ভালো। কিছুক্ষণ বাদেই ঝড় থেমে গেল। দাঁড়ি-মাঝিরা চারদিকে চোখ মেলে দেখতে লাগল—ঝড়ের মুখে কোথায় ভেসে এসেছে তারা। হঠাৎ একদিকে দেখা গেল—ঝিলমিল করছে তীরের গাছপালা।

নৌবহরের নিয়ামক সবজান্তা লোক। চারদিক ভালো করে দেখে বলল, 'আমরা বোধ হয় কালিকা দ্বীপে এসে পড়েছি।'

জাহাজে জাহাজে উঠল আনন্দের লহর। জলে পড়ল আবার হাজার হাজার দাঁড়। সবাই বললে, 'চল তবে দ্বীপে।'

নৌবহরের নিয়ামক বলল, 'উঁহু—জাহাজ তো ভিড়বে না তীরের কাছে। এখানে জল কম—জাহাজ চড়ায় বসে যাবে।'

'তবে!'

নিয়ামক বলল, 'জাহাজের সঙ্গে যে সব ছোট নৌকো বাঁধা আছে সেগুলো নিয়ে চল, তীরে গিয়ে উঠি।'

তখন ছোট ছোট নৌকো ভাসিয়ে চলল সওদাগরেরা—সঙ্গে চলল তাদের হাজার হাজার লোকলস্কর।

দ্বীপে নেমেই তারা অবাক। দেখতে পেল—বুনো ঘোড়ার পাল চরছে সমুদ্রের ধারে। যেমনি মানুষ-জন দেখা—অমনি চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ছুটে পালাল গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

সওদাগররা আফশোষ করতে লাগল, 'আহা, এমন সুন্দর সুন্দর তেজী ঘোড়াগুলোর একটাও ধরা গেল না।'

তারা ঘোড়া ধরতে পারল না বটে কিন্তু পেয়ে গেল সোনার খনির সন্ধান, রূপোর খনির সন্ধান—আরও কত মণি-মানিকের খনি। জাহাজ বোঝাই করল তারা সেই সোনা রূপো মণিমানিকে। তারপর একদিন আবার ছেঁড়া পাল তুলে, ভাঙা হাল ধরে ফিরে চলল দেশের দিকে।

সওদাগরদের নৌবহর যেদিন দেশের বন্দরে এসে ভিড়ল সেদিন সাড়া পড়ে গেল রাজ্য জুড়ে। সওদাগরেরা ফিরে এসেছে কত অগাধ ধনদৌলত নিয়ে। দেখতে ছুটে এল সবাই। ধনদৌলতে সার সার গোরুর গাড়ি বোঝাই করে সওদাগরেরা তখন ফিরে চলেছে ঘরে।

তারপর সওদাগরেরা একদিন একসঙ্গে মিলে অনেক ধনদৌলত নিয়ে রাজা কনককেতুকে উপহার দিতে চলল।

উপহার পেয়ে রাজা খুব খুশী।

রাজা বললেন, 'কত দেশ-দেশান্তর তোমরা ঘুরে এলে—কোথায় কি নতুন জিনিস দেখলে তার কথা বল।'

একজন সওদাগর বলল, 'কালিকা দ্বীপে গিয়ে আমরা জঙ্গলের ঘোড়া দেখেছি—যেমন তেজী, তেমনি সুন্দর।'

রাজা বললেন, 'তবে ধরে আন সেই ঘোড়া।'

সওদাগরেরা বলল, 'সে যে জঙ্গলের ঘোড়া মহারাজ—ধরা বড় শক্ত।'

রাজা বললেন, 'যেমন করে পার—ধরে আন সেই ঘোড়া। যত লোকলস্কর তোমাদের দরকার—নিয়ে যাও সঙ্গে করে। নিয়ে যাও আমার ঘোড়া বশ-করা ওস্তাদ সহিসদের। আমার ঘোড়া চাই।'

উপায় নেই, রাজার আদেশ। সওদাগরদের নৌবহর সেজে দাঁড়াল আবার বন্দরের ঘাটে। সওদাগরেরা জাহাজে উঠল। সঙ্গে চলল এবার রাজার সৈন্যসামন্ত—ঘোড়া বশ-করা ওস্তাদ সহিসের দল। তারা সঙ্গে নিল ঘোড়ার যত রকমের প্রিয় খাদ্য আছে—যা একবার চোখে দেখলে ঘোড়ার জিভে জল না এসে পারবে না, যার গন্ধ একবার নাকে গেলে তারা না খেয়ে আর পার পারবে না। আর নিল বেণু বীণা মৃদঙ্গ ঢোল—যে বাজনা শুনে ঘোড়া নেচে ওঠে। নিল এমন সব সহিস, যাদের হাতের ডলাই-মলাই খেলে ঘোড়া যত বুনোই হোক—আরামে চোখ না বুজে পারবে না, বশ তারা হবেই হবে। এইসব নিয়ে সওদাগরেরা একদিন আবার কালিকা দ্বীপে গিয়ে হাজির হল।

প্রথমে তাদের দেখেই ঘোড়াগুলো চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ছুটে পালাল আবার জঙ্গলের দিকে। সওদাগবেরা তখন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঘোড়াব প্রিয় খাবারগুলো সাজিয়ে রাখল এক জায়গায়। ঘোড়া বশ-করা সহিসের দল লুকিয়ে রইল গাছপালার আড়ালে। আর কিছু লোক বেণু বীণা মৃদঙ্গ ঢোল বাজাতে শুরু করে দিলে ছন্দে তালে।

সেই তালে তালে নেচে উঠল বনের যত ঘোড়া।

তাদের নাচন দেখে বুড়ো বুড়ো ঘোড়াবা হুঁশিয়াব কবে দিয়ে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বলল, 'কি, কি—অত নাচিস কেন ?'

একটি ঘোড়া বলল, 'শুনছ না কেমন নাচেব বাজনা।'

বুড়ো ঘোড়াবা মুখ গোমড়া কবে বলল, 'খববদাব! জ্ঞানীরা বলে গেছেন—মধুর বা কর্কশ, শব্দ যেমনই হোক তাতে ভুলবে না।'

'তবে তোমরা থাক,' বলে একটি ছোকবা ঘোড়া নাচতে নাচতে দল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

তারপর বন থেকে যেই বেরোনো অমনি দেখতে পেল ভালো ভালো খাবার—শুধু তাই নয়, কেমন তার খুশবই! শুধু কি খুশবই ?—কেমন তার আবার আস্বাদ!

অ...

করে খেতে লাগল।

বনের ভেতর থেকে অন্য ঘোড়ারা বললে, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ—কি—কি—কি?'

লোভী ঘোড়াটা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে আনন্দে ডাক দিল সবাইকে, 'হিঁ-হিঁ—খাবে তো ছুটে এস। দেখছ না—কেমন সব সুন্দর সুন্দর খাবার!'



দেখেই তো সকলের খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দলের বুড়ো বুড়ো ঘোড়ারা সকলকে আবার সাবধান করে দিয়ে বলল, 'জ্ঞানীরা বলে গেছেন, যে কোনও জিনিস সুন্দর হোক আর কুৎসিত হোক, তাকে লোভও করবে ন', ঘেন্নাও করবে না। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

অন্য ঘোড়াবা মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল।

ওদিক থেকে লোভী ঘোড়াটা খেতে খেতে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে আবার বলে উঠল, 'কি, কি—দেখছ কি? কেমন খুশবই—নাকে কি টেরও পাচ্ছ না?'

বুড়ো ঘোড়ারা বলল, 'জ্ঞানীরা বলে গেছেন—যে কোনও জিনিস সুগন্ধ হোক কি দুর্গন্ধ হোক—তার দিকে তাকাবে না, পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

অন্য ঘোড়ারা বুড়োদের কথা ঠেলতে না পেরে চেয়ে রইল লোভী ঘোড়াটার দিকে আর জিভ দিয়ে তাদের জল পড়তে লাগল।

লোভী ঘোড়াটা গপগপ করে খেতে খেতে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বলে উঠল আবার, 'ছি ছি—চলে এস। খাবারগুলোর কি স্বাদ!'

বুড়ো ঘোড়ারা বলে উঠল, 'জ্ঞানীরা বলে গেছেন—স্বাদ ভাল হোক আর মন্দ হোক—কোন জিনিসে লোভ করবে না, বিরক্তও হবে না। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

এত বলেও শেষ পর্যন্ত সব ঘোড়াকে তারা আটকাতে পারল না। বেশ একটা বড় দল বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে ছুটে এল লোভী ঘোড়াটার কাছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই খাবারের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার যত লোকলস্কর আর ওস্তাদ সহিসের দল ছুটে এসে ঘিরে ফেলল ঘোড়াগুলোকে। মোটা মোটা দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে সব কটাকে বেঁধে ফেললে। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে তুলল জাহাজে।

সেই দিনই তারা জাহাজ ভাসিয়ে স্বদেশের দিকে রওনা দিল। দেশে ফিরে ওই ঘোড়ার পাল নিয়ে সওদাগররা সোজা গিয়ে হাজির হল রাজার কাছে।

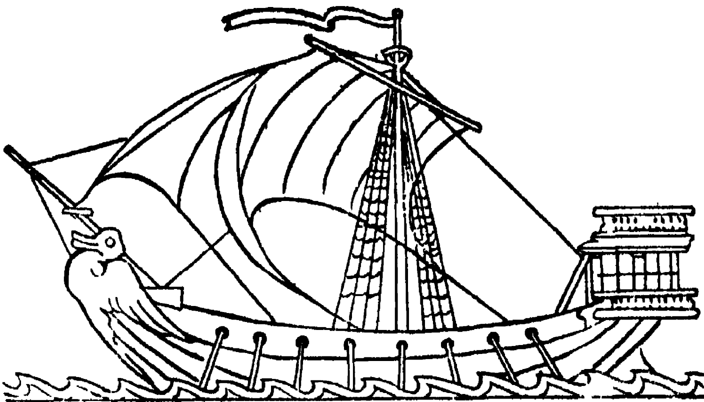
ঘোড়া দেখে রাজার আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। সওদাগরদের ওপর খুশী হয়ে রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন, সওদাগরদের কাছ থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আর রাজকর আদায় করা হবে না। তাছাড়াও তাদের পুরস্কার দিলেন অনেক ধনরত্ন। আর ঘোড়াগুলোকে পাঠিয়ে দিলেন ঘোড়াশালে।

তারপর রাজার হাজার হাজার ঘোড়া তালিম-দেওয়া ওস্তাদ সহিসেরা লেগে গেল ঘোড়া তামিল দিতে। প্রথম দিকে ঘোড়াগুলো

চিঁ-হিঁ-হিঁ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠল। যত হোক, বনের জংলি ঘোড়া—সহজে পোষ মানবে কেন। কিন্তু সহিসদের চাবুকের ঘা খেয়ে খেয়ে তারা টিট হয়ে গেল একে একে। ঘোড়াশালে বন্দী হয়ে আফশোষ করতে লাগল সবাই, 'হায়—কেন বুড়োদের হুঁশিয়ারী শুনলাম না—কেন জ্ঞানীদের কথায় কান দিলাম না। কোথায় পড়ে রইল সেই স্বদেশের অবাধ বনভূমি আর সমুদ্রের ধার!'

ঘোড়াগুলো একসঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদতে লাগল চিঁ-হিঁ-হিঁ করে।

॥ প্রাচীন জৈনকথা থেকে ॥





অজ্ঞাতবাস

অবণ্য-পথ দিয়ে আগে আগে চলেছেন বৎসরাজ-মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আব পেছনে রানী বাসবদত্তা। মন্ত্রীব বেশবাস পবিব্রাজক সন্ন্যাসীর মত—আর বানী বাসবদত্তা যেন অবন্তির সামান্য ঘবন্তী মেয়ে। অঙ্গে নেই রত্নভূষিত রাজবানীব বেশ। শুকিয়ে গেছে অবন্তিব মেয়েব ফুলের কেয়ূর, ফুলের বালা, ফুলের মালাগাছি। শুধু তাঁর কুঁচবরণ অঙ্গে ময়ুরকণ্ঠি শাড়ি আব ডাগর ডাগর উজ্জ্বল দুটি চোখ মনে কবিয়ে দেয়—তিনি অবন্তিদেশবাসিনী। দীর্ঘ পথ হেঁটে আসার পবিশ্রমে দু-জনেই শ্রান্ত ক্লান্ত। শান্ত বনভূমির ছায়ায় এসে একটু যেন আবামে হেঁটে হেঁটে চলেছেন।

এখানে নেই নগর-জনপদের হাঁকাহাঁকি, ডাবাড়াকি—নেই কোনও হানাহানির কোলাহল ; আর জুলুম নেই—জালিযাতি নেই, নেই রাজ্যপাটেব হলাহল। আছে শুধু শান্ত সমাহিত অরণ্যের ধ্যান—ধ্যানে বসে আছে বড বড় জট মেলে দিয়ে বনস্পতিবা—ধ্যানে বসেছে ফুল লতা ছায়া। অদূবে উঁকি মারছে তপোবন আশ্রম। যত পবিত্রতা, যত শান্তি—সব যেন ওইখানে। সেই দিকে চেয়ে পথের সব শ্রান্তি সব ক্লান্তি জুড়িয়ে যায চোখেব পলকে। ভয়-ভোলা হরিণ শিশুর দল ছুটে বেড়াতে বেড়াতে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে নতুন মানুষ দেখে, পলক পড়ে না আশ্রমের কপিলা গাভীর কাজল কালো চোখে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় ঘৃতাহুতির গন্ধ, এখান ওখান থেকে উঠছে যজ্ঞের ধোঁয়া—আর দূর থেকে ভেসে

ভেসে আসে মুনিকুমার কণ্ঠের সামগান। তার মধ্য দিয়ে ধীবে ধীরে হেঁটে চলেছেন মন্ত্রী আর রানী বাসবদত্তা।

এমন সময় আশ্রম বনভূমিব সব শান্তি সব স্নিগ্ধতা খান খান করে হাঁক উঠল যেন চৌকিদারী হাঁক, 'তফাৎ যাও—তফাৎ যাও। আরে হেই-হেই, তফাৎ—'

রানী আব মন্ত্রী থমকে দাঁড়ালেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন, 'হায়, এখানেও দেখি তাড়ন-পীড়ন আছে! এ হেন তপোবন আশ্রম!'

বাসবদত্তা ব্যথিত হয়ে বললেন, 'কে কাকে এমন করে তাড়াচ্ছে?'

মন্ত্রী জবাব দিলেন, 'মহাবানী, যার গায়ের জোর বেশী।'

বাসবদত্তা বললেন, 'আমাকেও হয়তো একদিন এমনি বিতাড়িত হতে হবে। এই তাড়া খাওযার চেযে বড অপমান আব কিছু নেই।'

মন্ত্রী যৌগন্ধবায়ণেব মুখে কঠিন কথা আটকায় না। তিনি বললেন, 'মহাবানী ছিলেন যখন তখন এই তাড়না করার আনন্দ আপনিও পেযেছেন। আজ অবিশ্যি সব ছেড়ে চলে এসেছেন। আবাব যখন আপনার স্বামী স্ববাজ্য ফিবে পাবেন—সেদিন আবার সেই জুলুমেব আনন্দ ফিবে পাবেন।'

অপ্রিয কথা, কিন্তু সত্যি। বানী ব্যথিত মুখে চেয়ে রইলেন।

আবার সেই হাঁক উঠল, 'হেই—হেই, রাজকুমাবী পদ্মাবতী যাচ্ছেন—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।'

একে ঠেঙিয়ে, ওকে তাড়া করে হুমহুম করে ছুটে আসছে মগধ-রাজকুমারীব পাইক বরকন্দাজ। আশ্রমবাসীরা ভয়চকিত—এদিক ছুটে তো ওদিক পলায়।

এমন সময় রাজকুমারীর অন্দরমহলের দ্বাররক্ষী কঞ্চুকী একজন হেঁকে উঠল, 'ওরে, এমন করে তাড়া লাগাসনে। নগর-রাজধানী ছেড়ে আশ্রমবাসীরা এখানে আছেন শান্তির জন্য।'

তার কথা শুনে মন্ত্রী বললেন, 'মহারানী, এ লোকটিকে ভালো বলেই মনে হচ্ছে। চলুন, ওব কাছে যাই।'

মন্ত্রী গেলেন কঞ্চুকীর কাছে। শুধোলেন, 'কেন এত হাঁকাহাঁকি?'

কঞ্চুকী হাত-পা নেড়ে অনেক ঘেব-ফের ঢের ঢের করে বললে, 'মগধের যে মহারাজ, যাঁর বাপ-পিতামহ নাম রেখেছেন দর্শক, তাঁর যে ছোট বোন, যাঁর নাম কি-না রাজকুমারী পদ্মাবতী—তিনি যাচ্ছেন আশ্রমে। তাঁর যে মা-জননী মহাদেবী, যিনি আবার কি-না আশ্রম-বাসিনী, তাঁর সঙ্গে দেখা করাই রাজকুমারীর ইচ্ছে। আজ তিনি আশ্রমেই থাকবেন—আপনাবাও আসুন, তাঁর অতিথি হবেন।' মগধ-বাজকুমারীর পরিচয়—সে কী সহজে স্বল্পে শেষ হয়!

বাসবদত্তা দেখলেন—রাজকুমারী পদ্মাবতী যাচ্ছেন, রূপে পথ আলো। এঁর কথা আগেই তিনি শুনেছেন। বুকে তাঁর উথলে ওঠে বড় বোনের স্নেহ।

মন্ত্রী যৌগন্ধবায়ণ দেখলেন—এই সেই মগধ-রাজকুমাবী, যাঁর সঙ্গে তাঁর মহারাজের বিয়ে হবে, জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছেন। তাতে মহারাজের হৃতরাজ্য আবার পুনরুদ্ধার হবে। এখন এই বিয়েটি ঘটাতে পারলেই তাঁর কার্যোদ্ধাব। পরিব্রাজকের বেশে তাই মগধে এসেছেন নানা ফন্দি এঁটে।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বুদ্ধিতে অতুল। তবু তাঁর রাজা উদয়ন আজ রাজ্যহারা, তাঁর বৎসরাজ্য আরুণি নামে পরাক্রান্ত এক রাজা গ্রাস করেছে। একা মন্ত্রী আর কি করবেন—রাজা যদি রাজ্য না দেখেন। উদয়ন না রাজা মেজাজে, না রাজা কাজে—তিনি রাজা শুধু নামে। তাঁর এক কাজ হাতী শিকার, আর এক কাজ রানী বাসবদত্তাকে তাঁর সাধের বীণা শেখান। বীণা তো নয়, যেন সাপের মন্ত্র, তাঁর সে বীণা শুনে বনের পশুপাখিও পাগল হয়ে ওঠে। রাজা

সে বীণার নাম রেখেছেন 'ঘোষবতী'। এই উদাসী রাজার রাজ্যে মন নেই, রাজ-কাজে প্রাণ নেই—সব মনটুকু জুড়ে আছে শিকার, রানী আর ঘোষবতী। ফলে শিথিল হল রাজশক্তি, স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীরা অত্যাচার করতে লাগল প্রজাপুঞ্জের উপর। শেষ পর্যন্ত দুর্বল রাজবাহু না পারল প্রজা রক্ষা করতে, না পারল নিজেকে রক্ষা করতে। পরাক্রান্ত পররাজ্যলোলুপ আরুণি বৎসরাজ্য আক্রমণ করে অধিকার করে বসল।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সকলকে নিয়ে এলেন লাবাণক নামে এক গ্রামে। আর ভেবে মরেন একা—কি করা যায়, কিসে উদ্ধার হয় রাজ্য। কেমন করে রাজার মতি ফেরে রাজ-পাটে।

একদিন তিনি রাজাকে না জানিয়ে গোপনে ডাকলেন এক মন্ত্রণা-সভা। তাতে ডাকা হল স্বয়ং রানী বাসবদত্তাকে, এলেন সেনাপতি রুমণ্বান, উপস্থিত থাকলেন কয়েকজন আচার্য জ্যোতিষী আর রাজা উদয়নের প্রিয় সহচর বসন্তক।

মন্ত্রী বললেন, 'এখন কি করা যায়? রাজার তো কোনোদিকে খেয়াল নেই।'

রাজজ্যোতিষী পুষ্পকভদ্র বললেন, 'মগধের রাজকন্যার সঙ্গে রাজার বিবাহের প্রবল যোগ বর্তমান এবং এই বিয়েতেই হবে রাজার রাজ্যোদ্ধার।'

শুনে মন্ত্রী কঠিন কণ্ঠে বললে, 'মহারানী, আপনাকে রাজার চোখের আড়াল হতে হবে, কঠিন হতে হবে। ছদ্মবেশে আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

রানী শুধোলেন, 'কোথায় যেতে হবে?'

মন্ত্রী বললেন, 'মগধে। সেখানে গিয়ে আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে মগধ-রাজকুমারীর সঙ্গে, যেমন করে হোক। এই বিতাড়িত অবস্থায় বাইরের সৈন্য সাহায্য ছাড়া রাজ্যোদ্ধার হবে না।'

রানী বাসবদত্তা বললেন, 'কিন্তু মগধরাজ যে বলেছেন—এক স্ত্রী থাকতে তাঁরা মেয়ে দেবেন না। যাই হোক, আমার রাজার সম্মান ও রাজ্য উদ্ধারের জন্য দরকার হলে আমি আত্মহত্যা করতে পারি। সব কিছুর জন্য আজ আমি প্রস্তুত।'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারানীর জয় হোক। আপনার আত্মহত্যাব প্রয়োজন হবে না। আমরা সবাই প্রচার করে দেব, আপনি মৃত। যতদিন না রাজ্য উদ্ধার হয় ততদিন রাজা যেন এসব কথা কিছুই না জানতে পারেন। সবাই হুঁশিয়ার।...'

এই বলে মন্ত্রণা-সভা ভঙ্গ হল।

কিন্তু কিসের মন্ত্রণা—কিসের কি, রাজার ওদিকে খেয়ালও নেই। তিনি তখন বেরিয়ে গেছেন মৃগয়ায়। এই সুযোগে মন্ত্রী আগুন লাগিয়ে দিলেন লাবাণকের যত চালাঘরে। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সে-সব।

তারপর রানী বাসবদত্তাকে সামান্য এক অবন্তির মেয়ের মত সাজিয়ে যৌগন্ধরায়ণ নিজে নিলেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ। রওয়ানা হলেন সুদূর মগধের দিকে। যাওয়ার সময় বসন্তক আর সেনাপতি রুমণ্বানকে বলে গেলেন, 'রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এলে বল—তাঁর প্রিয়মন্ত্রী আর মহারানী এই আগুনে পুড়ে মবেছেন। আর দেখ, রাজ্য উদ্ধারের আয়োজন যেন শিথিল না হয়। মহারাজকে মগধের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা কর।'

এত সব করে যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা ছদ্মবেশে এসেছেন মগধে। দৈবাৎ বনের পথেই দেখা হয়ে গেল মগধ-রাজকুমাবী পদ্মাবতীর সঙ্গে। দুজনেই তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। যেমন করে হোক, এরই সঙ্গে দিতে হবে মহারাজ উদয়নের বিয়ে, মিতালি করতে হবে মগধরাজ দর্শকের সঙ্গে, নিতে হবে তাঁর সেনানীর সাহায্য।

কঞ্চুকীর আমন্ত্রণে দুজনে মহাদেবীর আশ্রমে এলেন। এসেই বাসবদত্তা লেগে গেলেন পদ্মাবতীর নানা খবর সংগ্রহে। রাজকুমারীর

একজন সহচরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজকুমারীর কোনও বিয়ে-থার কথা হচ্ছে না ?'

সহচরী বললে, 'হচ্ছে বটে। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।'

শুনে মুখ শুকিয়ে গেল বোধ করি বাসবদত্তার। উজ্জয়িনীর রাজপুত্র যে তাঁর ভাই! হায়, এখন কোন কুল রাখবেন তিনি!

এদিকে রাজকুমারী পদ্মাবতী আশ্রমে এসে মুনিঋষিদের খুব দান-খয়রাত করতে লাগলেন। তাঁর কঞ্চুকী প্রায় ফিরিওয়ালার মত হেঁকে বেড়াতে লাগল—'কার কলসী চাই ? কাপড় নেবে কে ? কোন বিদ্যার্থীর গুরু-দক্ষিণার অভাব পড়েছে ? চলে এস যার যা চাই। রাজপুত্রী খয়রাত করছেন।'

যৌগন্ধরায়ণ আর বাসবদত্তা দেখলেন—পদ্মাবতীর রানী হওয়ার মত বড় মন আছে বটে!

যৌগন্ধরায়ণ গিয়ে হাজির হলেন পদ্মাবতীর কাছে। বললেন, 'আমি একজন প্রার্থী।'

পদ্মাবতী শুধালেন, 'কি চাই আপনার ?'

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, 'আমি পরিব্রাজক—অর্থ সম্পদ কিছুই চাইনে।' তারপর বাসবদত্তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি আমার ছোট বোন, স্বামী এঁর বিদেশে আছে। এঁকে কিছুদিন আপনার কাছে রাখতে হবে। এই আমার প্রার্থনা।'

পদ্মাবতী রাজি হলেন। বললেন, 'এঁর নাম ?'

যৌগন্ধরায়ণ বললেন, 'অবন্তিকা।'

রানী বাসবদত্তার মুখ শুকিয়ে গেল। হায়, রানী হয়ে অন্যের আশ্রয়েও তাঁকে থাকতে হবে! কিন্তু উপায় নেই—মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মন্ত্রণা। উদ্দেশ্য তাঁর মহৎ।

এমন সময় এক ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী যুবক আশ্রমে এসে হাজির। রাতটুকু থেকে সকালেই চলে যাবেন।

কঞ্চুকী শুধালে, 'মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'লাবাণক থেকে, আমি সেখানে পড়তাম। সেখানে মর্মান্তিক এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ায় চলে এসেছি।'

লাবাণকের কথা শুনে চমকে উঠলেন যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা। সেই অগ্নিকাণ্ডের পর রাজা উদয়ন কি করছেন তা জানবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল হল দুজনেরই। আশ্রমবাসীরা এবং রাজকুমারী পদ্মাবতীও ভয়ানক উৎসুক। সবাই তাকে ঘিরে বসল।

ব্রহ্মচারী বললেন রাজা উদয়নের করুণ কাহিনী। উদয়ন মৃগয়া থেকে ফিরে বাসবদত্তা মারা গেছেন শুনে পাগলের মত হয়ে উঠলেন। যে আগুনে বাসবদত্তা পুড়ে মরেছেন—তাতেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। অমাত্যরা তাঁকে কোনও রকমে সে দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার করে কিন্তু তারপর থেকে মহারাজ উদয়ন শুধু 'বাসবদত্তা—বাসবদত্তা' বলে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যৌগন্ধরায়ণ অদম্য কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনও তাঁরা সে গ্রামেই আছেন ?'

'আজ্ঞে না!' ব্রহ্মচারী বললেন, 'সেই গ্রামের পথঘাট গাছপালা সব রানী বাসবদত্তার স্মৃতির সঙ্গে জড়ান—রাজা তারই মধ্যে পাগলের মত রাত-দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তাই অমাত্যরা শেষ পর্যন্ত রাজাকে নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।'

যৌগন্ধরায়ণ শুনে আশ্বস্ত হলেন। আর সকলের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বাসবদত্তা কিন্তু আর সামলাতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

পদ্মাবতী বললেন, 'ইনি দেখছি বড় কোমল হৃদয়া।'

যৌগন্ধরায়ণ অবস্থা সামলে নিলেন। বললেন 'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি কারুর দুঃখের কথা শুনতে পারেন না।'

ব্রহ্মচারীর মুখে উদয়নের কথা শুনে পদ্মাবতী ভাবে বিভোর। আহা, ধন্য রানী বাসবদত্তার ভাগ্য! এ যেন স্বামী-সৌভাগ্যবতী সীতা!

যৌগন্ধরায়ণ সেই রাত্রে রাজকুমারী পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তাকে রেখে কোথায় চলে গেলেন।

রাজকুমারী পদ্মাবতী ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তাকে নিয়ে রাজপুরীতে পরের দিন ফিরে গেলেন। বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে দেখেন ছোট বোনের মত। পদ্মাবতীও তাঁকে বাখেন নানা যত্নে আদরে। বাসবদত্তাকে তাঁর বড় ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, কিন্তু কোনদিন তিনি নিজের কথা বলেন না। বরং উল্টে বাসবদত্তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান পদ্মাবতীর মনের কথা—আর কত গল্প করেন মহারাজ উদয়নের, মহারাজের নানা কথায় জয় করেন পদ্মাবতীর মন।

একদিন শুধালেন বাসবদত্তা, 'কি হল সেই উজ্জয়িনীর রাজকুমারের? কই বিয়ের খবর তো আর কিছুই পাইনে।'

পদ্মাবতীর এক সহচরী বললে, 'রাজকুমারী তাঁকে বিয়ে করবেন না। রাজকুমারীর ইচ্ছে—রাজা উদয়নের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।'

বাসবদত্তা বুঝলে—উদয়নের গল্প-কথায় এতদিনে বুঝি ফল ফলেছে।

একটি সহচরী বললে, 'কিন্তু রাজা উদয়ন যদি কুৎসিত হন?'

বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না না, তিনি অতি সুন্দর—সুপুরুষ।'

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি করে জানলেন?'

বাসবদত্তার ভয় হল—এই বুঝি তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তাই একটু সামলিয়ে নিয়ে কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'সবাই তাই বলে।'

এমন সময় পদ্মাবতীর ধাত্রী এসে খবর দিলেন, 'রাজকুমারী, তোমার সঙ্গে রাজা উদয়নের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। রাজা উদয়ন কি এক রাজকার্যে মগধে আমাদের মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বিয়েও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল।'

বাসবদত্তা বুঝলেন—এ রাজকার্য আর কিছুই নয়, সেনা-সাহায্য প্রার্থনা ও মিতালি। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কাজ তাহলে চলেছে ঠিক—বিধির অমোঘ বিধানের মত।

দেখতে দেখতে কদিনের মধ্যে সেজে উঠল মগধের রাজপুরী—বেজে উঠল বিয়ের মঙ্গলশঙ্খ। মালা গাঁথতে বসলেন স্বয়ং বাসবদত্তা—সেকালের সে কত রকমের মালা! কোনও মালা চির সুখের—কোনও মালাতে হয় চির এয়োতি—কোনও মালা বা সতীন-কাঁটার। এই শেষ মালাটা গাঁথতে গাঁথতে চোখে জল আসে বাসবদত্তার। হায়রে ভাগ্য, অবস্থার বিপাকে রাজকুমারী পদ্মাবতীর সতীন-কাঁটার মালা আজ গাঁথতে বসেছে সতীন বাসবদত্তা! ওদিকে নহবৎখানায় বাঁশি ধরেছে মিলনের তান।

মগধে এসে বিয়েই হোক আর মিতালিই হোক—রাজা উদয়নের কিন্তু মনে সুখ নেই। তাঁর মনে সেই বাসবদত্তার হাজার কথার স্মৃতি। সে কি সহজে মোছা যায়?

প্রিয় সহচর বসন্তক কত কথায় মন ভোলাতে চান রাজার—পদ্মাবতীর গুণগানে মন ভরে দিতে চান। কিন্তু শত কথাতেও সেই বাসবদত্তার কথা মনে করে রাজার চোখে শুধু জল আসে।

আর ওদিকে রাজার এই অবস্থা দেখে আড়াল থেকে চোখের জল মোছেন ছদ্মবেশিনী অবন্তিকা। মনে মনে বলেন—ভুলে যাও মহারাজ, ভুলে যাও হতভাগিনীর কথা।

এমনি করে দিন কাটে উদাসীন রাজা উদয়নের। এর মধ্যে একদিন মাথা ধরল পদ্মাবতীর। মগধ রাজকুমারীর মাথা ধরা—সে কি সহজ কথা! সারা মগধ বুঝি তোলপাড়! পাইক ছোটে, বরকন্দাজ ছোটে, দাসী ছোটে, রাজবদ্যি ছোটে, খবর চলে যায় এখান থেকে ওখানে। খবর এল রাজা উদয়নের কাছে, 'রানী

পদ্মাবতীর মাথা ধরেছে। সমুদ্রগৃহে তাঁর বিছানা পাতা হচ্ছে—সেইখানে তিনি বিশ্রাম নিতে যাবেন।'

সমুদ্রগৃহ—সমুদ্রের মত শান্ত আর ঠাণ্ডা। সেকালের রাজা-রাজড়াদের প্রাণ জুড়োবার ঠাঁই। রাজা উদয়ন চললেন সেই সমুদ্রগৃহের দিকে। সন্ধ্যে তখন হব-হব। রাজা গিয়ে দেখলেন—রানী পদ্মাবতী তখনও সমুদ্রগৃহে আসেননি।

ভাবলেন—হয়তো আসবেন পরে। তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন। রাজ্য উদ্ধার ও যুদ্ধের চিন্তায় তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত।



আরুণিকে উচ্ছেদ করবার জন্য নানা কৌশলে তিনি সৈন্য পরিচালনা করছেন—সারাদিন মেতে থাকেন এখন তাই নিয়ে।

সমুদ্রগৃহের ঘুম-ঘুম আলো আর গা জুড়ানো ঠাণ্ডায় উদয়ন ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমন সময় পদ্মাবতীর মাথা ধরার কথা শুনে বাসবদত্তাও এলেন সেই সমুদ্রগৃহে। এসে দেখলেন ঘুমন্ত ক্লান্ত উদয়নকে। দেখলেন তো দেখলেনই—চোখ ফেরাতে পারলেন না। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কঠিন নির্দেশ যেন ভুলে গেলেন সেই মুহূর্তে। দেখলেন—রাজার একটা হাত ঘুমের ঘোরে ঝুলে পড়েছে। 'আহা, কষ্ট হচ্ছে'—বলে যেমনি সেটা তুলে দিতে যাবেন, অমনি রাজা জেগে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসবদত্তা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে মিশে গেলেন বাইরের অন্ধকারে।

উদয়ন চীৎকার করে উঠলেন, 'বসন্তক—বসন্তক, বাসবদত্তা বেঁচে আছে!—বাসবদত্তা···বাসবদত্তা!'

কোথায় বাসবদত্তা! অন্ধকারে হা-হা করে উঠল রাজার করুণ আর্তনাদ। বাসবদত্তার ছায়ামূর্তিকে ছুটে ধরতে গিয়ে উদয়ন সমুদ্রগৃহের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

বসন্তক ছুটে এসে সেবা শুশ্রূষা করে রাজার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভুলে যান মহারাজ—তাঁর কথা ভুলে যান। 'তিনি যে বহুদিন মারা গেছেন। আপনি তাঁকে বোধ করি স্বপ্ন দেখেছেন।'

উদয়ন বললেন, 'না না না বসন্তক—যদি তা স্বপ্ন হয়, তা হলে আমার জাগরিত না হওয়াই সুখ। যদি তা ভ্রান্তি হয়, তা হলে আমার সেই ভ্রান্তিই চিরকাল থাক অক্ষয় হয়ে।'

বসন্তক তবু বললেন, 'এই রাজপুরীতে অবন্তিকা নামে এক যক্ষিনী বাস করে—আপনি তা হলে তাকেই দেখেছেন।'

'না না না।' উদয়ন বললেন, 'আমি স্বচক্ষে যে তার মুখ দেখেছি বসন্তক। সে আছে সন্ন্যাসিনীর মত। চোখে তার কাজল

নেই, গায়ে নেই অলঙ্কার, মেঘের মত কেশরাশি তার সাজসজ্জাহীন। বাসবদত্তা বেঁচে আছে বসন্তক।' রাজার বিলাপ আর থামে না।

এমন সময় এক প্রতিহারী এসে খবর দিলে, 'রাজা উদয়নের জয় হোক। আপনার সেনাপতি রুমণ্বান আরুণিকে উচ্ছেদ করেছেন। এখন আপনি বিজয় অভিযান করতে পারেন। বৎসরাজ্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য রাজা দর্শকের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক প্রস্তুত।'

হঠাৎ এই বিজয়সংবাদে রাজা কিছুটা সুস্থ হলেন।

তারপর বিজয়োৎসব করে আপন রাজ্যে ফিরে এলেন রাজা উদয়ন—সঙ্গে এলেন রানী পদ্মাবতী আর তাঁর সহচরীরা। তাদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চললেন ছদ্মবেশিনী অবন্তিকা।

বৎসরাজ্যে ফিরে এসে রাজা উদয়ন রাজ্যপাটে মন দিলেন বটে, কিন্তু আধখানা মন তবু পড়ে রইল রানী বাসবদত্তার জন্য।

রাজার সে মন পুড়ে হু-হু করে উঠল একদিন। রাজার সূর্যামুখ প্রাসাদের সামনে এসে বীণায় ঝঙ্কার তুলেছিল কে এক বীণকার—উদয়ন চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'ঘোষবতী! হায়, এ যে ঘোষবতীর সুর!'

ভোলা যায় কী ঘোষবতী বীণার সুর! রাজা বললেন, 'ধরে আন বীণকারকে।'

রক্ষীরা গিয়ে বীণকারকে ধরে আনল।

রাজা শুধালেন, 'কোথায় পেলে এ বীণা?'

বীণকার বললে, 'পেয়েছিলাম একে লাবণকের এক উলু-খাগড়ার বনে।'

বীণা কোলে নিয়ে উদয়ন হা-হুতাশ করতে লাগলেন। হায়! তাঁর সাধের বীণা ফিরে এল কিন্তু কোথায় গেল রানী বাসবদত্তা!

এরপর একদিন পাত্রমিত্র নিয়ে রাজা বসে আছেন, বসে আছেন রানী পদ্মাবতী। এমন সময় কঞ্চুকী এসে খবর দিলে, 'অবন্তিকাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই পরিব্রাজক এসেছেন।'

রাজা শুধালেন, 'কি ব্যাপার ? কে অবন্তিকা ?'

রাজা এ সবের কিছুই জানতেন না। পদ্মাবতী বললেন, 'তখন আমার বিয়ে হয়নি—একদিন এক পরিব্রাজক এসে তাঁর বোনকে রেখে গিয়েছিলেন আমার কাছে। অবন্তিকা তারই নাম।'

রাজা প্রতিহারীকে বললেন, 'ডেকে আন সেই পরিব্রাজককে।'

আর পদ্মাবতী কঞ্চুকীকে বললেন, 'ডেকে আন অবন্তিকাকে।'

প্রতিহারী পরিব্রাজকবেশী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে নিয়ে হাজির করলে রাজা উদয়নের কাছে। কিন্তু ছদ্মবেশী সে পরিব্রাজককে চিনে ফেললেন রাজা উদয়ন। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ! তুমি! কে তোমার বোন, বল।'

কঞ্চুকী তখন এনে হাজির করেছে ছদ্মবেশিনী অবন্তিকাকে।

ঘোমটা সরিয়ে নিয়ে বাসবদত্তা এই সময়ে বলে উঠলেন, 'মহারাজের জয় হোক।'

'বাসবদত্তা!' উদয়ন সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রানী বাসবদত্তার দিকে।

মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলেন রাজার—বললেন, 'দেবী বাসবদত্তাকে লুকিয়ে রেখে আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করুন। যা কিছু করেছি, তা শুধু বৎসরাজ্য উদ্ধারের জন্য।'

রাজা উদয়ন তাঁকে দুহাতে টেনে তুলে বললেন, 'ওঠ, তোমার জন্যই সব কিছু রক্ষা পেয়েছে যৌগন্ধরায়ণ—তুমি আমার পরম সুহৃদ।'

পদ্মাবতী বাসবদত্তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমিই রানী বাসবদত্তা! আমায় ক্ষমা কর দিদি। সখীর মত আচরণ করে

তোমার কাছে কত অপরাধ করেছি আমি। তুমি আমার বড়—তোমাকে প্রণাম করি কোটি কোটি।' বলে গড় হয়ে বাসবদত্তাকে প্রণাম করলেন।

তারপর থেকে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন রাজা উদয়ন। তাঁর রাজ্য জুড়ে নেমে এল অপার আনন্দ ও সুগভীর শান্তি।

॥ ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' থেকে ॥



মাটির গাড়ি

উজ্জয়িনী তো নয়—যেন সে কোন সুদূর কালের কল্পনার এক রাজ্য! তার রাজপথের দুপাশে কত আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদের সারি, প্রাসাদের সামনে কারুকাজ করা কত হাতীর দাঁতের তোরণ, মাঝে মাঝে ছবির মত আঁকা কত উদ্যান, পুষ্পবীথি—আর ছায়াশীতল শ্বেতপাথরের শিলাতল। মানুষজনের গায়ে জুঁইফুলের গন্ধমাখা ওড়না আর মণি-মুকুতায় ঝলোমল কেয়ূর-কঙ্কণ-কণ্ঠহার। শুধু কি ধনদৌলতের জাঁকজমক—শখ-শৌখিনতারও চৌষট্টিকলা! আঙিনায় আঙিনায় ঘুঙুর-পরা ময়ূরের নাচন, ঘরে ঘরে চন্দন ঘষা আর অগুরু ধূপের ধোঁয়ায় নিত্যি লেগে আছে যেন পুজোবাড়ির মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ! কোথাও বা বীণার ঝঙ্কার আর নৃত্যের তালে তালে নূপুরের নিক্কণ। মাঝে মাঝে দূরের শিপ্রানদীর তীর থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসে মহাকাল মন্দিরের ঘণ্টা—ঢং ঢং ··· ঢং ঢং। চির-উৎসবে মুখরিত প্রাচীন ভারতের সে এক উজ্জ্বল উজ্জয়িনী!

তার বণিকদের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। নানা দেশ-দেশান্তর থেকে নানা ধনরত্ন আহরণ করে এনে উজ্জয়িনীকে করে তুলেছিল তারা সুসমৃদ্ধ এক জনপদ। মঠে মন্দিরে, প্রাসাদে উদ্যানে, কত দীঘি আর দানসত্রে সারা উজ্জয়িনী জুড়ে ছিল তাদের কীর্তি। যেমন ছিল তাদের ধনদৌলতের খ্যাতি—তেমনি প্রতিপত্তি। তার মধ্যে

আবার বণিক তো বণিক চারুদত্ত। এই ব্রাহ্মণ বণিকটি যেমন ছিলেন ধনী, তেমনি দাতা। এমনি তাঁর বাড়-বাড়ন্ত দানের বহর যে, তা বাড়তে বাড়তে একদিন তিনি একেবারে ফতুর হয়ে গেলেন। ধনদৌলত যেমন এসেছিল তেমনি চলেও গেল—রয়ে গেল শুধু নামটি, যে নাম হেলে না, টলে না আর মোছেও না।

শুধু দান নয়, দয়া নয়—চারুদত্ত বিপন্নেরও বন্ধু। একদিন তিনি পুষ্প-করণ্ডক নামে এক বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিল চিরসহচর মৈত্রেয়। এমন সময় তাঁর গোরুর গাড়ি এসে থামল বাগানের সামনে। তাঁকে অবাক করে দিয়ে তাঁরই গাড়ি থেকে নামল একজন অচেনা লোক। আলো-আঁধারির সময় ভালো করে তাকে চেনা গেল না—তবে চারুদত্তের মনে হল, এ লোক কেউ-কেটা না হয়ে যায় না। দিব্যি আজানুলম্বিত দুটি বাহু, সিংহের মত কাঁধ, বিশাল বুকের পাটা আর ডাগর ডাগর চোখ। কিন্তু এক পায়ে তার ছেঁড়া শেকল! চারুদত্ত অবাক হয়ে ভাবলেন, এ কে হতে পারে!

চারুদত্ত শুধোলেন, 'কে আপনি ?'

অচেনা সুদর্শন লোকটি বললেন, 'গোপকুলে আমার জন্ম, আমার নাম আর্যক। আজ আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম।'

'আর্যক!' চারুদত্ত অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি কি সেই আর্যক, রাজা পালক যাঁকে ঘোষপল্লী থেকে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন ?'

আর্যক বললেন, 'আমিই সেই আর্যক।'

বেচারী আর্যকের মহাশত্রু উজ্জয়িনীর রাজা পালক। কোনও এক সিদ্ধপুরুষ নাকি রাজা পালককে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিল, রাজাকে মেরে এই গোপসন্তান আর্যক একদিন উজ্জয়িনীর রাজা হবে। যেই শোনা অমনি রাজা পালক বেচারী আর্যককে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। এ সব ঘটনা চারুদত্ত জানতেন। সেই আর্যক যে কারাগার ভেঙে পালিয়ে এসে তাঁরই

সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এতে চারুদত্তের খুব অবাক হবারই কথা। মৃদু কণ্ঠে আর্যককে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত হোন। শরণাগতের জন্য আমি দরকার হলে জীবন পর্যন্ত দেব।' তারপর চারুদত্ত তাঁর গাড়োয়ানকে ডেকে বললেন, 'দাও, ওঁর পায়ের শেকল খুলে দাও।'

চারুদত্তের গাড়োয়ান বেচারী এ সবের কিছুই জানত না। মুখ-আঁধারির মধ্য দিয়ে সে শুধু গাড়ি চালিয়েই এসেছে। আর্যক যে কখন পেছন দিয়ে তার গাড়িতে উঠেছে, তা তার জানা ছিল না। আর্যকের পা থেকে শেকলটা খুলে নিয়ে সে শুধু বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আর্যক মৃদু হেসে বললে, 'এ শেকল গেল, কিন্তু বন্ধুত্বের নতুন এক শেকলে আজ বাঁধা পড়লাম। আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ রইলাম।'

চারুদত্ত বললেন, 'আর বেশীক্ষণ আপনার এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ রাজার লোক নিশ্চয়ই আপনার খোঁজ-খবব করছে। আপনি আমার গাড়িতে করেই যেখানে ইচ্ছে যান। হেঁটে যাবেন না। কারণ, বহুদিন আপনার পায়ে শেকল বাঁধা ছিল—আজই সবে খোলা হল। তাই সহজ ভাবে হাঁটতে পারবেন না, আর খুঁড়িয়ে চললে লোকে আপনাকে সন্দেহ করতে পারে।'

আর্যক একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনার বন্ধুত্ব চিরকাল আমার মনে আঁকা থাকবে। আপনার জন্যই আজ রক্ষা পেলাম।'

এই হল মহৎ মানুষ চারুদত্ত।

কিন্তু মহতেরও শত্রু আছে। চারুদত্তেরও একজন শত্রু ছিল—সে হল রাজা পালকের শ্যালক সংস্থানক। লোকটা যেমন মুখ্যু—তেমনি গোঁয়ার। চারুদত্তের ওপরে সে হাড়ে হাড়ে চটা।

সে ছাড়া উজ্জয়িনীর আর সবাই চারুদত্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—যতই তিনি দরিদ্র হোন না কেন।

তাঁর দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য একবার রাজনর্তকী বসন্তসেনা তাঁর বহুমূল্য সব গয়নাগাঁটি পাঠিয়ে দিলেন চারুদত্তের কাছে। কিন্তু শত অভাবেও তিনি তা নিলেন না। বসন্তসেনার ধন-রত্নের অভাব নেই, স্বয়ং রাজা পালক থেকে দেশশুদ্ধ সবাই এই গুণবতীর গুণে মুগ্ধ—শুধু তাই নয়, দয়াদাক্ষিণ্যেরও তাঁর অন্ত নেই। কিন্তু চারুদত্তকে যে তিনি কি ভাবে সাহায্য করবেন—ভেবে পেলেন না।

একদিন তিনি স্বয়ং চারুদত্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বসন্তসেনার ভাগ্যি ভালো, একটা দানের সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

চারুদত্তের একমাত্র ছেলে রোহসেনকে নিয়ে বাড়ির দাসী ঠিক তখনই বাইরে বেরিয়ে এল। রোহসেন কেঁদে আকুল—আর দাসী তাকে নানা কথায় ভুলোবার চেষ্টা করছে। বসন্তসেনা কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন।

দাসী রোহসেনের হাতে একটা মাটির গাড়ি ধরে দিয়ে বললে, 'এই গাড়িটাই খুব ভালো বাছা—এস আমরা এইটে নিয়ে খেলা করি।'

রোহসেন রাগ করে মাটির গাড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'না না—আমায় সেই গাড়ি দাও। এ চাইনে—'

দাসী দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'ওরে—সোনার গাড়ি এখন কোথায় পাবি বাছা। তোর মায়ের গায়েও যে একদানা সোনা নেই।'

বসন্তসেনা রোহসেনকে আদর করে বললেন, 'কাঁদছ কেন?'

দাসী বললে, 'পাশের বাড়ির একটি ছেলে সোনার গাড়ি নিয়ে খেলা করছিল—সেইটে ওর চাই। মাটির গাড়ি একটা এনে দিলাম, কিন্তু ও সেটা নেবে না।'

'তাই কান্না ?' বসন্তসেনা রোহসেনকে আদর করে বললেন, 'চাইনে আমরা মাটির গাড়ি। সোনার গাড়ি তোমায় দিচ্ছি বাবা।' এই বলে বসন্তসেনা তাঁর গায়ের বহুমূল্য সব মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার খুলে রোহসেনের সেই মাটির গাড়িতে ভর্তি করে বললেন, 'এই নাও, এই দিয়ে তোমার সোনার গাড়ি বানিয়ে নিও।'

এই ভাবে অলঙ্কারগুলি গছিয়ে দিয়ে বসন্তসেনা চলে গেলেন।

দাসী ভ্যাবাচেকা খেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

কিন্তু হায়, বসন্তসেনার অলঙ্কারে ভর্তি রোহসেনের এই মাটির গাড়িই হল চারুদত্তের কাল। কারণ, পরের দিনই রাজার বিচারশালায় মোকদ্দমা উঠল—পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে এক ঝোপের মধ্যে বসন্তসেনা নিহত হয়েছেন এবং রত্নভূষিতা বসন্তসেনার গায়ে অলঙ্কার একটিও নেই—সব কে কেড়েকুড়ে নিয়ে গেছে।

রাজা পালকের শ্যালক সংস্থানক চরম প্রতিশোধ নিলে চারুদত্তের ওপরে। একে রাজার শ্যালক—প্রতাপ প্রতিপত্তিও তাব অসীম ; তার ওপরে গোঁয়ার এবং মুখ্যু। পরের দিন বিচারালয়ে গিয়ে সে নালিশ করলে, 'রাজনর্তকী বসন্তসেনাকে চারুদত্তই মেরে ফেলেছে।'

এই অসম্ভব কথা শুনে স্বয়ং বিচারক পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক। চারুদত্তকে চেনে না কে। কে না জানে তাঁর অমায়িক ব্যবহার! তিনি এমন কাজ করবেন—এ কথা স্বয়ং বিচারকও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবুও উপায় নেই—বিচারের দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হবে।

বিচারক বললেন, 'কি হয়েছে বলুন।'

সংস্থানক স্পর্ধাভরে বললে, 'কানে কানে বলব। আমি তো যে-সে লোক নই। কত বড় কুলে আমার জন্ম! রাজার শ্বশুর আমার বাবা, আমি স্বয়ং রাজার শালা।'

ওর আস্ফালন দেখে বিচারক বোধ হয় একটু হাসলেন। বললেন, 'আমি জানি আপনি কে। কোন্ কুলে কার জন্ম, এ কথা

বিচারালয়ে চলে না। উর্বর জমিতে কি আর কাঁটা গাছ জন্মায় না? স্বভাব চরিত্র নিয়েই আমাদের কাজ। এখন আসল ঘটনাটা বলুন।'

সংস্থানক বললে, 'পুষ্প-করণ্ডক বাগানটা রাজা খুশী হয়ে আমাকে উপহার দেন। জানেন তো, বাগানটি খুবই বিখ্যাত—ওখানে অনেকেই বেড়াতে যায়। আমি আজ গিয়ে দেখলাম, উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজনর্তকী বসন্তসেনা বাগানের এক প্রান্তে এক ঝোপের মধ্যে মরে পড়ে আছে। গায়ে একটিও অলঙ্কার নেই—বোধ হয় কেউ ওইগুলোর লোভে তাকে হত্যা করেছে।'

বিচাবক বললেন, 'আপনি কি করে বুঝলেন যে, কেউ অর্থেব লোভে তাঁকে হত্যা করেছে?'

সংস্থানক বললে, 'গায়ে তার একটিও অলঙ্কার নেই যে! বসন্তসেনা উজ্জয়িনীর গৌরব, নানা রত্নে সে ভূষিতা—তার গায়ে অলঙ্কাব নেই কেন? নিশ্চয়ই কেউ সেগুলো কেড়ে নিয়ে গেছে। তাব গলায় হার ছিনিয়ে নেওয়ার চিহ্ন পর্যন্ত আছে।'

'সম্ভব।' বিচারকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সক্ষোভে বললেন, 'নগর-রক্ষীরা আজকাল কিছুই কাজ করছে না।' তারপর তিনি তাঁর কর্মচারীদের হুকুম করলেন, 'যাও—চারুদত্ত মশায়কে ডেকে আন।'

চারুদত্ত বসন্তসেনার এত সব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। তিনি শুধু জানতেন—গতকাল বসন্তসেনা এসে আবার সেই সাহায্যের ছলে তাঁর ছেলের মাটির খেলনা-গাড়িটা বহুমূল্য নানা অলঙ্কারে ভরে দিয়ে গেছেন। সেগুলো তিনি তাঁর বন্ধু মৈত্রেয়ের হাতে আজ আবার ফেরত পাঠিয়েছেন। এমন সময় বিচারশালার লোক এসে বললে, 'কোনও ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস জানবার জন্য বিচারক আপনাকে একবার ডেকেছেন।'

তারা বসন্তসেনার হত্যার ব্যাপার কিছুই বললে না।

চারুদত্ত চললেন বিচারালয়ে। মনে ভাবলেন—বোধ করি বা সেই পলাতক বন্দী আর্যকের ব্যাপারেই কিছু জেরা করা হবে তাকে।

বিচারশালায় আসতেই বিচারক চারুদত্তকে বললেন, 'আপনি একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। কয়েকটা কথার এখন জবাব দিন।'

'মোকদ্দমা!' সদাশয় চারুদত্ত কখনও মামলা-মোকদ্দমায় জড়াননি। তাই অবাক হয়ে বললেন, 'কার সঙ্গে আমার মোকদ্দমা?'

সঙ্গে সঙ্গে সংস্থানক আস্ফালন করে বললে, 'মোকদ্দমা আমার সঙ্গে।'

চারুদত্ত বললেন, 'কি যা-তা বলছ!'

সংস্থানক বললে, 'অলঙ্কারের লোভে উজ্জয়িনীর গৌরব রত্নভূষিতা বসন্তসেনাকে তুমি হত্যা করেছ।'

সংস্থানককে থামিয়ে দিয়ে বিচারক চারুদত্তকে বললেন, 'বসন্তসেনা কি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

চারুদত্ত বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন বটে।'

বিচারক আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তিনি কোথায়?'

চারুদত্ত সহজ ভাবেই বললেন, 'নিশ্চয় তাঁর বাড়িতেই আছেন।'

সংস্থানক এই সময়ে আবার বলে উঠল, 'বাড়িতে না যমালয়ে? পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে তাকে তুমি হত্যা করে ফেলে রেখে এসেছ, তার সমস্ত অলঙ্কার তুমি চুরি করেছ।'

চারুদত্ত কি আর বলবেন, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। আর দোষ দিলেন নিজের ভাগ্যের—হায়, গরীব হয়ে পড়েছেন বলেই এ অপবাদও আজ তাঁকে শুনতে হচ্ছে।

এই সময় বীরক নামে একজন নগর-রক্ষী বিচারশালায় ঢুকে বললে, 'আমার একটা বিচার করে দিন। রাজা পালক আর্যক নামে যে গোপসন্তানকে বন্দী করে রেখেছিলেন, সে চারুদত্তের গাড়িতে করে পালিয়েছে। আমি তাকে ধরতে গিয়েছিলাম কিন্তু চন্দনক

নামে আর একজন নগর-রক্ষী আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এর বিচার চাই।'

বীরকের কথা শুনে চারুদত্ত মনে মনে ভাবলেন—দণ্ড থেকে আর কোন রকমে নিস্তার নেই। একে এই হত্যার অভিযোগ, তার ওপর আর্যকের জন্য গুরুতর অপরাধ—রাজদ্রোহ!

বিচারক বীরককে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার বিচার পরে হবে। এখন পুষ্প-করণ্ডক উদ্যানে গিয়ে দেখে এস তো, সেখানে কোনও স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে কি-না। ঘোড়ায় করে ছুটে দেখে এস।'

বীরক চলে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে তার অপেক্ষা করতে লাগল। বীরকও তেমনি সাক্ষী। তাছাড়া, সে সংস্থানকের লোক। কিছুক্ষণ বাদেই সে ফিরে এসে বললে, 'দেখে এলাম।'

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখলে?'

বীরক বললে, 'একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।'

বিচারক শুধোলেন, 'কি অবস্থায় দেখলে?'

বীরক বললে, 'আজ্ঞে, শেয়াল কুকুরে সব খেয়ে ফেলেছে।'

অর্থাৎ বীরক গিয়ে কিছুই দেখেনি।

সংস্থানক বলে উঠল, 'তবে দেখুন—চারুদত্তের কীর্তি। চারুদত্ত, এবার নিজের দোষ স্বীকার কর।'

চারুদত্ত আর কি বলবেন—মনে মনে তিনি তখন ডাকতে লাগলেন তাঁর পরম বন্ধু মৈত্রেয়কে, যার হাতে তিনি বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলি আজই ফেরত পাঠিয়েছেন। এখন সে এসে যদি বলে—'বসন্তসেনাকে অলঙ্কারগুলো ফেরত দিয়ে এলাম'—তবেই রক্ষা। মনে মনে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন—মৈত্রেয় ফিরতে এত দেরি করছে কেন!

মৈত্রেয়ও তেমনি লোক। হচ্ছে—হবে, যাচ্ছি—যাব—এই রকম তার চরিত্র। অলঙ্কারগুলো নিয়ে সে বসন্তসেনার উদ্দেশ্যে

বেরিয়েছে ঠিকই—কিন্তু অনেক দেরিতে। এমন সময় পথের মাঝখানেই শুনতে পেল—চারুদত্তকে বিচারশালায় ধরে নিয়ে গেছে এবং তাঁর বিচার হচ্ছে। এই শুনেই মৈত্রেয় ছুটতে ছুটতে অলঙ্কার-সুদ্ধ সোজা চলে এল বিচারালয়ে।

চারুদত্তের অবস্থা দেখে মৈত্রেয়ের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। চটে উঠল সে সংস্থানকের ওপর। গোটা বিচারশালাকে সম্ভাষণ করে মৈত্রেয় বললে, 'যিনি পুর-গৃহ, মঠ, উদ্যান, দেবালয়, পুষ্করিণী, কূপ এবং অসংখ্য যজ্ঞস্তম্ভ দিয়ে এই উজ্জয়িনীকে সাজিয়েছেন, দান করে যিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, যিনি ফুল তোলবার জন্য মাধবী লতাটিকেও ধরে টানেন না, পাছে তার পাতা ছিঁড়ে যায়—তিনি করবেন এই হত্যা? আপনারা এ কথা বিশ্বাস করছেন? আমি জানি, এই সংস্থানকটাই যত নষ্টের গোড়া। লাঠি দিয়ে আমি আজ ওর মাথা ভাঙব।'

'তবে রে!' সংস্থানক আস্ফালন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ও দাঁড়াল রুখে।

সংস্থানক ছুটে এসে মৈত্রেয়কে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। মৈত্রেয়ও ছেড়ে কথা কইলে না। দেখতে দেখতে বিচারশালাতেই একটা প্রকাণ্ড মারামারি লেগে গেল। সেকালে অমন হত।

এই মারামারির মধ্যে মৈত্রেয়ের হাত থেকে বসন্তসেনাকে ফেরত দিতে যাওয়া অলঙ্কারগুলি ছড়িয়ে পড়ল বিচারশালার মেঝেতে।

সংস্থানক সাগ্রহে অলঙ্কারগুলো তুলে নিয়ে দেখল—তারপর চীৎকার করে বললে, 'বিচারকরা দেখুন, এই সব অলঙ্কার বসন্ত-সেনার। এরই জন্য সে নিহত হয়েছে।'

বিচারকরা স্তম্ভিত।

মৈত্রেয় চারুদত্তকে বললে, 'যা সত্যি—তা তুমি বলছ না কেন বন্ধু?'

চারুদত্ত বললেন, 'আমার সত্যি কথা এখন আর কেউ শুনবে না মৈত্রেয়, এবং ওঁরা ভাববেন—আমি প্রাণের ভয়ে এখন মিথ্যে বলছি।'

বিচারকের কর্মচারীরা শুধোলে, 'এ অলঙ্কারগুলি আপনার ?'

চারুদত্ত বিরস কণ্ঠে বললেন, 'না—এ অলঙ্কার বসন্তসেনার। আমার ছেলেকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন।'

সংস্থানক হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'অলঙ্কারের লোভে তাঁকে হত্যা করে এখন আবার মিথ্যে কথা! আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর মৃতদেহ, দেখে এসেছে বীরক।'

চারুদত্ত স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'তবে তাই হোক।'

সংস্থানক বললে, 'নিজের মুখে সে দোষ স্বীকার কর। বল যে—হ্যাঁ, আমিই হত্যা করেছি।'

চারুদত্ত নিরুপায়। নীরবে তাঁকে সব স্বীকার করে নিতে হল। বিচারকরা তাঁর দণ্ড দিলেন নির্বাসন, কিন্তু—রাজা পালক আদেশ দিলেন—যেহেতু অর্থলোভে উজ্জয়িনীর গৌরব বসন্তসেনাকে হত্যা করা হয়েছে, সেহেতু চারুদত্তকে দক্ষিণ মশানে নিয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক।

রাজার বিচার চূড়ান্ত। দুজন চণ্ডাল ঘাতক এসে দাঁড়াল চারুদত্তের দুপাশে। তাঁকে সাজাল বলির পশুর মত—গলায় করবীর মালা, গায়ে লেপা রক্তচন্দন। তারপর ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে তাঁর অপরাধের কথা বলতে বলতে নিয়ে চলল রাজপথ দিয়ে।

এদিকে দেখতে দেখতে ভরে গেল উজ্জয়িনীর রাজপথ হাজার হাজার মানুষে। সেই জনপ্রিয় সদাশয় চারুদত্ত আজ চলেছেন দক্ষিণ মশানে! তাদের মনে অবিশ্বাস। সদাশয় চারুদত্ত এমন কাজ কখনও করতে পারেন না।

কিন্তু রাজার উপরে কথা নেই। তার উপরে আবার প্রচণ্ড শাসন রাজার শালা সংস্থানকের। উজ্জয়িনীর সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে।

চারুদত্ত রাজপথ দিয়ে চলেছেন বধ্যভূমির দিকে—ধীরে, অবিচলিত পদক্ষেপে। কিন্তু হঠাৎ বুঝি পা কেঁপে উঠল তাঁর—রোহসেনের

আর্তনাদ শুনে। ঘাতকদের দিকে তাকিয়ে চারুদত্ত বললেন, 'আমার একটি ভিক্ষা আছে তোমাদের কাছে। আমার ছেলের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করতে দাও।'

ঘাতকরা অনুমতি দিল।

রোহসেন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলে বাবাকে। কেঁদে উঠল, 'বাবা! বাবা!'

রোহসেনের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শেষবারের মত বুকে জড়িয়ে ধরে চারুদত্ত বললেন, 'যাও বাছা—তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও।'

ঘাতকরা চারুদত্তকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

রোহসেন চীৎকার করে ঘাতকদের বললে, 'আমার বাবাকে তোমরা মারছ কেন! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওঁকে—কেন নিয়ে যাচ্ছ?'

ঘাতকরা বললে, 'বাছা, এর জন্য রাজাজ্ঞাই অপরাধী, আমরা নই।'

রোহসেন বললে, 'বাবাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমাকে বধ কর।'

ঘাতকরা বললে, 'বাছা, তুমি চিরজীবী হও।' তারপর পথের দু-ধারের লোককে তারা হেঁকে বললে, 'সরে যাও—সবাই সরে যাও। এ তোমরা দেখ না, সহ্য করতে পারবে না। সরে যাও।'

রাজপথের দু-পাশের মানুষ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি পাথরের মত। তাদের চোখে জল। এমন সময় ভারি একটা গোলমাল বেধে গেল। সংস্থানকের ভৃত্য, দাস স্থাবরক কোথায় কোন ঘরের মধ্যে বাঁধা ছিল শেকলে। সেই শেকল ছিঁড়ে লাফ দিয়ে এসে পড়ল সে ঘাতকদের সামনে। চীৎকার করে বললে, 'বসন্তসেনাকে চারুদত্ত মারেননি, মেরেছেন আমার প্রভু সংস্থানক। এ ঘটনা আমি জানতাম—তাই প্রভু আমাকে ঘরের মধ্যে শেকলে বেঁধে রেখেছিল।'

স্থাবরকের পেছনে পেছনে ছুটে এল তার প্রভু সংস্থানক। সকলকে নানা মিথ্যা বলে বোঝাতে লাগল। এক ফাঁকে স্থাবরককে নিজের হাতের সোনার বালা খুলে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'নে—এই বালা দুটো নে, এখন সব আবার মিথ্যে করে বল।'

স্থাবরক চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আপনারা এই দেখুন—ইনি আমাকে সোনার বালার লোভ দেখাচ্ছেন আবার। আপনারা এর বিচার করুন।'

কিন্তু মূর্তিমান সংস্থানকের সামনে তার কথা টিকল না। সংস্থানক চণ্ডালদের হুকুম দিলেন, 'তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে ওকে বধ কর।'

রোহসেন কাঁদতে কাঁদতে বাপের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

সংস্থানক চোখ পাকিয়ে বললে, 'তবে বাপ-বেটা দুজনকেই নিয়ে যা মশানে।'

চারুদত্ত আঁতকে ওঠে মৈত্রেয়কে বললে, 'রোহসেনকে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও ভাই মৈত্রেয়—নইলে ওর ছোট্ট জীবনটুকুও যে শেষ হয়ে যায়!'

শেষ পর্যন্ত ঘাতকরা রোহসেনকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর তারা তাড়াতাড়ি চারুদত্তকে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। ওদের ক্রমাগত ঢ্যাটরা পেটার সঙ্গে সঙ্গে চারুদত্তের অপরাধ বর্ণনা, আর রোহসেনের কান্না—সব মিলে একটা গোলমাল শেষ পর্যন্ত লেগেই রইল।

এই গোলমাল শুনে দূরে থমকে দাঁড়ালেন বসন্তসেনা।

তিনি শেষ পর্যন্ত মরেননি। সংস্থানকের হাতে মরতে বসেছিলেন ঠিকই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাঁর মুখে জলটল দিয়ে, সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে কোন রকমে বাঁচিয়ে তোলেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরবার পথে শুনতে পেলেন ঢ্যাটরা পেটা আর চারুদত্তের অপরাধের কথা।

বসন্তসেনা কেঁদে ফেললেন, 'হায় হায় আমার জন্য মহাত্মা চারুদত্ত মরতে যাচ্ছেন।' বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বললেন, 'শিগগির আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন।'



বসন্তসেনা প্রায় ছুটে চললেন—আগে আগে পথ করে ছুটলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ঠিক তখনই চারুদত্তকে বধ করবার জন্য ঘাতকেরা তুলেছে খড়্গ। চারুদত্তকে ঘাতকরা বললে, 'রাজার আদেশ। এখন যাদের স্মরণ করবার, তাদের স্মরণ করুন।'

দূর থেকে বসন্তসেনা চীৎকার করে উঠলেন, 'মেরো না—ওঁকে মেরো না। আমি বসন্তসেনা।'

বসন্তসেনা!···

ঘাতকদের হাত থেকে খড়্গ খসে পড়ল।

একজন ঘাতক সবিস্ময়ে বসন্তসেনার দিকে চেয়ে বললে, 'বসন্তসেনা বেঁচে আছেন।'

আর একজন ঘাতক বললে, 'আর তো আমরা চারুদত্তকে বধ করতে পারিনে। রাজাকে এখন খবরটা দেওয়া দরকার—চল।'

গোটা ব্যাপারটা হঠাৎ যেন উলটে গেল। সমস্ত ঘটনা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। তারা ক্রমশ ক্ষেপে উঠতে লাগল সংস্থানকের ওপরে। ব্যাপার আর সুবিধের নয় দেখে সংস্থানক গা-ঢাকা দিলে।

এই সময়ে বেজে উঠল তূরী-ভেরী—রাজপথের ভীড় ঠেলে পত্ পত্ করে নিশান উড়িয়ে চারুদত্তের সামনে এসে দাঁড়াল এক রাজদূত। চারুদত্তকে অভিবাদন করে বললে, 'স্বেচ্ছাচারী রাজা পালক নিহত এবং উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসেছেন রাজা আর্যক। তাঁর আদেশে নিরপরাধ চারুদত্ত মুক্ত।'

চারুদত্ত বলে উঠলেন, 'সেই আর্যক—যাঁকে রাজা পালক অকারণে বন্দী করে রেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ রাজা পালক যজ্ঞস্থলের পথে নিহত হয়েছেন।' রাজদূত সবিনয়ে বললে, 'রাজা আর্যকের দ্বিতীয় ঘোষণা হল—প্রীতিবন্ধনের উপহারস্বরূপ রাজা আপনাকে কুশাবতী রাজ্য দান করেছেন।'

এমন সময় রাজপথের দিকে ভয়ানক একটা কোলাহল উঠল। উজ্জয়িনীর জনসমুদ্র যেন 'মার মার' করে ছুটে আসছে—কাকে যেন তাড়া করেছে কুকুরের মত।

সে আর কেউ নয়—রাজা পালকের শ্যালক সংস্থানক। তার কীর্তি আর কারুর কাছে অজানা নেই। সংস্থানক প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে চারুদত্তের পা জড়িয়ে ধরলে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমাকে ওরা মেরে ফেললে।'

সদাশয় চারুদত্ত তাকে হাতে ধরে তুললেন। মৃদুমধুর কণ্ঠে বললেন, 'ওঠ, শরণাগতকে আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।'

চারুদত্তের কৃপায় সংস্থানক সে যাত্রায় কোন রকমে বেঁচে গেল। চারুদত্ত তাঁর উপকারী বন্ধুদেরও নানা পদে অভিষিক্ত করলেন। সংস্থানকের সেই বন্দী ভৃত্য—সে চিরদাসত্ব থেকে মুক্ত হল। যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উজ্জয়িনীর গৌরব বসন্তসেনাকে বাঁচিয়েছিলেন—তাঁকে রাজ্যের সমস্ত মঠের কুলপতি করে দেওয়া হল। সকলের প্রীতি ও বন্ধুত্বের মাঝখানে চারুদত্ত সসম্মানে কুশাবতী রাজ্যে রাজত্ব করতে লাগলেন।

।। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' থেকে ।।



দুঃখের তপস্যা

প্রাচীন ভারতের দুটি সমৃদ্ধ জনপদ—বিদিশা আর বিদর্ভ। বিদিশা বড়, বিদর্ভ ছোট। বিদিশার নামডাক বেশী। রাজাও তার মস্ত রাজা—অগ্নিমিত্র। যেমন বীর যোদ্ধা—তেমনি কলা-রসিক। একদিকে তাঁর রণনিপুণ সেনাপতিরা—অন্য দিকে দেশ উজাড় করে যত শিল্পাচার্য আর নাট্যাচার্য এসে জড়ো হয়েছে অগ্নিমিত্রের রাজ্যে। তাঁরা কেউ ছবির পর ছবি এঁকে ভরে তুলছেন রাজার চিত্রশালা, কেউ মহড়া দেন নাটক ও নৃত্যের, কোথাও বা ওঠে বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনি। কখনও কখনও বা বেধে যায় আচার্যে আচার্যে ঘোর দ্বন্দ্ব—কে বড়। নস্যির গুঁড়ো-বারুদে ঘর অন্ধকার, হাঁচির চোটে সেখানে টেকে কার সাধ্য। রাজা অগ্নিমিত্র সোৎসাহে জুগিয়ে যান সকলের মাসোহাবা—কখনও বা উপরি খুলে দেন খুশী হয়ে হাতের স্বর্ণ বলয় ও বাজুবন্ধ। হেন রাজা অগ্নিমিত্র। এদিকে বিদর্ভ ছোট রাজ্য। তার রাজপুত্র মাধবসেনের ভারি সাধ হল—বিদিশার রাজার সঙ্গে নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে মিতালি করা।

এই নতুন মিতালির খবর যাবে বিদিশায়—সব ঠিকঠাক। এমন সময় ঘটে গেল এক ওলট-পালট কাণ্ড। সেকালের রাজা-রাজড়ার তন্ত্র-মন্ত্র ষড়যন্ত্র—এই রাজা তো এই ফকির। পারিবারিক চক্রান্তে চলে গেল রাজপুত্র মাধবসেনের রাজ্যাধিকার, সপরিবারে তিনি বন্দী হলেন। বিদর্ভের রাজচ্ছত্র অধিকার করে বসল তাঁর জেঠতুত

ভাইরা। হঠাৎ এই ওলট-পালটে মনে মনে ভাগ্যকে শুধু দোষ দিলেন বিদর্ভের রাজনন্দিনী মালবিকা।

বিদিশায় কোথায় যাবে ঘটকালির খবর—শেষে খবর গেল কি-না মাধবসেন সপরিবারে আটক, বিদর্ভের রাজনন্দিনী বন্দিনী! রাজা অগ্নিমিত্র সব ঘটনা শুনলেন। শেষে তিনি নতুন বিদর্ভরাজকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন—'ছেড়ে দাও মাধবসেনের পরিবার-পরিজনকে। বিদর্ভ-রাজনন্দিনী মালবিকা আমার বাগ্‌দত্তা।'

কিন্তু সে চিঠি যখন এসে পৌঁছল বিদর্ভে তখন রাজকন্যা মালবিকা আর বিদর্ভে নেই। কোথায় যে চলে গেল—কেউ জানে না।

সারা দেশে পড়ে গেল 'খোঁজ খোঁজ!' কোটাল রক্ষী ছুটল পক্ষীর মত। রাজকন্যাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অগত্যা নতুন বিদর্ভরাজ অগ্নিমিত্রকে লিখে জানালেন—'বিদর্ভ-রাজনন্দিনী মালবিকা কোথায় চলে গেছে জানি না। তবে মাধবসেনের মুক্তি যদি চান তাহলে আমার শালা যে আপনার কারাগারে বন্দী আছে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

চিঠি পেয়ে অগ্নিমিত্র অগ্নিমূর্তি। গর্জন করে বললেন, 'ওই চক্রান্তকারী পাপিষ্ঠের সঙ্গে বন্দী বিনিময়! ওর চিঠির জবাবে সেনাপতি বীরসেনকে এক্ষুনি যুদ্ধসজ্জা করে যেতে বল।'

বিদিশায় পড়ে গেল 'সাজ সাজ' রব। চলতে লাগল বিদর্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন।

বিদর্ভের রাজকুমারী মালবিকা তখন বিদর্ভ থেকে অনেক দূরে! মন্ত্রী সুমতি তার বাপের আমলের পাকা লোক, পাকা মাথা—ফন্দি ফিকিরে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠবে কে? একদিন তিনি ছদ্মবেশে নতুন বিদর্ভরাজের চোখে ধুলো দিয়ে মালবিকাকে নিয়ে পাড়ি দিলেন বিদিশার দিকে, সঙ্গে গেল তাঁর এক ছোট বোন। মনের ইচ্ছে—রাজা অগ্নিমিত্রের হাতে বিদর্ভের রাজনন্দিনীকে সমর্পণ করা।

বিদর্ভ ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে তাঁরা দেখতে পেলেন— মস্ত বড় এক সার্থবাহের দল, বাণিজ্য করতে চলেছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। চলেছে উটের সারি, গোযানের সারি। মন্ত্রী সুমতি নিজের বোন ও রাজকুমারীকে নিয়ে মিশে গেলেন এই বণিকদের সঙ্গে।



কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়—সেইখানেই কি সন্ধ্যে হয়! হঠাৎ একদিন বণিকদের ধনরত্নের লোভে 'রে-রে' ক'রে এসে পড়ল দুরন্ত দস্যুর দল। লেগে গেল বণিকদের সঙ্গে লড়াই। বণিকরা হটে গেল। ছত্রভঙ্গ তুরঙ্গম—পালাতে লাগল যে যেদিকে পারল। বুড়ো মন্ত্রী সুমতি শুধু একাই লড়তে লাগলেন প্রাণপণে—যেমন করে

হোক রক্ষা করতে হবে প্রভুপুত্রী বিদর্ভের রাজনন্দিনীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। যুদ্ধ করতে করতে তিনি মারা গেলেন।

দস্যুরা বন্দিনী করে নিয়ে গেল রাজকুমারী মালবিকাকে।

দস্যুরা চলে গেলে পর বেরিয়ে এলেন আড়াল থেকে মন্ত্রী সুমতির বোন কৌশিকী। তিনি কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়ে গেছেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি দাদার দেহের সৎকার করলেন। তারপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরে খুঁজে খুঁজে চললেন রাজকুমারী মালবিকাকে। কিন্তু কোথায় মালবিকা। মনে মনে আপশোষ করে বলেন কৌশিকী—এতদিনে বোধ করি সেই সিদ্ধপুরুষের কথা ফলল! মালবিকার জন্মের সময় কোনও এক সিদ্ধপুরুষ বলেছিলেন—রাজকুমারীকে একটি বছর দাসীর দুঃখ ভোগ করতে হবে, তারপর হবে এঁর সুযোগ্য পতিলাভ।

রাজকুমারী মালবিকা তখন চলেছে দস্যুদলের সঙ্গে কত গিরি-কান্তার পার হয়ে। হাঁটতে পারে না—ছুটতে পারে না, কখনও চলার অভ্যেস নেই। তবু চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—এদেশ থেকে ওদেশ, এ-বন থেকে ও-বন। শেষে বিদিশার সীমান্তে। এমন সময় দস্যুর দল পড়ে গেল বিদিশার সীমান্তরক্ষী বীর সেনাপতি বীরসেনের সামনে। আর যাবে কোথায়! দুরন্ত দস্যুদলকে তিনি কচু-কাটা করে দিলেন। এ বিদর্ভ নয় যে ডাকাতেরা মনের সুখে লুঠপাট করে বেড়াবে! এ বিদিশা। রাজা অগ্নিমিত্রের প্রবল প্রতাপের ছায়ায় সর্বত্র বিরাজ করছে শান্তি।

দস্যুদের দলের মধ্যে বীরসেন দেখতে পেলেন—অপরূপ রূপবতী এক কন্যা। দস্যুর দল বিধ্বস্ত হওয়ায় আবার সে যেন অনাথা। হায়, কবে তার দুর্ভাগ্যের অবসান হবে! মালবিকা তার নিজের পরিচয় কিছুই দিলে না। বন্দিনীর দুর্ভাগ্য—লজ্জায় সব কথা বুঝি বা আটকে গেল।

সেনাপতি বীরসেন মালবিকাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর দিদির কাছে। দিদি তাঁর বিদিশার পাটরানী দেবী ধারিণী।

শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্নের বিদিশায় এল মালবিকা কিন্তু বন্দিনী দাসী হয়ে। ভাইয়ের কাছ থেকে তাকে উপহার পেয়ে দেবী ধারিণী ভারি খুশী। মেয়ে তো নয়, যেন ফোটা একটি লাল কমল। খুশী হয়ে দেবী ধারিণী মালবিকাকে করে নিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সখীদের একজন। আর মালবিকা ডাগর দুই চোখ মেলে দেখল—বহুদিনের শোনা এই সেই বিদিশা···এই সেই রাজপ্রাসাদ···এই সেই তার স্বপ্নের দেশ!···আর কোথায় সেই বহুখ্যাত বীর রাজা—যাঁর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল?

এদিকে মন্ত্রী সুমতির বোন কৌশিকীও ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হলেন বিদিশায়। মুখে তার পবিত্র দীপ্তি আর অঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর বেশ। তাঁকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন রাজা রানী দু-জনেই। তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন রাজমহলেই। থাকতে থাকতে নানা শলা, নানা পরামর্শে রাজারানীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলেন কৌশিকী।

রাজকুমারী মালবিকাকে একদিন দেখলেন তিনি—কিন্তু কিছু বললেন না। সেই সিদ্ধপুরুষের কথা মত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন—দাসীর দুর্ভাগ্য শেষ হয়ে কবে আসবে বিদর্ভ-রাজনন্দিনীর সৌভাগ্যের দিন।

সন্ন্যাসিনীর বেশে কৌশিকীকে মালবিকাও চিনতে পারল না।

এমনি করে রইল ওরা কাছে কাছে, কিন্তু তবু দূরে দূরে।

তারপর একদিন ভাগ্যের পথ খুলল বুঝি হতভাগিনী মালবিকা দাসীর। চিত্রশালায় ছবি দেখতে গিয়েছিলেন রাজা অগ্নিমিত্র আর রান ধারিণী। হঠাৎ একটা ছবির কাছে থমকে দাঁড়ালেন রাজা।

ছবিটা রানীর, পাশে দাসী মালবিকা। দেবী ধারিণী দেখলেন—রাজা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মালবিকার ছবির দিকে।

আর রাজা দেখলেন—রূপ তো নয়, ছবিও যেন আলো। রাজা শুধোলেন, 'এ কে!'

একজন বলে দিলে, 'নতুন দাসী, নাম মালবিকা।'

এর চেয়ে কি-ই বা আছে আর দাসী মালবিকার পরিচয়। তবু রাজার বুঝি মনে হল, সর্বসুলক্ষণা এ মেয়েটি তো সামান্য মেয়ে নয়। রাজার মনে আঁকা রইল সেই পটের ছবি।

সামান্য যে নয়—এ কথা স্বয়ং পাটরানীরও মনে হয়। দেখেন তিনি—দাসী মালবিকা নানা গুণে গুণবতী। শুরু হল এবার তার গুণের পরীক্ষা। দেবী ধারিণী একদিন বললেন, 'যাও মালবিকা, নাট্যাচার্য গণদাসের কাছে আজ থেকে তুমি অভিনয় ও নাচ শেখোগে।'

মালবিকা মন দিয়ে নাচগান অভিনয় শিখতে লাগল। আচার্য গণদাস এমন একটি গুণবতী ছাত্রী পেয়ে ভারি খুশী। যোগ্য ছাত্রছাত্রী পেলে শিক্ষকদের বড় আনন্দ। আচার্য সব বিদ্যে উজাড় করে শেখালেন।

এদিকে রাজার মনে কৌতূহল—কে সেই ছবি-আলো-করা মেয়েটি? স্বচক্ষে তাকে একবার দেখতে হবে। রাজার বন্ধু গৌতম; তাকে তিনি মনের কথা খুলে বললেন।

গৌতম বললেন, 'দেখবেন—সে এমন আর শক্ত কী! আমি ব্যবস্থা করছি।'

রাজা বললেন, 'কি ব্যবস্থা করবে?'

গৌতম বললেন, 'আপনার দু'জন নাট্যাচার্যের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছি। আপনি দু'দিন সবুর করুন।'

গৌতমের কূট বুদ্ধি। লাগিয়ে-ভাঙিয়ে আচার্য গণদাস আর আচার্য হরদত্তের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন—কে বড়। দুই পণ্ডিত

আচার্য একদিন হাত-পা নেড়ে ঝগড়া করতে করতে রাজার কাছে এসে হাজির।

গণদাস বললেন, 'এই হরদত্ত ভালো ভালো সব লোকের কাছে বলে বেড়িয়েছে—আমি নাকি ওর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নই।'

সঙ্গে সঙ্গে হরদত্ত বললেন, 'মহারাজ, ও চারদিকে বলে বেড়িয়েছে—আমি নাকি ডোবা আর ও একেবারে সমুদ্র! মহারাজ, আপনি আমাদের বিদ্যের পরীক্ষা করুন।'

সন্ন্যাসিনী কৌশিকী বিচার করে বললেন, 'কে কেমন শিক্ষা দিয়েছে তা দেখেই জানা যাবে—কে বড় আচার্য। এখন যে যাঁর ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এসে পরীক্ষা দিন।'

দুই আচার্য ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, 'উত্তম।'

গৌতমের কূটবুদ্ধিব ফল ফলল। প্রথমেই আচার্য গণদাসের ছাত্রী মালবিকা এল পবীক্ষা দিতে।

বাজা দেখলেন মালবিকাকে—চোখে যেন আর পলক পড়ে না। মালবিকা তো নয়—এ যেন শরৎকালের মূর্তিমতী জ্যোছনা! এর কাছে সেই আলো-করা পটের ছবিও যেন অন্ধকার কুচ্ছিৎ।

আব হতভাগিনী দাসী মালবিকা দেখল রাজাকে। ভয় হল তার—আজ যেন আচার্যের পরীক্ষা নয়, এ পরীক্ষা তার জীবন-মরণের, এ পরীক্ষা তার ভাগ্যের। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সে নাচল, গাইল—অপরূপ তার লাস্য।

জয়-জয়কার পড়ে গেল, শুধু আচার্যের নয়—মালবিকারও। রাজা মনে মনে বুঝতে পারলেন—এ কোনও বড় ঘরের মেয়ে না হয়ে যায় না। রাজা মুগ্ধ—স্বয়ং পাটরানীও মুগ্ধ। আর সন্ন্যাসিনী কৌশিকী তখনও নীরবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলেন—কবে কাটবে হতভাগিনী মালবিকার দাসীর জীবন।

সে জীবন বোধ করি বা শেষ হয়ে এল মালবিকার। সামনে এল আর এক চরম পরীক্ষা। রানী ধারিণী হুকুম করলেন, 'যাও

মালবিকা, একটা অশোক গাছে কিছুতেই ফুল ফুটছে না—তুমি দোহদ দিয়ে এস।'

সেকালের গাছপালাও ছিল যেন মানুষের সামিল—তারও সাধ আছে, আহ্লাদ আছে। মানুষের পরশ না পেলে তাদেরও ফুল ফোটে না, হাসি ঝরে না। যারা সুলক্ষণা ভাগ্যবতী মেয়ে—তারা এমনি এসে বসত অশোক তরুর তলায়, ডগডগে করে পা ভরে পরত আলতা। তারপর সেই আলতা-পরা পায়ের ছাপ এঁকে দিত অশোক তরুর গায়ে। মেয়ে যদি ভাগ্যবতী সুলক্ষণা হয়, তা হলে ফুটে উঠত রাঙা অশোকের গুচ্ছ। আর যদি পোড়া-কপালী রাক্ষসী হয়—তা হলে অশোক গাছ যে-কে-সেই।

পাটরানীর আদেশ শুনে মালবিকার বুক দুরু দুরু। রাজনন্দিনী হলে হবে কী—এমনিতে তো তার পোড়া কপাল! এমন ভাগ্য কি তার হবে—ফুটবে ওই অশোক গাছে ফুল?

ধারিণী বললেন, 'ফুল যদি ফোটে, তা হলে মনের ইচ্ছে তোমার পূরণ করব।'

হায় রে তার মনের ইচ্ছে। ফুল-না-ফোটা সেই অশোক তরুর তলায় এসে মালবিকা কাঁদতে বসল। কত কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ভাইয়ের কথা, মনে পড়ল ঘটকালির কথা। কোথায় গেল সে দিন—আর আজ কিনা সেই বিদিশার রাজবাড়িতে সে পাটরানীর হতভাগিনী সহচরী মাত্র!

রানীর পরিচারিকাদের মধ্যে একজন ছিল মালবিকার খুব বন্ধু। নাম তার বকুলাবলিকা। সে এসে মালবিকাকে শান্ত করে আলতা পরিয়ে দিলে পায়ে—বেঁধে দিলে সুবর্ণের নূপুর। অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'রানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও।'

মালবিকা বললে, 'এমন ভাগ্য কি আমার হবে!'

সেদিন বাগানে বেড়াতে এসেছিলেন রাজা অগ্নিমিত্রের আর এক রানী—নাম তাঁর ইরাবতী। সে রানী বড় অভিমানিনী—জটিলা-কুটিলা-লাগানি-ভাঙানি। রানী ইরাবতী দেখলেন মালবিকার অশোক তরুর দোহদ। দেখে রাগে মুখ থম্ থম্—পা ঝম্ ঝম্। চললেন পাটরানীর কাছে। পাটরানীও যে মালবিকাকে বড় বেশী প্রশ্রয় দেন, তাকে নাচ-গান শেখান, আজ আবার অশোক তরুর দোহদ! সাধারণত দোহদে রানীরাই যায়—কিন্তু পাটরানী কিনা সেখানে পাঠিয়েছেন পরিচারিকা মালবিকাকে! এসব ব্যাপারে ইরাবতী মনে মনে জ্বলছিলেন। লাগিয়ে-ভাঙিয়ে পাটরানীর কাছে গিয়ে বললেন, 'মালবিকা দাসীর আস্পদ্দা, সে আমাকে অপমান করেছে। তোমার আশ্কারাতেই ও এত বাড় বেড়েছে। ওর সঙ্গে আছে ওই নষ্টের গোড়া বকুলাবলিকা চেড়ি।'

রাজার যেমন বাইরের বিচার—অন্দরমহলে তেমনি হলেন পাটরানী। রানী ইরাবতীকে শান্ত করবার জন্য ধারিণী দেবী দণ্ডের আদেশ দিলেন—'মালবিকা আর তার সখী বকুলাবলিকাকে আটক রাখ পাতাল-ঘরে। পায়ে দাও লোহার বেড়ি।'

মালবিকার দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। বন্দিনী হয়ে রইল সেই পাতাল-ঘরে—যেখানে ঢোকে না আলোর কিরণ, মানুষের রা। ওদিকে যেন তার ভাগ্যকে উপহাস করে ফুল ফুটল সেই এতদিনের ফুল-না-ফোটা অশোক তরুতে। রাজা শুনলেন, পাটরানী শুনলেন—বুঝলেন, এ বড় ভাগ্যবতী সুলক্ষণা মেয়ে। আর শুনে শুনে জ্বললেন রানী ইরাবতী।

রানী ধারিণীর মনে কি আছে, কে জানে! কেউ তার খবর জানে না। প্রতিহারীর মুখে তিনি রাজার কাছে খবর পাঠালেন, 'মালবিকার দোহদে যে অশোক গাছে ফুল ফুটেছে, রাজার সঙ্গে তিনি বাগানে সেই ফুল ফোটা দেখতে যাবেন।'

আর সন্ন্যাসিনী কৌশিকী দেবীকে ডেকে বললেন, 'শুনেছি—আপনি নাকি ভালো সাজাতে পারেন। মালবিকাকে আজ আপনি সাজিয়ে দিন। তার অশোক গাছে ফুল ফুটেছে—আজ আমরা সবাই দেখতে যাব।'

মালবিকাকে মনের সাধে ভালো করে সাজিয়ে দিলেন কৌশিকী দেবী। মনে ভাবলেন—কে জানে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে আজ ওর মুক্তি কি না। সিদ্ধপুরুষের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর এক বছর তো হতে চলল।

ওদিকে বেদী বাঁধা হয়েছে অশোক তলায়—হয়েছে উৎসবের আয়োজন। রাজা এলেন, রানী ধারিণী এলেন, এল যত সহচরী। এল মালবিকা। দেবী কৌশিকী তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন বিয়ের কনেটির মত, অঙ্গে লাল চেলি—কপালে চন্দনের ফোঁটা।

সবাই ভাবে—কি আছে রানী ধারিণীর মনে, কে জানে!

এমন সময় এক প্রতিহারী এসে খবর দিলে, 'মহাবীর বীরসেন ষড়যন্ত্রকারী বিদর্ভরাজকে পরাজিত করে সপরিবারে কুমার মাধবসেনকে মুক্ত করেছেন। মাধবসেন এখন স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নানা উপহার দিয়ে দূত পাঠিয়েছেন—দূতের সঙ্গে পাঠিয়েছেন দু'জন শিল্পী-কন্যা। নাচগানে তারা খুব নিপুণ।'

রাজা বললেন, 'নিয়ে এসো এইখানে।'

শিল্পী-কন্যা দু'জন এল অশোক তরুর উৎসবে। এসেই তাদের চক্ষু স্থির! মালবিকাকে দেখে চিনতে পারলে। সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আমাদের রাজকুমারী!'

রানী অবাক, রাজা অবাক।

রাজা বললেন, 'ইনি কে বললে? কোথাকার রাজকুমারী?'

একজন শিল্পী-কন্যা বললে, 'আমাদের বিদর্ভ-রাজনন্দিনী। যে মাধবসেনকে মহারাজের সেনাপতি বীরসেন মুক্ত করেছেন—সেই মাধবসেনের বোন মালবিকা।'

দেবী ধারিণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'রাজকুমারী মালবিকা! ছিঃ ছিঃ তবে তো আমি এতদিন চন্দনকে জুতোর মত ব্যবহার করেছি!'

রাজা শুধোলেন, 'কেমন করে এমন হল?'

শিল্পী-কন্যা বললে, 'আমাদের মন্ত্রী সুমতি একদিন তাঁর বোন ও রাজকন্যাকে নিয়ে ছদ্মবেশে কোথায় পালালেন—আমরা কেউ জানি না। তারপর রাজকুমারীর আর কোনও খবর জানতুম না।'

এতক্ষণ সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সন্ন্যাসিনী কৌশিকী। তিনি বলে উঠলেন, 'তার পরের ঘটনা আমি জানি। শুনুন তবে।'

তাঁর গলা শুনে রাজা রানী চমকে উঠে তাকালেন তাঁর দিকে, চমকে উঠল শিল্পী-কন্যা দু'জন। তারা বলে উঠল, 'এ কী, কৌশিকী ঠাকরুণের গলা শুনতে পাচ্ছি যেন!'

কৌশিকী ঠাকরুণ এগিয়ে এলেন—শিল্পী-কন্যা দু'জন গড় হয়ে প্রণাম করল, প্রণাম করলেন রাজা অগ্নিমিত্র, রানী ধারিণী।

রাজা শুধোলেন, 'এঁরা কি সকলেই কৌশিকী দেবীর চেনা লোক?'

কৌশিকী দেবী বললেন, 'আমি বিদর্ভ-রাজমন্ত্রী সুমতির বোন।'

'আপনি!' রাজা ও রানী সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

কৌশিকী দেবী বলতে লাগলেন অতীত ঘটনার কথা—কেমন করে তাঁরা বিদিশায় আসবার জন্য রাজকন্যাকে নিয়ে বণিকদের দলে ঢুকলেন, কেমন করে দস্যুরা আক্রমণ করলে—তাঁর দাদা নিহত হলেন, বিদর্ভ-রাজনন্দিনী কেমন করে ভেসে চললেন তাঁর ভাগ্যের স্রোতে খড়কুটোর মত।

রাজা শুধোলেন, 'এতদিন আপনি এসব কথা বলেননি কেন?'

কৌশিকী দেবী বললেন, 'আমি এক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বলেছিলেন—রাজকুমারীর এক বছর দাসীর দুঃখ ভোগ আছে।'

এমন সময় আর এক প্রতিহারী এসে খবর দিলে, 'সেনাপতি পুষ্পমিত্র জানিয়েছেন—দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে যে ঘোড়াটি ছাড়া হয়েছিল—তা মহারাজের প্রবল প্রতাপ দশাদকে ঘোষণা করে ফিরে এসেছে।'

এ যশোগৌরবে রাজা খুশী, রানী খুশী। এমন দিনে রাজা রানী পারিতোষিক দেন। রানী প্রতিহারীকে বললেন, 'যাও, অন্তঃপুরবাসিনীদের কাছে এই খবর দিয়ে এস। আর রানী ইরাবতীকে বল—মালবিকার জন্ম রাজকুলে। অশোক ফুল ফোটাবার ভার দেওয়ার সময় তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—তার মনের ইচ্ছে আমি পূরণ করব। আজ সেই দিন। আজ তাকে মুক্ত করলাম। তিনি যেন না রাগ করেন।'

খবর শুনে রানী ইরাবতী আর কি বলবেন! পাটরানীর ওপরে কথা বলেন—এত সাহস তাঁর নেই। তাঁর মতেই মত দিলেন।

নানা মঙ্গল সংবাদে রাজপ্রাসাদ আনন্দ লহরীতে ভরা—তেমনি সারা বিদিশায় কলকাকলী। বিশেষ করে দিগ্বিজয়ের সংবাদে।

সেই আনন্দে দেবী ধারিণী মালবিকার হাত ধরে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার বোনের মত। এস বোন—তোমার গুরুজনদের যে ইচ্ছে ছিল—তোমাকে রাজার হাতে সমর্পণ করা—তাই আমি আজ পূরণ করি।'

কৌশিকী দেবী মালবিকার সামনে এসে বললেন, 'জয় হোক ঠাকুরাণী। আমার মনের সাধ এতদিনে মিটল।'

প্রাসাদ জুড়ে বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ। এত দিনে হল বিদর্ভ-রাজনন্দিনীর দুর্ভাগ্যমোচন।

॥ কালিদাস রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' থেকে ॥



ভোরের স্বপ্ন

এক ছিলেন রাজা—তাঁর নাম চিন্তামণি। রাজার একটি ছেলে—নাম তার কন্দর্পকেতু। মুনিজনের আদরের ধন—গেরস্তের পরম নির্ভর। তার রূপের দিকে চেয়ে কেউ চোখ ফেরাতে পারে না—গুণে মানুষের কথা কুলোয় না, বীরত্বে চারিদিক সন্ত্রস্ত। রাজ্যে কারুর হাত কাটা যায় না—কারণ চোর-বদমাস নেই। আগুনে পুড়ে কেউ মরে না—পোড়ে শুধু সোনা। শত্রু নেই যে যুদ্ধ হবে।

কুমার কন্দর্পকেতু একদিন এক স্বপ্ন দেখলে—ভোর তখন হয়-হয়। এমন ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। কন্দর্পকেতু দেখলে—অপরূপ সুন্দরী এক রাজকুমারীকে। কোন্ দেশে হায় নিবাস যে তার—কে জানে! চোখ তো নয়—ভোরের শিশির-ধোয়া পদ্মের পাপড়ি, চাঁদের কণা ছেনে মুখের লাবণি, কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। তারপর কোথায় কী, আকাশের নীলিমায় স্বর্গের সে ছবি যেন স্বর্গে মিলিয়ে গেল। কন্দর্পকেতুর ঘুম ভেঙে গেল। তেমনি মন ভেঙে গেল দুঃখে—কোথায় গেল সে পটে-আঁকা ছবি! পড়ে রইল রাজকাজ, দূরে রইল মৃগয়াবিহার—ঘুচে গেল আহারনিদ্রা। দিন গেল—রাত্রি এল, কিন্তু সে স্বপ্ন তো আর চোখে নামে না।

কুমারের বন্ধু মকরন্দ বোঝাতে এল। বললে, 'স্বপ্ন কি আর সত্যি হয়! কাজকর্মে মন দাও—রাজ্যপাট দেখ।'

কন্দর্পকেতু বললে, 'যেখান থেকে হোক, স্বর্গের সে ছবি আমি খুঁজে বের করব। আমি চলে যাচ্ছি দেশান্তরে। সঙ্গে যদি যেতে চাও তো চল।'

মকরন্দ আর কি করে, সঙ্গ নিলে কন্দর্পকেতুর। যত হোক—রাজকুমার তার ধুলোখেলার বন্ধু, ছেলেবেলার সাথী। দু'জনে বেরিয়ে গেল রাজ্য ছেড়ে—অনিশ্চিতের সন্ধানে। এ খবর রাজ্যের আর কেউ জানল না।

বহুদূর এসে থামল ওরা সেই বিন্ধ্যাচলে—চুড়ো যার নুয়ে আছে ঋষি অগস্ত্যের জন্য। সানুদেশে ঘোর অরণ্য—হিংস্র শ্বাপদে ভরা, আকাশের আলো গিয়ে ছুঁতে পারে না বনের মাটি। গাছে-পালায় লতায়-পাতায় অন্ধকার! তাকে বেড় দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী রেবা; দুই তীরে তার কলহংসের কাকলী, ঠাণ্ডা ছায়ায় দোয়েল কোয়েলের কূজন। সেইখানে এসে ওরা সেদিনের মত থামল। সূর্য তখন পাটে নেমেছে।

বনের ফল-পাকুড় পেড়ে এনে মকরন্দ কন্দর্পকেতুকে খেতে দিলে—নিজেও খেলে কিছু। তারপর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় গাছ দেখে দুটো ডাল আশ্রয় করলে দু'জনে। দেখতে দেখতে ঘোর জঙ্গলের রাত শাঁ-শাঁ করতে লাগল চারদিকে।

পাশের গোলাপ-জামের গাছে থাকে হরেক রকমের পাখি। সূর্যের পাট গুটোবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফিরে এল গাছে। রাতের সঙ্গে সঙ্গে সকলের কল-কাকলী থেমে এল। হুতোম প্যাঁচা বেরুল রাতের পাহারায়। চারিদিক নিঃসাড়। এর মধ্যে ময়না-বৌ শুধু ঘর-বার করতে লাগল—ময়না তখনও ফেরেনি। ভয়ে ভাবনায় আর এক গাছে বুঝি উড়ে বসেছিল—পাহারাদার হুতোম হেঁকে

দিলে—ভূত্ ভূতুম্। বেচারী ময়না-বৌ আবার নিজের গাছের ডালে ঘরের আঙিনায় এসে বসে রইল হা-পিত্যেশ করে। ময়না কোথায় গেল—কে জানে।

ময়না ফিরে এল অনেক রাত করে। ময়না-বৌ খ্যার খ্যার করে উঠল।

ময়না বললে, ‘থামো থামো। সে ভারি এক মজার গল্প—শুনতে শুনতে আটকা পড়ে গেছলাম। এমন কাণ্ড আর কেউ কখনও শোনেনি।’

ময়না-বৌ বললে, ‘ওমা, সে আবার কী!’

এই সময়ে কন্দর্পকেতু মকরন্দের কানে কানে বললে, ‘কথা বল না যেন বন্ধু—ময়নাব গল্প শোন।’

ময়না গল্প বলতে লাগল মযনা-বৌকে।

সে এক অপরূপ রাজ্য। রাজ্যেব নাম কুসুমপুর। শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদেব পর প্রাসাদ, কত খোদিত মূর্তির সারি, কত গড়-গোষ্ঠ কুসুমকুঞ্জ। এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, তীর ঘেঁসে ভুব্ ভুব করছে চন্দনের বন। তার রাজার নাম শৃঙ্গারশেখর। রাজ্যে তাঁব সুখশান্তির অবধি নেই। যেমন ন্যায়ধর্ম—তেমনি দেওয়া-থোওয়া। পদ্মের কলির মুখ বন্ধ হয—কিন্তু রাজার ধনভাণ্ডারের মুখ কখনও বন্ধ হয় না।

রাজার একটিমাত্র মেয়ে—নাম তাব বাসবদত্তা। তিন লোকের যত রূপ আর গুণ যেন তার পায়ের তলায় লুটোপুটি। রাজকুমারীকে প্রার্থনা করে কত দেশ-দেশান্তর থেকে ঘটক ভাট আসে—কিন্তু বাসবদত্তা সে সবে উদাসীন। রাজার মনে তাই দুঃখ। কোথায় কোন্ দেশ থেকে আসবে কোন্ রাজার কুমার—কে জানে। সাত-পাঁচ ভেবে রাজা শৃঙ্গারশেখর একদিন করলেন স্বয়ম্বর সভার আয়োজন। দূতের মুখে খবর পাঠিয়ে দিলেন চারদিকে।

দেশ-দেশান্তর থেকে সব রাজা-রাজড়া এসে জড়ো হতে লাগল কুসুমপুরে। রাজপথ মুখরিত হল হাতীর গলার ঘণ্টা আর কাম্বোজী ঘোড়ার খুরের শব্দে। যুদ্ধ নয়—তবু যেন এ এক যুদ্ধক্ষেত্র। কোনও রাজার ইয়া গালপাট্টা দাড়ি, কারুর বা প্যাঁচ দেওয়া গোঁফ—বালা বাজু মুকুটের মণিমুক্তায় কুসুমপুরের রাত যেন ঝলঝলে দিন। স্বয়ম্বরের দিন রাজারা সব যে যার ভালো ভালো বসন-ভূষণ পরে রাজা শৃঙ্গারশেখরের সভা আলো করে বসল। কারুর হস্তী সম্পদ, কারুর বা অশ্ব সম্পদ, কারুর বা মণিমুক্তার অবধি নেই। অশ্বের গরবে কেউ বসল ঘাড় বেঁকিয়ে—যেন তেজী আরবী ঘোড়া। হাতীর দেমাকে কেউ বসল শুঁড় পাকিয়ে—কেউ বা মণিমানিকে ছেয়ে। কটমট করে তাকাতে লাগল এ-ওর দিকে। দরকার পড়লেই যেন লাগিয়ে দেবে মল্লযুদ্ধ।

ওদিকে বেদীর ওপর এসে সেজে দাঁড়াল বাসবদত্তা। পাশে এক সখী—হাতে তার চুয়া চন্দনের কাঞ্চন-থালা। তারপর শুরু হল এক-এক রাজার পরিচয়। পরিচয় তো নয়, হাতী, ঘোড়া, মণিমানিক, বিষয়-সম্পদের লম্বা লম্বা ফর্দ। ধনদৌলতের কথা শুনে রাজকুমারীর চোখ ঝলে না—মন গলে না। সব রাজার পরিচয় দেওয়াও শেষ হল আর—বাসবদত্তাও ফিরে চলে গেল বরণের থালা নিয়ে।

রাজারা সব ফুঁসতে ফুঁসতে সভা ভঙ্গ করে চলে গেল।

সেইদিন রাতে রাজকন্যা দেখলে এক স্বপ্ন—সামনে যেন এসে দাঁড়াল, অচিন দেশের এক রাজকুমার। সে কোন্ স্বপ্নের দেশের রাজকুমার, কে জানে। স্বয়ম্বর সভায় তাকে দেখা যায় নি। রাজকন্যার কানে কানে কে যেন বলে দিলে—ও হল রাজা চিন্তামণির ছেলে কুমার কন্দর্পকেতু। তিন লোকের রূপ-গুণ ছেনে তৈরী সেই মূর্তি—রাজকুমারী বাসবদত্তা যেন তারই গলায় দিলে স্বয়ম্বর সভার বরণমালা। তারপর আস্তে আস্তে সে মূর্তি মিলিয়ে গেল কোথায়।

বাসবদত্তা ঘুম থেকে জেগে উঠে বসল। তবু যে দিকেই তাকায়—দেখে সেই কুমার কন্দর্পকেতুকে, সে মূর্তি যেন আকাশে আঁকা, আলোয় আঁকা—অন্ধকারে আঁকা। বাসবদত্তা তার স্বপ্নের সব কথা বললে সাধের শারী তমালিকাকে।

কিন্তু কোন্ দেশে থাকে সেই রাজকুমার! এত বড় স্বয়ম্বর সভা—দেশ-দেশান্তর থেকে এল দলে দলে কত রাজা, এল না শুধু সেই কন্দর্পকেতু। অথচ তারই গলায় রাজকুমারী দিয়ে বসল বরণের মালা! এখন কোথায় পাওয়া যাবে তাকে! তমালিকা ভাবতে বসল।

এদিকে রাজা শৃঙ্গারশেখর স্বয়ম্বর সভা ভেঙে যাওয়ার পর কন্যাদায়ের চিন্তায় অস্থির! কন্যাদায় বিষম দায়—রাজার ঘরেও নিস্তার নেই। তিনি বললেন, 'এখন কি উপায়!'

'কি উপায়' বলে তাড়াতাড়ি তিনি কন্যা-দায়ের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিদ্যাধরদেব বাজকুমার পুষ্পকেতুর সঙ্গে বিয়েব কথাবার্তা সব ঠিক করে ফেললেন। ঠিক হয়ে গেল শুভদিন শুভলগ্ন।

সে দিন যত ঘনিয়ে আসে—ভেবে মরে বাসবদত্তা, ভেবে মরে সখীবা। স্বপ্নের রাজকুমাবকে দেওয়া বরণমালা স্বপ্ন হয়েই বা থেকে গেল বুঝি।

এমন সময় ময়নাই কুমাব কন্দর্পকেতুব সন্ধান দিয়ে এই বিন্ধ্যাচলে টেনে এনেছে বাসবদত্তার পোযা সাধের শারী তমালিকাকে।

ময়না-বৌ শুধোলে, 'কিন্তু কোথায তোমার কুমার কন্দর্পকেতু?'

ময়না বললে, 'ওই তো পাশের গাছে বসে আছে তার বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে। আর শাবী তমালিকা বসে আছে তলার এক ডালে।'

ময়না আর ময়না-বৌয়ের কথা শুনে কুমার কন্দর্পকেতু অবাক। অবাক তার বন্ধু মকরন্দ। গাছ থেকে নেমে এসে সত্যি সত্যি দেখতে পেলে শারী তমালিকাকে।

কন্দর্পকেতু শুধোলে, 'কে সেই রাজার কন্যা? কেমন তাকে দেখতে?'

তমালিকা নিবেদন করে বললে, 'আমার রাজকন্যার বরণমালা দেওয়া সত্যি হোক কুমার, রাজকুমারী যেন সত্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়। আপনি চলুন তাড়াতাড়ি। ওদিকে বিদ্যাধরকুমার পুষ্পকেতু হয়তো এসে পড়বে। আমরা তাড়াতাড়ি না গেলে রাজকুমারী হয়তো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সত্য রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে।'

নানা কৌতূহলে কন্দর্পকেতু আর মকরন্দ চলল তমালিকার সঙ্গে সঙ্গে। সারাপথ ভাবতে ভাবতে চলল—কে সেই রাজকুমারী! এ কী তার সেই স্বপ্নে-দেখা কন্যা—কে জানে! চলতে চলতে রাত শেষ হল—দেখতে দেখতে দিনও শেষ হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে এল। শারী তমালিকা পথ দেখিয়ে উড়ে চলেছে তো চলেছেই। দিনের ধুলো মাখা ছেড়ে চড়ুইয়ের দল ফিরে এল গাছে, কাকেরা উড়ে গেল বাসায়, ঠাকু'মায়েদের গলায় গুন্‌গুন্ করে উঠল ঘুমপাড়ানী ছড়া, তপোবন মুখরিত হয়ে উঠল সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। তারপর ধীরে ধীরে লক্ষ তারার মেলায় আকাশে বসল পূর্ণ চাঁদের সভা।

এমন নিঝ্‌ঝুম রাতে কন্দর্পকেতু ও মকরন্দ এসে পৌঁছল কুসুমপুরের রাজপুরীতে। তমালিকা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কোথা দিয়ে ঘুরে ফিরে তারা চলেছে তমালিকার পেছনে পেছনে—সে যেন এক গভীর রহস্য। থম্ থম্ করছে নিশুতি রাজপুরী।

কত গলি-ঘুঁজি পার হয়ে, কত তোরণ স্তম্ভের সারি পার হয়ে, কত সুড়ঙ্গের নীচে নেমে—উপরে উঠে, শেষে একেবারে থমকে এসে দাঁড়াল তারা রাজকুমারী বাসবদত্তার সামনে। কন্দর্পকেতু অবাক

চোখে দেখলে—এ যে তার সেই স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যা! আর বাসবদত্তা দেখলে—এই সেই রাজার কুমার কন্দর্পকেতু।

এমন সময় বাসবদত্তার এক সখী কলাবতী ছুটে এসে বললে, 'রক্ষা কর রাজকুমার! ভোর হয়ে এল—আর দেরী নেই। বিদ্যাধরকুমার পুষ্পকেতু তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই রাজপুরীতেই আছেন। সকাল হলেই রাজা বাসবদত্তাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন।'

কন্দর্পকেতু বললে, 'ভয় নেই।'

তারপর রাজার ঘোড়া-শাল থেকে কন্দর্পকেতু বেছে নিয়ে এল এক পক্ষীরাজ। বাসবদত্তাকে তার ওপর তুলে দিয়ে কন্দর্পকেতু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে আবার সেই দুর্গম বিন্ধ্যারণ্যের দিকে। নিমেষে যোজন পার। দেখতে দেখতে কত গিরি নদী কান্তার পার হয়ে এল তারা। ভোর তখন হয়-হয়।

ওদিকে কুসুমপুরের রাজপুরীতে শানাই ধরেছে তখন ভৈরবীর তান। আর কুমার পুষ্পকেতু মানিকের আয়নায় মুখ দেখছেন নানান ছাঁদে।

গভীর বিন্ধ্যারণ্যের এক লতাকুঞ্জে এসে আশ্রয় নিলে কন্দর্পকেতু। এসেই শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে টলে পড়ল ঘুমে। ঘুম তো নয়—যেন বিধির অভিশাপ। ভোর হল, সূর্য উঠল—সারা বিন্ধ্যারণ্য জেগে উঠল পাখিদের কল-কাকলীতে, কিন্তু কুমার কন্দর্পকেতুর ঘুম যেন আর ভাঙে না।

বাসবদত্তা গেল ফলপাকুড়ের সন্ধানে। কাল সারা রাত খাওয়া নেই রাজকুমারের—ঘুমের মধ্যেও মুখ তার শুকিয়ে করুণ। ফলপাকুড় খুঁজতে খুঁজতে একটু দূরেই চলে গেল বাসবদত্তা।

এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল—বনের মধ্যে কিরাতদের ছোট ছোট কুঁড়ে। ওরই মধ্যে কিরাত-রাজের

ঘরটি ঝকমক করছে। একজন কিরাত-রক্ষী তাকে দেখতে পেয়ে ছুটল কিরাত-রাজকে খবর দিতে।

এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে এসে পড়ল আর এক দল নতুন কিরাত সেনা, পত্ পত্ করে উড়ছে তাদের নিশান। অশ্বের হ্রেষায় আর কাড়া-নাকাড়ার শব্দে গোটা বনভূমির যেন ঘুম ভেঙে গেল। ওদের চরও বাসবদত্তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেল ওদের সেনাপতিকে খবর দিতে। বাসবদত্তা ভাবলে—হয়তো তাকে খোঁজবার জন্য তার বাবা সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন।

ওদিকে রক্ষীর কাছে খবর পেয়ে কিরাত-রাজ তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটে এল বাসবদত্তাকে ধরবার জন্য। নতুন আগত কিরাত সৈন্য-সামন্তের মধ্যেও পড়ে গেল সাড়া—তারাও ছুটে এল বাসবদত্তাকে ধরবার জন্য। তারপর দেখতে দেখতে দুই দলে লেগে গেল ভীষণ লড়াই। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটতে লাগল শন্ শন্ করে। দু'পক্ষের তীরবৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে গেল বিন্ধ্যারণ্য। এখানে ওখানে জমতে লাগল সৈনিকদের মৃতদেহেব স্তূপ। রক্তের নদী বয়ে গেল অঝোর ধারায়। আকাশ কালো করে উড়ে এল বিন্ধ্যারণ্যের ভয়াল শকুনের ঝাঁক, বনের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল হিংস্র শ্বাপদেরা। প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালাতে লাগল হরিণেরা। বাসবদত্তাও ভয়ে ছুটে পালাল।

অল্প দূরেই ছিল এক ঋষির আশ্রম। বাসবদত্তা সেই আশ্রমে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধের কোলাহলে ধ্যান ভেঙে ঋষিও বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন কুটিরের বাইরে। এসেই দেখতে পেলেন বাসবদত্তাকে—ভয়ে সে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ঋষি বুঝতে পারলেন—এই বাসবদত্তার জন্যই বেধে গেছে লড়াই।

রাগে ঋষি হয়ে উঠলেন অগ্নিশর্মা। অভিশাপ দিলেন, 'তোর জন্যই আমার আশ্রমের শান্তি নষ্ট হয়েছে। যা—আজ থেকে তুই ওইখানেই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাক।'

ঋষির অভিশাপে বাসবদত্তার পায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে পাথর হয়ে আসতে লাগল। হায়, কোথায় রইল রাজরাজেশ্বর পিতা—কোথায় রইল কুমার কন্দর্পকেতু। বাসবদত্তা কেঁদে উঠল—'দয়া করো—দয়া করো ঋষি।'

ঋষির দিকে ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাসবদত্তা পাষাণ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল সেই ঋষির আশ্রম-প্রাঙ্গণে।

ওদিকে কুমার কন্দর্পকেতু তখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। বেলা অনেকখানি হয়েছে। কন্দর্পকেতু এদিক ওদিক চেয়ে ডাকল, 'বাসবদত্তা!'

কোথায় বাসবদত্তা—কোথায় কে। লতাকুঞ্জ শূন্য। বাসবদত্তা কোনও সাড়া দিলে না।

অবাক হয়ে কন্দর্পকেতু আশেপাশে বাসবদত্তাকে খুঁজতে লাগল। দিন গেল—রাত এল, বাসবদত্তার দেখা নেই। তারপর দিনের পর দিন গেল—কাছে থেকে দূরে গেল, সারা বনময় ঘুরে বেড়াতে লাগল কন্দর্পকেতু। রাজকুমারের পোশাক ছিঁড়ে হল ট্যানা, মুখ হল মলিন, মাথার চুলে ধরল জটা। কন্দর্পকেতু খুঁজছে তো খুঁজছেই। কখনও কখনও নাম ধরে ডাক পাড়ে—'বাসবদ-ত্তা-া।'···বিন্ধ্যাচলের গিরি-কন্দরে, অরণ্যের গভীর ছায়ায় ছায়ায় সে ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে, 'বাসবদ-ত্তা-া।'··· তরুলতা পশুপাখিকে ডেকে ডেকে শুধোয় কন্দর্পকেতু, 'তোমরা কি কেউ বাসবদত্তাকে দেখেছ?' তারা চেয়ে থাকে অবোধ চোখে।

পাগলের মত অরণ্য খুঁজে খুঁজে ফেরে কন্দর্পকেতু। সোজা দক্ষিণে যেতে যেতে একদিন শেষ হয়ে গেল বিন্ধ্যাটবীর অর্জুন-শাল-চন্দনের অরণ্য, বেতসের লতাকুঞ্জ। দেখতে পেলে সামনে গর্জন করছে উত্তাল সমুদ্র। কন্দর্পকেতু ছুটে গেল সেই দিকে—সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন করবে।

এমন সময় দৈববাণীর মত কে যেন বলে উঠল, 'কিছুদিন পরেই বাসবদত্তার তুমি দেখা পাবে।'



কন্দর্পকেতু থমকে দাঁড়াল। প্রাণ বিসর্জন করা আর হল না। কুমার কন্দর্পকেতু ফিরে চলল আবার সেই অরণ্যের দিকে। গাছের ফল-পাকুড় খেয়ে কোন রকমে প্রাণ-ধারণ করে রইল।—কবে আবার বাসবদত্তার দেখা পাবে, কে জানে! শীত গেল—গ্রীষ্ম গেল, বিন্ধ্যাটবী জুড়ে নামল ভয়ঙ্কর বর্ষা, ঢল নামল বিন্ধ্যাচল থেকে—মহাবর্ষার রাঙা জল। বিজবিজিয়ে উঠল পোকা-মাকড়, এদিক ওদিক লাফ দেয় সোনা ব্যাঙ, সবুজ ব্যাঙ। আর মাথার ওপরে

অঝোর ধারায় বর্ষা—গুরু গুরু মেঘের গর্জন আর বজ্রপাত। তারই মধ্য দিয়ে খ্যাপা উদাসীনের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কন্দর্পকেতু।

তারপর একদিন বর্ষার মেঘ কেটে দেখা দিল শরৎকাল। ফুটে উঠল যূথী মালতীর মুকুল, পাহাড় থেকে নেমে এল আবার চিত্রল হরিণের পাল, জাফরানের পরাগে মেঘমুক্ত আকাশ যেন হয়ে উঠল হলুদ বরণ। কন্দর্পকেতু ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে দাঁড়াল সেই ঋষির আশ্রমের প্রাঙ্গণে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাসবদত্তার পাথরের মূর্তির দিকে।

কুমার সেই দিকে ছুটে গেল পাগলের মত, 'বাসবদত্তা!'

হায়, এ যে পাষাণ! এ যে প্রাণহীন! এ যে কঠিন পাথরের বাসবদত্তা!

কিন্তু দেখতে দেখতে কুমারের হাতের ছোঁয়ায় সেই পাথরের মূর্তিতে ফিরে এল প্রাণ। অভিশাপমুক্ত হয়ে বাসবদত্তা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তাকাল কুমার কন্দর্পকেতুর দিকে।

কুমার শুধোলে, 'কেমন করে হল তোমার এমন অবস্থা?'

বাসবদত্তা বললে ঋষির অভিশাপের কাহিনী। তারপর বললে, 'দয়া করে ঋষি একদিন এই বরটুকু দিয়েছিলেন—কুমার এসে যেদিন তোমায় স্পর্শ করবে, সেই দিনই তুমি ফিরে পাবে প্রাণ।'

বহু দুঃখের শেষে বাসবদত্তাকে নিয়ে কুমার কন্দর্পকেতু আবার ফিরে চলল নিজের রাজ্যে।

॥ সুবন্ধু রচিত 'বাসবদত্তা' থেকে ॥



ভাই-বোন

কবি বাণভট্ট বলেছেন—শ্রীকণ্ঠ নামে এক দেশের কথা কেউ কি জান? তার কত প্রস্ফুটিত অজস্র স্থলপদ্মের বন! তার মধুকরের দল গুন্‌গুন্ ক'রে প্রচার করে সে দেশের মৃত্তিকার উর্বরতা।

আর আখের ক্ষেত—কি ঘন, কি অজস্র! এত মিষ্টি সে আখ, মনে হয় যেন মেঘেরা ক্ষীরোদসাগরের মিষ্টি দুধ খেয়ে জল ঢেলে দিয়ে গেছে আখের ক্ষেতগুলোতে।

আর যেদিকে তাকাও—দেখতে পাবে কৃষকের সমৃদ্ধি, গোলাবাড়িতে ঝাড়াই ধানের ছোট ছোট পাহাড়। সোনার বরণ শালিধান যেন অলঙ্কার পরিয়ে রেখেছে সারা দেশটিকে। তাব পতিত জমিতেও কি যে গমের ফসল! মাঝে মাঝে পাক ধবেছে সোনালী মুগ আর মাষকলাইয়ের গায়ে।

কোথাও ফুলের তোড়ার মত জাফরানের ক্ষেত, কোথাও দ্রাক্ষালতার কুঞ্জ। প্রাণভরে টাটকা আঙুরের রস খেয়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জের তলায় কোথাও বা ঘুমে ঘোর অচিন পথিকেরা। আর তেজস্বী কাম্বোজী ঘোড়াগুলো লুটোপুটি খেয়ে লাল হয়ে উঠছে জাফরানের ক্ষেতে।

সেই যে পবিত্র দেশ—সে দেশে অশান্তি নেই, আপদ নেই, অমঙ্গল নেই। সেই শ্রীকণ্ঠরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল থানেশ্বর নামে এক জনপদবিশেষ।

এই থানেশ্বরকে মুনিরা বলতেন—তপোবন। বিদ্যার্থীরা বলত গুরুকুল। শস্ত্রজীবীরা বলত বীরক্ষেত্র। গাইয়েরা বলত গন্ধর্বনগর। আর শত্রুদের কাছে ছিল সাক্ষাৎ যমপুরী।

এখানে রাজত্ব করতেন রাজা প্রভাকরবর্ধন।

প্রভাকরবর্ধনের দুই ছেলে—রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধন। যেন দুই শিশু সিংহ। আর এক মেয়ে রাজ্যশ্রী—তার রাঙা রাঙা গা, দুই চক্ষের রাঙা কোণা দিয়ে তৈরী যেন একটি সুন্দর পদ্মফুলেব কুঁড়ি। দুই ভাইয়ের সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগল পাকুল বোন রাজ্যশ্রী।

ভাইয়েরা বড় হয়ে শাস্ত্রে হল বিদ্বান—শস্ত্রে হল মস্ত বীর। আর মনে এল বুঝি বা পৃথিবীজয়ের আকাঙ্ক্ষা!

এমনি তেজে ও দীপ্তিতে বেড়ে উঠতে লাগল দুই কুমার। আর, রাজ্যশ্রী তো নয়—রাজ্যের শ্রী; নাচে—গানে—সর্ব কলাবিদ্যায় কলাবতী। ভাইয়েদের আদরের বোন।

একদিন সেই বোনের বিয়ে হয়ে গেল কান্যকুব্জের রাজকুমার গ্রহবর্মার সঙ্গে। যাওয়ার দিন বাপ-মায়ের চোখে জল, দুই ভাই দাঁড়িয়ে রইল করুণ চোখে।

এর পরে একদিন রাজা ডেকে পাঠালেন বড় ছেলে রাজ্যবর্ধনকে। বললেন, 'উত্তরাপথে হূনদের অত্যাচার বড় বেড়ে গেছে—যাও, শায়েস্তা করে এস।'

'সাজ-সাজ' রব পড়ে গেল রাজ্য জুড়ে। এই প্রথম বড় রাজকুমার যাবেন বিজয়-অভিযানে। জড়ো হল বীর মহাসামন্তেরা—তৈরী হল অপরিমিত সৈন্যবল। সকলের মধ্যে বীরপনার উল্লাস। মুখটি শুকনো শুধু হর্ষদেবের—এ অভিযানে বাবা তাঁকে পাঠালেন না। তবু রাজ্যবর্ধনের পেছনে পেছনে তুরঙ্গ সেনা নিয়ে গেলেন তিনি অনেক দূর পর্যন্ত—সেই কৈলাস গিরির পাদদেশে।

তুই ছেলেই যখন রাজধানীর বাইরে—তখন মহারাজ প্রভাকর-বর্ধনকে ধরল ভীষণ দাহজ্বর। দূতের মুখে খবর পেয়ে ছুটে এলেন হর্ষ, কিন্তু রাজ্যবর্ধন তখন অনেক দূরে। হূনদের জয় করে ফিরতে ফিরতে প্রভাকরবর্ধন মারা গেলেন, তুঃখে চিতায় প্রবেশ করলেন রানী যশোবতী। রাজ্যশ্রীও দূরে। রাজপুরীর মহাশ্মশানে একা শুধু হর্ষ।

বাপ-মা হারিয়ে গভীর শোকের মধ্যে বসে বসে হর্ষদেব শুধু ভাবতে লাগলেন ছোটবেলাকার তুটি নিত্যসঙ্গীর কথা—এক রাজ্যবর্ধন আর এক রাজ্যশ্রী।

কিছুদিনের মধ্যেই পিতৃ-শোকাতুর রাজ্যবর্ধন ফিরে এলেন তাঁর বিজয়-বাহিনী নিয়ে। হূনরা পরাজিত ও বিতাড়িত। রাজ্যবর্ধন অগ্রজ—এবার রাজা হওয়ার কথা তাঁরই। কিন্তু তিনি হর্ষদেবকে ডেকে বললেন, 'হর্ষ, গুরুজনেরা বরাবর তোমাকেই গুরুভার কাজে নিয়োগ করে এসেছেন—আজও তুমি সেই ভার গ্রহণ কর। গ্রহণ কর রাজ্যলক্ষ্মী। আমি—এই ত্যাগ করলুম আমার শস্ত্র।' বলে তিনি নিজের তরবারি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হর্ষদেব তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কিছুতেই ফেরাতে পারলেন না রাজ্যবর্ধনকে।

শেষ পর্যন্ত ভরতের মত জ্যেষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন হর্ষদেব। রাজ্যবর্ধন বল্কলচীর গ্রহণ করে সন্ন্যাস নিলেন। একদিন রাজ্যপাট পরিত্যাগ করে রাজ্যবর্ধন তপোবনের দিকে অগ্রসর হলেন। কান্নার রোল উঠল রাজপুরীতে—এ যেন দ্বিতীয় রামচন্দ্রের বনগমন। পেছনে মহা-অপরাধীর মত দীন মলিন বেশে অনুসরণ করে চললেন শ্রীহর্ষ।

এমন সময় দেখা গেল—সামনে ছুটে আসছে কে যেন! রাজ্যবর্ধন চিনলেন, হর্ষদেব চিনলেন—এ যে রাজ্যশ্রীর ভৃত্য সংবাদক। ছুটে এসে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রাজ্যবর্ধন শুধোলেন, হর্ষদেব শুধোলেন, 'বল—বল, রাজ্যশ্রী ভালো আছে তো?'

সংবাদক কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'মহারাজের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠেছে। দুরাত্মা মালবরাজ গ্রহবর্মাকে নিহত করে রাজ্য অধিকার করেছে। আর রানী রাজ্যশ্রীকে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে কান্যকুব্জের কারাগারে আটকে রেখেছে। আরও শুনেছি থানেশ্বর আক্রমণ করবার জন্য পাষণ্ড এগিয়ে আসছে।'

জ্বলে উঠল দুই ভাইয়ের ক্রোধ। আদরের বোন, রাজ্যশ্রীর এই অবস্থা!

রাজ্যবর্ধন দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'যতদিন না মালবরাজকে পরাজিত করতে পারি, ততদিন এই রইল বল্কল, রইল আমার তপস্যা, রইল আমার শোক। হরিণ এসে সিংহের কেশর ধরে টানবে! ব্যাঙ থাবড়া মারবে রাজগোখরোর ফণায়! সেনাপতি ভণ্ডিকে বলে দাও হর্ষ, অযুত অশ্বসৈন্য নিয়ে আমার অনুগমন করুক।'

হর্ষদেব অনুনয় করে বললেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

রাজ্যবর্ধন বললেন, 'একটা শশককে ধরবার জন্য যদি একপাল সিংহ দৌড়োয়, সেটা কি লজ্জার কথা নয়? তোমার যাওয়ার দরকার নেই হর্ষ। এই রাজকুল, রাজ্যক্ষেত্র, প্রজারা, পরিজনরা রইল তোমার আশ্রয়ে। এদের প্রতিপালন কর তুমি।'

আবার সেই গুরুজনের আদেশ! শ্রীহর্ষ মন-মরা হয়ে ফিরে এলেন। রাজ্যবর্ধন সেই দিনই যাত্রা করলেন শত্রু দমনে।

এদিকে হর্ষদেবের রাজ্যপাট নিয়ে দিন কাটে বড় দুঃখে। বাবা-মা নেই, বোন রাজ্যশ্রী বন্দিনী, দাদা বল্কলচীর রেখে গেছেন—শত্রু জয় করে ফিরে এসে, চলে যাবেন আবার তপোবনে। চারদিক

শুধু শূন্য দেখেন শ্রীহর্ষ। নানা দুশ্চিন্তায় দিনের পর দিন কেটে যায় তাঁর।

একদিন ভোর রাত্রিতে দেখলেন দুঃস্বপ্ন: আকাশ-ছোঁয়া একটা লৌহস্তম্ভ যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলেন শ্রীহর্ষ, মনে মনে বললেন—অবিশ্রাম আমায় কেন অনুসরণ কর দুঃস্বপ্ন!

সেদিন সকালে রাজসভায় শ্রীহর্ষ ভয়ানক মন খারাপ করে বসেছিলেন, এমন সময় ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে ঢুকল কুণ্ডল—রাজ্যবর্ধনের অন্তরঙ্গ অনুচর। তাকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল হর্ষদেবের বুক। কম্পিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'বল—তুমি একা এলে কেন?'

কুণ্ডল কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল—কেমন করে রাজ্যবর্ধন হেলায় জয় করেছিলেন মালবরাজকে। কিন্তু গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্ক মিথ্যা সৌজন্যে রাজ্যবর্ধনকে মোহিত করে ফেললে। তারপর তিনি যখন একদিন বিশ্রাম করছিলেন, তখন গৌড়াধিপ তাঁকে হত্যা করেছে।

হর্ষদেব জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজ্যশ্রীর খবর জান?'

কুণ্ডল বললে, 'জানি না।'

ক্রোধ তো নয়—আগুন জ্বলে উঠল হর্ষদেবের বুকে, চোখে, মনে। ঠোঁট কেঁপে উঠল থর থর করে, কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। সে প্রচণ্ড মূর্তি যেন দ্বাদশ সূর্যের আগুন।

হর্ষদেব বললেন, 'পাপাত্মা ভুলিয়েছিল আমার দেবপ্রতিম দাদাকে। এখন সে তার প্রতিশোধ পাবে। মেদিনীকে আমি যদি নির্গৌড় করতে না পারি—তা হলে অগ্নিতে আমি আত্মবিসর্জন করব।'

তারপর একজন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করব। পুবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, এ দেশে যত রাজা আছেন, তাঁদের লিখে জানিয়ে দাও—হয় তাঁরা আমায় কর দিন, না হয়

যুদ্ধ করুন। হয় দিক্‌জয়ী হোন—নয় গ্রহণ করুন চামর।' এই বলে হর্ষদেব রাজসভা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

তারপর শুরু হয়ে গেল রাজ্য জুড়ে দিগ্বিজয় যাত্রার প্রস্তুতি। সারি সারি এসে দাঁড়াল হাতী ঘোড়া পদাতিক। কোথাও জড়ো হতে লাগল রসদের স্তূপ। শ্রীহর্ষের দিগ্বিজয় যাত্রার কথা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল দেশ দেশান্তরে।

এ অভিযানের যখন শুভদিন শুনে দেখছেন বড় বড় আচার্য জ্যোতিষীরা, তখন দেশ দেশান্তরের রাজারা দেখছেন নানা অশুভ লক্ষণ। দেখছেন—মধুমক্ষিকার ঝাঁক উড়ে চলে যাচ্ছে গোল হয়ে। হায়রে—লক্ষ্মী ছেড়ে যাচ্ছে বুঝি। কি বিশ্রী চীৎকার করে ছুটে যাচ্ছে অগ্নিমুখী শেয়াল! ইস্, মালতী লতার মাথায় বসেছে কী বীভৎস এক শকুনী! এ কী, অকালে ফুল ফুটল কেন গাছে! পরিচারিকাদের হাত থেকে খসে পড়ছে কেন চামর! দূর্বাঘাস গজিয়ে উঠছে কেন মেঝেতে। তোরণের কাছে বসে কুকুর ডাকে কেন সারা রাত! সব যেন অন্তিম কালের লক্ষণ!

এদিকে হর্ষের জ্যোতিষীরা সূক্ষ্ম গণনা করে জানালেন—হর্ষদেব অষ্টাদশ দ্বীপ জয় করবেন।

শুভদিন শুভক্ষণ দেখে ঠিক হল যাত্রার মুহূর্ত।

তার আগেই এসে দাঁড়াল রাজ্যবর্ধনের অনুগামী সেনাপতি ভণ্ডি। মালবরাজকে পরাজিত করে ফিরে এসেছে সে—কিন্তু সঙ্গে নেই আজ রাজ্যবর্ধন। সে এসে দাঁড়াল মূর্তিমান শোকের মত। মাথাটি নত।

হর্ষদেবের চোখেও জল। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন রাজ্যশ্রীর খবর বল—কোথায় সে?'

ভণ্ডি বলল, 'কারাগার থেকে কোনরকমে পালিয়ে রাজ্যশ্রী তাঁর পরিজনদের নিয়ে সুদূর বিন্ধ্যাটবীর দিকে চলে গেছেন।

সেদিকে আমি অনেক অনুচর, গুপ্তচর পাঠিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের মধ্যে কেউ আজও ফেরেনি।'

বিন্ধ্যারণ্য বড় দুর্গম—অন্ধকার; হিংস্র শ্বাপদে ভরা। তার মধ্যে পথিক পথ হারিয়ে ফেলে। তার মধ্যে কোথায় গেছে রাজ্যশ্রী—আর কোথায় বা গেছে সেনাপতি ভণ্ডির চরেরা—কে জানে!

হর্ষদেব অবিচলিত গলায় ভণ্ডিকে বললেন, 'তুমি সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাও গৌড়-বিজয়ে। আমি চললাম বিন্ধ্যারণ্যের দিকে। রাজ্যশ্রী—কোথায় গেল রাজ্যশ্রী!'

কোথায় গেল রাজ্যশ্রী? সেই শৈশবের নিত্যসঙ্গী—আনন্দ-সুখের স্নেহমুগ্ধা বোন? বাবা-মা আজ নেই—নেই অগ্রজ ও বন্ধু রাজ্যবর্ধন। হর্ষদেবের শূন্য জীবনে আছে এখন শুধু এক শেষ স্নেহের বন্ধন—রাজ্যশ্রী। কিন্তু সে-ও হারিয়ে গেল কোথায়!

কিছু অনুচর নিয়ে হর্ষদেব এগিয়ে চললেন দুর্গম বিন্ধ্যাটবীর দিকে। পথে দেখেন গ্রামের পর গ্রাম। কোথাও হয়েছে দুর্ভিক্ষের সূচনা। কৃষাণরা পতিত জমির ওপরে কোদাল পাড়ছে, হালের বলদ নেই—পরিজনের ভরণপোষণের ভাবনায় তারা আকুল। কেউ বা ঝগড়া করছে শালিধানের খামার নিয়ে। গোয়ালে গরু নেই। বাছুরগুলোকে বেঁধে রেখেছে বাঘ-ধরা ফাঁদে. বাঘে মারলে তবে খাবে। বনরক্ষকেরা উৎকোচ না পেয়ে কেড়ে নিচ্ছে কাঠুরেদের কুঠার। পোকা ধরেছে শ্যামাক ধানের নবমঞ্জরীতে। সাপের উপদ্রব হয়েছে গ্রামে। ক্ষেতের ভেতর মাচা বেঁধে আছে রাত-জাগা কৃষকেরা। কোথাও গ্রীষ্মের দাবদাহ। বালিমাটির কলসীর গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে রোদে—কোথাও বা কলসীতে শেওলা ঢাকা, পানীয় জল ঠাণ্ডা করা হচ্ছে—তাতে ফেলে দিয়েছে পারুল ফুল, লাল চিনি আর কর্পূরের গুঁড়ো। কোথাও বা জলসত্র, কোথাও বা বড় বড় পানীয়শালা। কোনও গ্রামে বা সুভিক্ষ। তার কামারশালে উঠছে হাতুড়ি পেটার শব্দ। গ্রামের

মানুষ ভারে ভারে নিয়ে চলেছে নানা ফলপাকুড় খাদ্যসামগ্রী। বুড়ো বুড়ো গ্রাম-মণ্ডলেরা পথ আগলে আদায় করছে পথের মাশুল।

চলতে চলতে বিন্ধ্যাটবীর গভীর অরণ্য ক্রমশ এগিয়ে আসছে হর্ষদেবের সামনে। গ্রামের রূপও বদলে যাচ্ছে—হয়ে উঠছে বন্য। দেখছেন তিনি বন্যগ্রাম। ব্যাধেরা পশুপাখি ধরবার জন্য পেতে রেখেছে হাজার ফাঁদ। কিছু ব্যাধ ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের বাইরে—পশুর ভয় থেকে রক্ষা করছে তাদের গ্রাম, তাদের ক্ষেত। কেউ বা অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছে এরই মধ্যে—পিঠে ঝুলছে পাখির খাঁচা। তার মধ্যে আছে তিতির, হরিয়াল, বুনো মুরগী, বাজপাখি—এমনি কত! কোথাও বা চলেছে ধনুকধারী ব্যাধেরা, একহাতে ধনুক আর অন্য হাতে বাঁশি। বাঁশি বাজিয়ে হরিণ ভোলায় আর ধনুক দিয়ে শিকার করে।

হাঁটতে হাঁটতে এমনি কেটে গেল কয়েকটা দিন। তারপর শুরু হল গহন বিন্ধ্যাটবী। একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ঘন গাছের ছায়ায় দিনের আলোও মলিন। তার মধ্যে হর্ষদেব খুঁজে খুঁজে ফেরেন রাজ্যশ্রীকে। কোথায় রাজ্যশ্রী? বিন্ধ্যারণ্য যেন চঞ্চল হয়ে উঠল রাজ্যশ্রীর সন্ধানে।

একদিন এই অরণ্যভূমির সামন্ত-রাজপুত্র ব্যাঘ্রকেতুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হর্ষদেবের। ব্যাঘ্রকেতুর সঙ্গে আছে তার কয়েকজন অনুচর। হর্ষদেব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো এ অরণ্যের সবকিছু জান। কোনও রূপবতী কন্যা কি চোখে পড়েছে তোমার?'

ব্যাঘ্রকেতুর অনুচর নির্ঘাত বললে, 'এমন তো কারুকে দেখিনি। তবে দিবাকর মিত্র নামে এখানে একজন ভিক্ষু সন্ন্যাসী আশ্রম করে আছেন—তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

তাঁর কথা শুনে হর্ষদেবের মনে পড়ল, গ্রহবর্মার ছেলেবেলাকার এক বন্ধুর নাম ছিল দিবাকর মিত্র, অল্প বয়সে সে ভিক্ষু

হয়ে ঘর ছেড়েছে। কে জানে, রাজ্যশ্রী হয়তো তার স্বামীর সেই বন্ধুর আশ্রয়েই গিয়ে থাকবে।

ব্যাঘ্রকেতুর একজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে হর্ষদেব ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন দিবাকরের আশ্রমের দিকে।

কিন্তু দিবাকরেব আশ্রমে গিয়ে দেখেন—কোথায় রাজ্যশ্রী!

হর্ষদেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ইষ্টবন্ধুজন সবাই মারা গেছে—ছিল মাত্র একটি বোন। সে এই বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে শুনে তাকে আমি খুঁজছি। তার কোনও খবর কি আপনি পেয়েছেন?'

দিবাকর বললেন, 'এমন কোনও খবর তো পাইনি।'

হর্ষদেব হতাশ হয়ে বসে পড়লেন আশ্রমের আঙিনায়।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল একজন মধ্যবয়সী ভিক্ষু। দিবাকর মিত্রকে বললে, "ভদন্ত, রক্ষা করুন! একটি মেয়ে শোকে দুঃখে অধীর হয়ে আগুনে পুড়ে মরতে যাচ্ছেন। মনে হয়—কোনও দিন রূপবতী ছিলেন এই কন্যা'—

কেঁপে উঠল শ্রীহর্ষের বুক। অধীর আগ্রহে বললেন, 'কোথায় সেই কন্যা? কোথায়—কেমন ভাবে দেখলেন তাকে?'

ভিক্ষু বললেন, 'সকালে প্রভাত-বন্দনা সেরে আমি যাচ্ছিলাম গিরিনদীর তীরে তীরে। হঠাৎ এক বন্য লতার কুঞ্জে শুনতে পেলাম কান্নার রোল। গিয়ে দেখলাম কতকগুলি মেয়েকে। তাদের দুর্দশা বলে শেষ করা যায় না। পাথরে হোঁচট খেয়ে কারুর আঙুল কেটে রক্ত ঝরছে, কারুর গোড়ালিতে শর ফুটে ফুলে উঠেছে—যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কারুর বা পায়ে শোথ—ফুলে উঠেছে সারা পা। বনের কাঁটা গাছে বহুমূল্য বসন ছিঁড়ে কুটি কুটি। এদের মধ্যে দেখতে পেলাম এক রমণী-লক্ষ্মীকে। তিনি বসে আছেন স্থির হয়ে। তিনিই আগুনে পুড়ে মরবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন। অন্য মেয়েরা তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদছেন।'

শ্রীহর্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন সেখানে। নিশ্চয়ই সে রাজ্যশ্রী। জানিনে—এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কি না।'

ভিক্ষু পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হর্ষদেবকে। হর্ষদেব ছুটলেন তাঁর পেছনে পেছনে।

সেই লতাকুঞ্জের কাছাকাছি এসে শোনা গেল কান্নার শব্দ আর নানা কণ্ঠের কাতরোক্তি! কোনও নারী যেন চীৎকার করে বললে, 'হে বায়ু, তুমি আমার ভাই। এই দেবীদাহের খবর ঝড়ের বেগে নিয়ে যাও তুমি শ্রীহর্ষের কাছে।'

কেউবা করুণ কণ্ঠে বলছে, 'হে অরণ্যভূমি, হর্ষদেবকে বল আমাদের কথা।'

ওদিকে রাজ্যশ্রী তখন চিতায় আত্মবিসর্জনের জন্য তৈরী হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গিনীরা তাঁর—তাঁকে একা যেতে দেবে না। তাই তারাও তৈরী হয়েছে মরবার জন্য। কেউ তৈরী করেছে লতার ফাঁস, কেউ প্রস্তুত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য!

রাজ্যশ্রী তাদের বললেন, 'কাঁদিস কেন—এবার তো দূরের যাত্রা। আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা। ফুল নিয়ে আয়—কুরুবকের কুঁড়ি দিয়ে চিতা সাজিয়ে দে। শেষ আলিঙ্গন দে তোরা—সব দোষ আমার ভুলে যাস। আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছিস তোরা।'

সখীদের কান্নার রোল উঠল। চিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন রাজ্যশ্রী।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুনের শিখা। সেই আগুনের শিখা ও ধোঁয়া দেখে পাগলের মত ছুটলেন শ্রীহর্ষ। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আগের মুহূর্তে গিয়ে ধরে ফেললেন রাজ্যশ্রীর হাত। বুকভাঙা ডাক বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ থেকে—'রাজ্যশ্রী!'

সেই হাতের স্পর্শ, স্নেহ কণ্ঠের ডাক!—রাজ্যশ্রী মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। সেই মূর্ছার মধ্যেও তাঁর মনে হল—তিনি কি স্বপ্ন

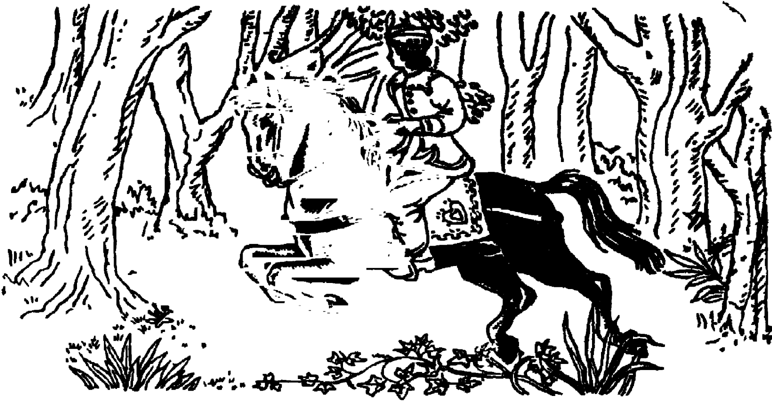
দেখছেন? নইলে মৃত্যুর মুহূর্তে কোথা থেকে এল সেই অমৃতের মত হাতের স্পর্শ, কোথা থেকে শুনলেন সেই চিরনির্ভর কণ্ঠস্বর!

হর্ষদেব আবার ডাকলেন আস্তে আস্তে—'রাজ্যশ্রী!'



ধীরে ধীরে মূর্ছা ভেঙে তাকালেন রাজ্যশ্রী। দেখতে পেলেন বহু দুঃখ, বহু শোকের পরে—শান্তির আধার তাঁর চিরনমস্য—চির করুণার বিগ্রহ—স্নেহের মূর্ত প্রতীক অগ্রজ শ্রীহর্ষকে।

॥ বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' থেকে ॥



রাজবাহনের পাতাল অভিযান

সে অনেককাল আগেকার কথা। মগধ দেশে পুষ্পপুরী নামে এক নগর ছিল। একদা সেই পুষ্পপুরীর রাজকুমার রাজবাহন মন্ত্রিপুত্রদের সঙ্গে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলেন।

তাঁরা নানা দেশ পার হয়ে এসে ঢুকলেন বিন্ধ্যারণ্যে। এই অরণ্যের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা বনবাসী একটি অদ্ভুত লোককে দেখতে পেলেন। দেখতে তাকে ব্যাধের মত—খুব শক্ত জোয়ান চেহারা, শরীরের পেশীগুলি খুব কঠিন। গায়ের রং খুব কালো। শরীরে তার অনেক অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। কিন্তু গলায় ব্রাহ্মণের মত একটা পৈতা।

রাজকুমার রাজবাহন অবাক হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? এই ঘোর বিন্ধ্যারণ্যে তুমি একা আছ কেন? গলায় তোমার পৈতা—দেখে মনে হচ্ছে তুমি ব্রাহ্মণ। আবার গায়ে তোমার শিকারী ব্যাধের মত অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন!'

লোকটি রাজবাহনকে খুব খাতির যত্ন করে বসাল। তারপর বললে, 'এই বনে কিছু ব্রাহ্মণ আছে—যারা ব্রাহ্মণের মত ধ্যান সংযম তপস্যা কিছুই করে না। ম্লেচ্ছদের মত তাদের ব্যবহার। তারা লুটপাট করে, খুন করে, কোনও পাপে তাদের ভয় নেই। আমি সেই বংশেরই একজন। আমার নাম মাতঙ্গ।'

রাজবাহন বললেন, 'তোমার আত্মীয়রা কোথায় ? তুমি দেখি একা আছ !'

'সে অনেক কথা।' বলে মাতঙ্গ একটু চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের জীবন-কথা বলতে লাগল।

বললে, 'আমিও আমার হিংস্র আত্মীয়দের মত গ্রামের পয়সাওয়ালা লোকজনদের ধরে এনে এই বনে আটকে রাখতাম, তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতাম। এমনি ভাবেই আমার দিন কেটে যাচ্ছিল—তারপর ঘটে গেল একদিন এক কাণ্ড।'

রাজবাহন উৎসুক হয়ে বললেন, 'কি হল ?'

মাতঙ্গ বললে, 'এই বনের ভেতর দিয়ে একদিন এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন। আমার আত্মীয়বন্ধুরা তাঁকে দেখে মার-মার কবে তেড়ে গেল। আমার হঠাৎ মনে হল—সঙ্গিহীন এ গরীব ব্রাহ্মণকে মেরে কোনও লাভ নেই। তাই আমি সকলকে ডেকে বললাম—খবরদার, কেউ বামুনের গায়ে হাত দেবে না। ব্যস—সবাই আমার ওপর ক্ষেপে উঠল। কেউ কেউ ব্রাহ্মণের দিকেও তেড়ে গেল। আমি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে আমার ঘোরতর লড়াই বেধে গেল। তারা তীর ছুঁড়তে লাগল—আমিও তীর ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু আমি একা। তবু তারা হেরে পালাতে লাগল। আমার সর্বাঙ্গে তখন তীর বিঁধে আছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। পড়ে গেলাম।'

রাজবাহন দম বন্ধ করে শুনছিলেন। বললেন, 'তারপর ?'

মাতঙ্গ বললে, 'তারপর আমি মরে গেলাম।'

রাজবাহন বললেন, 'সর্বনাশ! তা হলে তুমি আবার বাঁচলে কি করে ?'

মাতঙ্গ বললে, 'মরার পর যমপুরে গিয়ে দেখতে পেলাম যমের বিচার-সভা। চারদিকে ঘিরে আছে মস্ত মস্ত যমদূত। যমরাজার এক পাশে চিত্রগুপ্ত বসে আছেন খাতা খুলে। সে খাতায় লেখা

আছে সকলের পাপ পুণ্যের কথা। আমি যমকে গিয়ে প্রণাম করলাম।··

'আমাকে দেখে যম তাঁর মন্ত্রী চিত্রগুপ্তকে বললেন—দেখ দেখি মন্ত্রী, তোমার খাতায় ওর পাপ-পুণ্য কি লেখা আছে ?···

'চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—পাপ, শুধু পাপ। এ ঘোর পাপী।··

'যম হেসে বললেন—ঠিক। তবে ও আজ এক গরীব ব্রাহ্মণের জন্য অকালে প্রাণ দান করে এসেছে। আজ থেকে ওর পুণ্যকর্মে মতি হবে। ওকে একবার নরকের অত্যাচারগুলো দেখিয়ে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও।···

'যমের আদেশে চিত্রগুপ্ত আমাকে নরকের অত্যাচার দেখাতে নিয়ে গেল। কোথাও দেখলাম—কড়াইভরা ফুটন্ত তেলের মধ্যে পড়ে কতগুলো লোক ভাজা হচ্ছে, কোথাও কতগুলো লোককে পাথরকাটা বাটালি দিয়ে কাটা হচ্ছে, কোথাও কাকে ডাণ্ডা পিটানো হচ্ছে। চিত্রগুপ্ত আমাকে এই সব দেখিয়ে শেষকালে পৃথিবীর পথে ছেড়ে দিয়ে গেল।'

রাজবাহন বললেন, 'তারপর ?'

মাতঙ্গ বললে, 'তারপর পৃথিবীতে এসে প্রাণ পেয়ে আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম—যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি প্রাণ দিয়েছিলাম সেই ব্রাহ্মণ তখনও আমাকে সেবা শুশ্রূষা করছেন। যাই হোক, ব্রাহ্মণের সেবায় এবং আমার কয়েকটি বন্ধুর চেষ্টায় আমার গায়ের ঘাগুলো শুকিয়ে এল। আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। তখন ব্রাহ্মণ আমাকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন। সব শিক্ষা যখন শেষ হল তখন তিনি আমাকে শিবপূজোর একটি মন্ত্র দিয়ে কোথায় চলে গেলেন।'

রাজবাহন বললেন, 'তারপর ?'

মাতঙ্গ বললে, 'সেদিন থেকে আমি আমার পাপাচারী আত্মীয়-বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে একা-একাই আছি। তা রাজকুমার, আপনি যখন এসেইছেন—তখন আপনাকে গোপনীয় কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

তখন রাজবাহন ও মাতঙ্গ লোকজনের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেল।

রাজবাহন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলতে চাও ?

মাতঙ্গ বললে, 'রাজকুমার, কাল রাত্রে শিব আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন—মাতঙ্গ, দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়ে একটি নদী চলে গেছে। ওই নদীর তীরে স্ফটিকের একটি শিবমূর্তি আছে। তার পেছনে পার্বতীর পায়ের ছাপ আঁকা একটা পাথর আছে। ওই পাথরের তলায় মস্ত বড় একটা গর্ত আছে। ওই গর্তে ঢুকলেই একটা পেতলের পাত পাবে—তাতে কতগুলো আদেশ-নির্দেশ লেখা আছে। সেই আদেশ-নির্দেশ মত কাজ করলে তুমি পাতালের রাজা হবে। শিব আরও বললেন—আজ অথবা কাল একজন রাজকুমার আসবেন, তিনি তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।' এই বলে মাতঙ্গ রাজকুমারের দিকে চেয়ে রইল।

রাজবাহন বললেন, 'তা আমাকে কি করতে হবে ?'

মাতঙ্গ বললে, 'আমাকে সাহায্য করুন। আজ রাত দুপুরের সময় আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন।—'

রাজকুমার বললেন, 'আচ্ছা—আমি ঠিক আসব।'

রাত দুপুর হল। রাজকুমারের সাঙ্গোপাঙ্গ লোকলস্কর তখন ঘুমে ঘোর। ঘুম নেই শুধু রাজকুমার রাজবাহনের চোখে। রাত দুপুরের সময় রাজকুমার নিজের দল ছেড়ে চললেন মাতঙ্গের কাছে। কিছু দূরেই মাতঙ্গ অপেক্ষা করছিল। রাজকুমার আসতেই মাতঙ্গ তাঁকে নিয়ে আর এক গভীর বনে গিয়ে ঢুকল।

এদিকে সকাল বেলা রাজকুমারের বন্ধুরা দেখল—রাজকুমার নেই। কোথায় গেল রাজকুমার? তারা চারিদিকে লোকলস্কর পাঠিয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিলে।

বীরকুমার রাজবাহন তখন চলেছেন মাতঙ্গের সঙ্গে। দণ্ডকারণ্যের সেই নদীটি তারা খুঁজে বার করল—তারপর দেখতে পেল সেই শিবমূর্তি। মাতঙ্গের স্বপ্নের সঙ্গে সব মিলে গেল। শিবমূর্তির পেছনে দেখতে পেল পার্বতীর পায়ের দাগ-আঁকা পাথর। দু'জনে ধরাধরি করে সেই পাথরটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গের মুখ। সুড়ঙ্গে ওরা ঢুকে পড়ল। সামনেই দেখতে পেল সেই তামার পাত—আদেশ-নির্দেশ লেখা পাতাল রাজ্যের অগাধ ধনরত্নের নিশানা।

মাতঙ্গ আর রাজবাহনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই তামার পাতখানি হাতে নিয়ে ওরা সুড়ঙ্গ দিয়ে এগিয়ে চলল। আগে আগে চললেন কুমার রাজবাহন—হাতে খাপ খোলা তলোয়ার। কিছুদূর এসে পেয়ে গেল তারা পাতাল রাজ্যের সন্ধান।

মস্ত বড় নগর কিন্তু নীরব নির্জন। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। বড় বড় ঘর—কত তার ধনরত্ন মণিমানিক, কিন্তু কেউ নেই তাকে ভোগ করার।

কিছুদূর এসে তারা দেখতে পেল একটা মনোরম সরোবর। তাতে ফুটে আছে রাশি রাশি পদ্মফুল। সরোবরের জল যেন আর দেখা যায় না! ফুলের হাসিতে সব ছেয়ে গেছে!

সেই সরোবরের তীরে রাজবাহন হোমের আয়োজন করলেন যাতে মাতঙ্গের সব পাপ সব বাধা দূর হয়ে যায়। হোমের আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। মাতঙ্গ সরোবরে স্নান করে এসে শুদ্ধ

পবিত্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনের ভেতরে। রাজবাহন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। মাতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেল না—বরং বেরিয়ে এল আগুনের ভেতর থেকে অপূর্ব দেহকান্তি নিয়ে। কোথায় গেল তার কালো রং, কোথায় গেল তার দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আর কোথায় গেল তার ব্যাধের মত কর্কশ কদাকার চেহারা। সে যেন কোন দেশের সুন্দর এক রাজকুমার!



হোমের আগুন দেখে নীরব নির্জন সেই পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে এল অপরূপ সুন্দরী এক রাজকুমারী—সঙ্গে অনেক তার

সখী। রাজকুমারী এগিয়ে এসে মাতঙ্গকে একটি অপরূপ রত্ন উপহার দিলে।

মাতঙ্গ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

রাজকুমারী বললে, 'আমি পাতালপুরীর অসুররাজের কন্যা। আমার নাম কালিন্দী।'

মাতঙ্গ বললে, 'তুমি কি চাও?'

রাজকুমারী কালিন্দী বললে, 'আমার বাবা ছিলেন খুব প্রতাপশালী। স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে তিনি সমস্ত দেবতাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। শেষকালে বিষ্ণুর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আমি যখন খুব কান্নাকাটি করছিলাম তখন এক তপস্বী আমায় সান্ত্বনা দিয়ে এই বর দিয়েছিলেন যে, একদিন সুন্দরকান্তি একজন মানুষ এসে তোমাকে বিয়ে করবেন এবং এই পাতাল রাজ্য তিনিই শাসন করবেন।'

রাজবাহন রাজকন্যাকে বললেন, 'সেই সুন্দরকান্তি মানুষ এই মাতঙ্গ। ইনিই তোমার স্বামী।' তারপর রাজকুমার রাজবাহন কালিন্দী আর মাতঙ্গের বিয়ের আয়োজন করলেন। কালিন্দীকে সাজাতে বসল সখীরা। সাজানো হল পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদ—মণিমানিকের আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক।

উৎসব আনন্দে কেটে গেল কয়েকদিন। তারপর রাজবাহনের মনে পড়ল বন্ধুদের কথা—যাদের তিনি বিন্ধ্যারণ্যে ছেড়ে এসেছেন। তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তাই একদিন তিনি আবার পৃথিবীর পথ ধরলেন। তাঁকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য মাতঙ্গ চলল সঙ্গে সঙ্গে। সেই সুড়ঙ্গের মুখে এসে মাতঙ্গ রাজকুমারকে বিদায় দিল। যাওয়ার সময়ে মাতঙ্গ রাজবাহনকে উপহার দিল রাজকুমারী কালিন্দীর দেওয়া সেই অপূর্ব রত্নখানি।

মাতঙ্গ বললে, 'কালিন্দীর মুখে শুনেছি—অপূর্ব এ রত্নের গুণ। এটি সঙ্গে থাকলে মানুষের আর খিদেও পায় না, তেষ্টাও পায় না। আপনি অনেক দূর যাবেন—এই রত্নটি গ্রহণ করুন। আপনার ঋণে চিরকাল বাঁধা রইলাম।'

রাজবাহন একটু হেসে তাকে বিদায় জানিয়ে সেই রত্ন নিয়ে হাঁটতে লাগলেন আবার সেই সুদূর বিন্ধ্যারণ্যের দিকে—যেখানে তিনি তাঁর বন্ধুদের ছেড়ে এসেছেন।

॥ 'দশকুমার-চরিত' থেকে ॥





সত্যরক্ষা

সে অনেক দিন আগের কথা—তখন ভূরিবসু এবং দেবরাত ছিলেন দুটি সহাধ্যায়ী—দু'জনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব। বৌদ্ধ তাপসী কামন্দকীর সঙ্গে দু'জনে শিক্ষালাভ করতেন। সেই সময়ে দু'জন শপথ করেছিলেন, তাদের এ বন্ধুত্ব যেন কোনদিন না ভাঙে। দু'জনের ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে এ বন্ধুত্ব তাঁরা চিরকাল অটুট রাখবেন।

তারপর দু'জনেই হলেন জীবনে কীর্তিমান। দেবরাত হলেন বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী, আর ভূরিবসু হলেন পদ্মাবতী নগরের রাজমন্ত্রী। দেবরাতের ছেলের নাম মাধব আর ভূরিবসুর মেয়ের নাম মালতী। যাই হোক, রাজমন্ত্রী হয়ে ছেলেবেলার শপথের কথা কেউ ভুললেন না। বৌদ্ধ তাপসী কামন্দকীও জানতেন দু'জনের এই শপথের কথা।

ভগবতী কামন্দকী থাকতেন পদ্মাবতী নগরে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সামান্য ভিক্ষান্নে জীবন নির্বাহ করেন—আর বাকী সময় কাটে তাঁর শিক্ষা উপদেশে। অনেক এঁর শিষ্য-শিষ্যা—রাজা থেকে রাজমন্ত্রী। নগরে থাকতেন অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে। সেকালে এঁদের প্রতিপত্তি ছিল কম না। থাকতেন বটে সামান্য চীরবস্ত্র নিয়ে, কিন্তু ক্ষুদে কুঁড়ে থেকে রাজপ্রাসাদ—সর্বত্র ছিল অবাধ গতি, সর্বত্র এঁদের অশেষ প্রতিপত্তি। কেউ কেউ আবার তন্ত্রেমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে উড়ে চলে যেতে পারতেন আকাশে—এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে।

বিদর্ভ-মন্ত্রী দেবরাত তাঁর ছেলে মাধবকে পাঠিয়ে দিলেন ভগবতী কামন্দকীর কাছে—শিক্ষা উপদেশ লাভের জন্য। মাধবও পদ্মাবতী নগরে এসে শিক্ষায় দীক্ষায়, শস্ত্রে শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল।

এদিকে মন্ত্রিকন্যা মালতীও নানা কলাশাস্ত্রে হয়ে উঠল অদ্বিতীয়া। নাচ, গান, ছবি আঁকা—অমনটি এ রাজ্যে আর কেউ পারে না। গুণে গুণবতী, রূপে রূপবতী—তার কথা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। সে কথা উঠল গিয়ে রাজার বন্ধু অমাত্যদের কানে।

এক অমাত্য—নাম তার নন্দন ; রাজার ভারি বন্ধু। একদিন রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন মন্ত্রী-কন্যা মালতীকে। রাজা শুনে আনন্দে আশীখানা। বললেন, 'আচ্ছা—আমি মালতীর বাবা ভূরিবসুকে বলব।'

রাজার বলার আগেই কথাটা কাকপক্ষীর মুখে কোন রকমে শুনতে পেয়ে ভূরিবসু ছুটলেন ভগবতী কামন্দকীর কাছে। গিয়ে বললেন, 'মহাবিপদ, আমাকে রক্ষা করুন।'

ভগবতী কামন্দকী বললেন, 'কি ব্যাপার !'

মন্ত্রী ভূরিবসু বললেন, 'ছেলেবেলায় দেবরাতের কাছে আমার শপথের কথা আপনি জানেন।'

কামন্দকী বললেন, 'জানি। আর মাধবও তো এখানে আছে। এখন শুভদিন শুভক্ষণ দেখে ওদের বিয়ে দাও।'

ভূরিবসু বললেন, 'সে ভার আপনার ওপর দিলাম। অমাত্য নন্দন রাজার কাছে মালতীকে প্রার্থনা করেছে। এখন যদি আমার শপথ রক্ষা করতে যাই, তা হলে আমার ওপর এসে পড়বে রাজার কোপ। এ অবস্থায় আপনি যা হয় করুন।'

কামন্দকী বললেন, 'তথাস্তু। তোমাদের শপথ ভঙ্গ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি।'

মালতী আর মাধব—দু'জনেই ভগবতী কামন্দকীর নয়ন-পুত্তলি, স্নেহের আধার। রূপে গুণে দুটিই অতুল। ওদের মাঝখানে রাজার বন্ধু নন্দন এসে পড়ল—যেন বিধির অভিশাপ!

ভগবতী কামন্দকী ডাক দিলেন তাঁর শিষ্যাদের। বললেন, 'মালতী কোথায়? মাধব কোথায়?'

তাঁরা বললেন, 'রাজার বাগানে আজ বসন্তোৎসব—সেইখানে, জড়ো হয়েছে আজ সবাই। নিশ্চয়ই তারাও গেছে।'

বসন্তোৎসবের দিন—রাজ্যের নরনারী আজ আনন্দ উৎসবে মত্ত। ফুলের বনে ফুলের উৎসব—রাজ্য জুড়ে উড়ছে রাঙা ধুলোর ঝড়—আবির আর কুম্‌কুম্‌। প্রীতি ও বন্ধুত্বে আজ গা ভাসিয়ে দিয়েছে নগরের নরনারী। শানাই তান ধরেছে রাজার নহবৎখানায়। চারদিকে আনন্দ—চারদিকে হাসির হর্‌রা। সেই আনন্দে নেচে উঠছে রাজার হাতীশালের হাতী—তাদের গলার ঘণ্টাগুলো দুলে দুলে বাজছে—ঢং ঢং—ঢং ঢং। চারদিকে এত আনন্দের মধ্যে শুধু মাধব ও মালতীর ভাগ্য যেন বুনছে দুঃখের ষড়যন্ত্র-জাল।

রাজা সেদিন মন্ত্রী ভূরিবসুকে ডেকে বললেন, 'অমাত্য নন্দনের জন্য চাই তোমার কন্যাকে।'

ভূরিবসু আর কি বলবেন! রাজার আদেশ! কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু।'

দেখতে দেখতে রটে গেল কথা। সবাই 'ছি ছি' করে গাল দিলে বুড়ো নন্দনকে আর নিন্দে করতে লাগল রাজার। কামন্দকী ছুটলেন মালতীর বাড়ি। গিয়ে শুনবেন আর কি, শুনলেন—মনের দুঃখে মালতী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

তাপসী কামন্দকীর চোখেও জল এল। সোনার বরণ কন্যা যেন শুয়ে আছে ঝরা ফুলের মত। সখীরা কেউ বাতাস করছে

জলে ভেজানো ঠাণ্ডা কলাপাতায়, কেউ দিচ্ছে সুগন্ধি জলের ঝাপটা। কামন্দকী গিয়ে তার শিয়রে বসলেন। কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল মালতীর। জ্ঞান ফিরেই বুঝি চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার বুড়ো নন্দনের মুখটা—ইয়া গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা দাড়ি। ভয়ে মালতী চোখ বুজল।

কামন্দকী তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'তোমায় কোনও ভয় নেই। তোমার বাবা খুব বুদ্ধিমানের মত কথাটি বলেছেন—বুঝে দেখ। তিনি বলেছেন—'মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু।' এর এক মানে হল—'মহারাজ, মালতী আপনার নিজের কন্যার মত, আপনিই তার প্রভু।' আর একটি মানে হল—'মহারাজ, আপনি নিজের কন্যারই প্রভু—অন্যের নয়।' যাই হোক, ভূরিবসু এমন একটি কথা বলেছেন—যাতে রাজাকে স্পষ্ট করে কোনও কথা দেওয়া হয় নি। তুমি শান্ত হও।'

কিন্তু মন্ত্রী-কন্যার মনের ভয় তবু গেল না। সারা বাড়ি ভরে এখানে ঘোরে, ওখানে ঘোরে—মুখে হাসি নেই, চোখে দ্যুতি নেই।

এদিকে কামন্দকী এসে খোঁজ করতে পাঠালেন মাধবের। একজন শিষ্যা এসে খবর দিলে, 'সে অমাত্য নন্দনের বিয়ের খবর শুনে উদাসীনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্মশানে শ্মশানে। তাকে কিছুতেই ফেরান গেল না।'

মাধব তখন মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্মশানে। বেশবাস ছিন্ন মলিন, মাথায় রাখতে শুরু করেছে জটা।

হা-হুতাশ করতে লাগল রাজ্যের লোক—আর গাল পাড়তে লাগল বুড়ো নন্দনকে, 'রাজার বন্ধু সেই কুচ্ছিত বুড়ো মরুক।' মালতী-মাধবের জন্য রাজ্যের লোকের দুঃখের শেষ নেই। ঘরে বাইরে দুঃখ, মনে বনে দুঃখ। দুঃখ সর্বত্র।

আনন্দ শুধু নন্দনের ঘরে। ঠিক হয়ে গেল বিয়ের শুভদিন শুভক্ষণ। এল কনের আভরণ—বরের আভরণ। ঘরের সামনে বসল মঙ্গল কলস।

দিন যত ঘনিয়ে আসে, মালতী তত মুষড়ে পড়ে—দিনে দিনে ক্ষীণ হতে থাকে যেন আকাশের চাঁদ!

তারপর একদিন বেজে উঠল সানাই ভোরের গগন ভরে।

ঠিক সেইদিন পদ্মাবতী রাজ্যে আকাশপথে এসে পৌঁছল এক কাপালিক—নাম তার অঘোর-ঘণ্টা; যেমন নাম—তেমন বিভীষিকা। লক্ষ্য তার নরবলি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করা। সঙ্গে এল তার এক শিষ্যা—নাম কপালকুণ্ডলা। দু'জনে এসে নামল পদ্মাবতী রাজ্যের একধারে করালা দেবীর মন্দিরে। নরবলি পেলে দেবী ভারী খুশী। তাই অঘোর-ঘণ্টা ও কপালকুণ্ডলা এসেছে পুজো দিতে। অঘোর-ঘণ্টা কপালকুণ্ডলাকে আদেশ করলে, 'নরবলি দিয়ে দেবীর আজই পুজো দেব। নিখুঁত সুন্দরী একটি মেয়ে চাই—যেখানে পাও খুঁজে নিয়ে এস।'

'যে আজ্ঞা'।—ছুটল কপালকুণ্ডলা আকাশপথে।

করালা দেবীর মন্দির বনের ভেতরে, তারপর বিরাট এক মহাশ্মশান। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিরঝিরে এক নদী। চারদিকে ভূত প্রেত পিশাচ খলখল—কলকল করছে। নর-কঙ্কাল আর নরকপালের গড়াগড়ি—ছড়াছড়ি। অন্ধকার দেখে হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল—ভুত্‌ভুতুম্।···মড়াকান্না কেঁদে উঠল শেয়ালের পাল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গায়ে লাগে যেন ছায়া-শরীরের নিশ্বাস। বহু দূরে দূরে ধিকি ধিকি জ্বলছে চিতা। চারদিক থম্‌থম্—খাঁ খাঁ। যেতে যেতে কপালকুণ্ডলা দেখতে পেল—ওরই মধ্য দিয়ে চলেছে এক সুদর্শন যুবক, মাথায় জটা—কোমরে বাঁধা তরোয়াল। ঘুরে বেড়াচ্ছে খ্যাপা উদাসীনের মত—আর হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে, 'চাই—মানুষের

মাংস চাই? রোগে ছেঁচা নয়—অস্ত্রে কাটা নয়। খেয়ে যাও—কে খাবে।'

ভূত প্রেত পিশাচেরা কিন্তু কেউ তাকে খেতে আসছে না—ভয়ে সব পালাচ্ছে দিগ্বিদিকে। মনের দুঃখে যুবক চলেছে তো চলেছেই।

কপালকুণ্ডলার গতি সর্বত্র—অজানাও কিছু নেই। যুবককে সে চিনতে পারলে—এ হল সেই বিদর্ভ-রাজমন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব। কপালকুণ্ডলা একটুখানি দেখে চলে গেল নিজের কাজে—রাজপুরীর দিকে। যেমন করে হোক, একটি নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে আজ চাই-ই চাই। উড়ে চলল আকাশপথে।

রাজপুরী ঢুঁড়ে খুঁজল ইতি-উতি, আতি-পাতি, ক্ষুণ্ণ মতি। নিখুঁত সুন্দরী কই! আকাশ গুটিয়ে চলে গেল সূর্যের আলোর পাট। এমন সময় ওই দেখ, এক প্রাসাদের ছাদের ওপরে পড়ে আছে যেন একগাছি শুকনো ফুলের মালা। শোকে দুঃখে মলিন—তবু অমন নিখুঁত সুন্দরী তো পদ্মাবতীতে একটিও নেই। সে আর কেউ নয়—মন্ত্রী-কন্যা মালতী। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে—চোখের কোণে জলের ধারা।

কপালকুণ্ডলা তাকে নিয়ে উড়ে চলল রাজ্যের শেষ সীমান্তে—সেই মহাশ্মশানের পার করালা দেবীর মন্দিরে। ঘুমন্ত মালতী কিছুই জানতে পারল না।

এদিকে বিয়ের লগ্ন এগিয়ে আসে—অমাত্য নন্দনের নহবৎখানায় শানাইয়ে লাগে মিলনের সুর। মালতীকে সাজাতে এসে সখীরা দেখে—মালতী নেই। পড়ে গেল খোঁজ-খোঁজ। কোথায় মালতী! কান্না উঠল ভূরিবসুর বাড়িতে। 'সাজ-সাজ' রব পড়ে গেল সেনাবাহিনীতে।

মন্ত্রী ভূরিবসু ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন কামন্দকীর পায়ে। বললেন, 'রক্ষে করুন। মালতীকে খুঁজে পাচ্ছিনে।'

মালতী এখন কোথায়, জানবার জন্য যোগে বসলেন ভগবতী কামন্দকী।

মালতী তখন করালা দেবীর মন্দিরে। কোথায় গেল তার বিয়ের বাস—রাঙা বরণের অংশুক, আর কপালে চন্দনের পত্র-লেখা! কাপালিক তাকে তখন সাজিয়েছে বলির পশুর মত। কপালে দিয়েছে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় জবাফুলের মালা। মালতী চীৎকার করে কাঁদছে মাথা কুটে কুটে বাপমায়ের নাম ধরে।

কিন্তু কাপালিক আর কপালকুণ্ডলার হৃদয় গলে না।

দেবীর পূজোর পর অঘোর-ঘণ্টা হাতে নিল খাঁড়া। কপালকুণ্ডলা এসে মালতীকে বললে, 'এখন স্মরণ কর কন্যে তোমার প্রিয়জন—তারপর তোমার এ জীবন থেকে মুক্তি।'

মালতী ডাক পেড়ে কেঁদে উঠল, 'হায় পিতা, রাজার সন্তোষের জন্য যাকে তুমি উপহার দিতে যাচ্ছিলে—আজ সে চলল। ওগো স্নেহময়ী জননী, ভগবতী কামন্দকী, বিদায়। হে মাধব!'—মালতীর আর্তনাদে মহাশ্মশান যেন শিউরে উঠল।

আর শিউরে উঠল মহাশ্মশানের একজন আত্মভোলা উদাসীন যুবক—সে মাধব। অন্যমনে ঘুরতে ঘুরতে আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়াল সে। তারপর ছুটল করালা দেবীর মন্দির লক্ষ্য করে। কাছে এসে দেখলে—অঘোর-ঘণ্টা আর কপালকুণ্ডলা তখন মালতীকে বধ করতে উদ্যত।

সঙ্গে সঙ্গে মাধব কোষমুক্ত তরোয়াল নিয়ে দাঁড়াল গিয়ে অঘোর-ঘণ্টার সামনে। বললে, 'আরে অধম কাপালিক—তিষ্ঠ।'

মালতী আর্তনাদ করে বললে, 'মাধব, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

অঘোর-ঘণ্টা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'আঃ, কে এই পাপ এসে আবার বাধা দিলে!'

কপালকুণ্ডলা বললে, 'বিদর্ভ-রাজমন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব। এই মালতী ওর বাগদত্তা বধূ।'

অঘোর-ঘণ্টা বললে, 'বটে! আয় তবে তোকেই আগে বলি দি'।'



মাধব তরোয়াল তুলে বললে, 'আয়, কে কাকে বলি দেয়—পাপিষ্ঠ দুরাত্মা।'

কপালকুণ্ডলা বলে উঠল, 'গুরুদেব, সতর্ক হয়ে তাড়াতাড়ি এ দুরাত্মাকে বধ করুন। কারণ, এ মস্ত বড় যোদ্ধা।'

তারপর লেগে গেল ভীষণ লড়াই। অঙ্গে অঙ্গে পড়ছে ভীষণ আঘাত। দীর্ঘকায় ভীষণমূর্তি অঘোর-ঘণ্টা, তার কাছে মাধব যেন বালক। দেহে তার পড়ছে ভীষণ খড়্গের আঘাত। কি জানি, মাধব হয়তো নিহত হবে। ভয়ে মালতী আর দেখতে পারল না। চোখে হাত ঢাকা দিয়ে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল, 'ফিরে যাও মন্ত্রিপুত্র—এ হতভাগিনীকে রেখে বরং ফিরে যাও। ওই রাক্ষসের কাছ থেকে পালাও তুমি!'

মাধব বললে, 'ওকে এখুনি বধ করছি।'

চলতে লাগল ঘোরতর লড়াই। এমন সময় শোনা গেল অদূরে সৈন্যকোলাহল। তাদের মধ্যে কে একজন হেঁকে বলে উঠল, 'ভগবতী কামন্দকী বলেছেন—ঘিরে ফেল করালা দেবীর মন্দির। এ নির্ঘাৎ কাপালিকের কাজ।'

কপালকুণ্ডলা রাগে দাঁত কড়মড় করে বললে, 'গুরুদেব, আমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেলাম।'

অঘোর-ঘণ্টা বললে, 'ভয় নেই—আগে একে বধ করি। ও সামান্য মানুষের অবরোধ আমাদের কি করতে পারে!'

কিন্তু পরের মুহূর্তে বধ সে নিজেই হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এসে পড়ল সৈন্য-সামন্ত। সামনে কামন্দকী। কপালকুণ্ডলা তাড়াতাড়ি আড়ালে লুকিয়ে গেল। মালতী ছুটে গিয়ে ভগবতী কামন্দকীর বুকে মুখ লুকাল।

কামন্দকী মাধবকে বললেন, 'মাধব, আজ তুমি একে রক্ষা করেছ। এস আজ প্রাণভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি। এস—আমার সঙ্গে এস।'

ভগবতী কামন্দকীর স্নেহের ডাক আজ উপেক্ষা করতে পারল না মাধব। মহাশ্মশান বাস ছেড়ে বহুদিন পরে আবার সে ফিরে চলল রাজপুরীর দিকে।

আর কপালকুণ্ডলা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার গুরুদেবের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে শপথ করলে, 'গুরুদেব, এ পাপের শাস্তি হতভাগা মাধবকে আমি দেবই দেব।'

ওদিকে মাধবকে মালতীর সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন ভগবতী কামন্দকী। মাধবের বন্ধু অনুচরেরা মাধবকে মহাশ্মশান থেকে ফিরতে দেখে রাজপথ মুখরিত করে আনন্দে কোলাহল করতে লাগল। ভূরিবসুর বাড়িতেও পড়ে গেল সাড়া।

ভগবতী কামন্দকী আদেশ করলেন, 'সমস্ত বিঘ্ন বিনাশের জন্য আগে চল নগর-দেবতার মন্দিরে। মালতী আর মাধবকে আজ ফিরে পেয়েছি—এ আমার ভাগ্য।'

মাত্র কয়েকজন শিষ্যাকে কাছে রেখে কামন্দকী সকলকে চলে যেতে বললেন। মন্দিরে এসে দেবতা সাক্ষী করে ভগবতী কামন্দকী মালতীকে সমর্পণ করলেন মাধবের হাতে। বললেন, 'মাধব, যাকে তুমি আজ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছ, তাকে চিরজীবনের জন্য রক্ষা কর। আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও। আজ থেকে শুরু হোক তোমাদের দ্বিতীয় জীবন।'

ভগবতী কামন্দকী ওদের আশীর্বাদ কর চলে গেলেন।

কিন্তু কোথায় মালতীর সুখ, কোথায় মাধবের আনন্দ। ওদিকে রাজার অমাত্য নন্দন উঠল ক্ষেপে। মাধবের অনুচরেরা রাজপথে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—নন্দন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। খবর এসে পৌঁছল নগর-দেবতার মন্দিরে—বীর মাধবের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে টগবগ করে উঠল বীরের বুকের রক্ত। মাধব ছুটল বন্ধুদের সাহায্যে। মন্দিরে একা পড়ে রইল মালতী। ভয়ে ভাবনায় তার মুখ শুকনো—নাচতে লাগল ডান চোখ। অমঙ্গলের ভয়ে মালতী চেয়ে রইল মাধব যে দিকে গেছে।

এমন সময় মন্দিরে তাকে একা দেখে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে এসে দাঁড়াল কপালকুণ্ডলা। মালতী ভয়ে ছুটে পালাতে গেল—সামনে পথ ঘিরে দাঁড়াল কপালকুণ্ডলা—বললে, 'এবার রক্ষা করুক তোর মাধব। পড়েছিস এবার আমার হাতে—এখন তোকে শ্রীপর্বতে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে, দগ্ধে দগ্ধে মেরে প্রতিশোধ নেব।'

মালতী আর্তনাদ করে উঠল, 'ভগবতী কামন্দকী! হায় মাধব—রক্ষা কর!'

কপালকুণ্ডলা মালতীকে নিয়ে শূন্যপথে উড়ে চলল।

মাধব তখন অনুচরদেব নিয়ে যুদ্ধে মত্ত। রাজসৈন্যদের হাত থেকে অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল ওরা। দেখতে দেখতে রাজপথ ভবে গেল মৃত সৈনিকের দেহে। প্রাসাদের ওপর থেকে বাজা অবাক হয়ে ওদেব বিক্রম দেখছিলেন। বিশেব করে চোখ ছিল তাঁব এক যুবক যোদ্ধার ওপরে—যে একাই প্রায় দেখতে দেখতে সমস্ত সৈন্য নির্মূল কবে ফেললে। অন্ধকাবে চোখের লক্ষ্য তার কী একাগ্র, হাতের তরবারি কী ক্ষিপ্রগতি! সে যুবক আর কেউ নয়—বীব মাধব। রাজ-সেনা যখন হেরে চাবদিকে ছুটে পালাতে লাগল, তখন রাজা নেমে এলেন প্রাসাদের ওপর থেকে। সাদব অভ্যর্থনা জানিয়ে মাধব আর তার অনুচবদের নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে। মাধবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি? কোথায় তোমার নিবাস? কে তোমার পিতা?'

ভগবতী কামন্দকীর এক শিষ্যা কাছে ছিলেন—তিনি পরিচয় দিলেন মাধবের।

সব শুনে রাজা ভূরিবসুকে বললেন, 'যথার্থ যোগ্য পাত্রের হাতেই তোমার মেয়ে অর্পিত হয়েছে। যাও, ওদের বিয়ের উৎসব কর।'

আবার শানাই বেজে উঠল মন্ত্রী ভূরিবসুর নহবৎখানায়।

কিন্তু হায়, কাকে নিয়ে হবে উৎসব। মাধব তার অনুচরদের নিয়ে ফিরে এসে দেখলে—মন্দির শূন্য। মন্ত্রী ভূরিবসু বরণের ডালা নিয়ে এসে দেখলেন—মালতী নেই, মাধব নেই। মাধব তার অনুচরদের নিয়ে মালতীকে খুঁজতে খুঁজতে কোথায় চলে গেছে—কেউ জানে না।

আবার মাধবের সেই উদাসীন বেশ, মলিন কান্তি। গিরি-অরণ্য-কান্তার খুঁজে খুঁজে ফেরে সে মালতীকে। কোথায় মালতী!

তার দুঃখে কাঁদেন ভগবতী কামন্দকী—তাঁর যোগ বল, পুণ্যফল, সব বুঝি ব্যর্থ হয়। কেঁদে ফেরে মাধবের অনুচরেরা, কাঁদে বনের পশুপাখি। বনস্পতি ছায়া মেলে দিয়ে গাছের ডালপালা নেড়ে নেড়ে স্বন স্বন করে বলে—'ওরে শোন্—শোন্!—'

সে ছায়ার কাঁপন দেখে মাধব ছুটে যায় পাগলের মত—কিন্তু হায়, ছায়ায় ছায়া মিলিয়ে যায়। একদিন সেই ছায়া দেখে ছুটতে গিয়ে সে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে বনের কোলে।

ওদিকে ভগবতী কামন্দকীর শিষ্যরা ছুটল দিকে দিকে।

দিনে দিনে দিন গেল—না পাওয়া গেল মালতীকে, না ফিরে এল মাধব।

মন্ত্রী ভূরিবসু একদিন চিতা জ্বালিয়ে তৈরী হলেন—আত্মবিসর্জন করবেন। পাশে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী। খবর শুনে ছুটে এলেন রাজা, ছুটে এল নন্দন। ভগবতী কামন্দকী এসে আগলে দাঁড়ালেন চিতা।

মন্ত্রীর চোখের জলে বুক ভেসে গেল। বললেন, 'আমায় মরতে দিন ভগবতী। মালতী-হারা হয়ে কিসের সুখে আর বাঁচব!'

ভগবতী কামন্দকী বললেন, 'যেখান থেকে হোক—মালতীকে পাওয়া যাবেই।'

মন্ত্রী ভূরিবসু প্রবোধ মানেন না।

এমন সময় শাঁ শাঁ করে আকাশ-পথে মালতী আর মাধবকে নিয়ে উড়ে এল ভগবতী কামন্দকীর এক শিষ্যা—নাম তার সৌদামিনী। এসে কামন্দকীকে গড় করে বললে, 'আপনার পুরাতন এক শিষ্যার প্রণাম গ্রহণ করুন ভগবতী।'

'সৌদামিনী!' কামন্দকী আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কোথায় ছিলে তুমি! কোথায় পেলে মালতী আর মাধবকে?'

সৌদামিনী বললে, 'শ্রীপর্বতে আমি সাধনা করতাম। একদিন ওই পাহাড়ের এক গুহায় বুকফাটা কান্নার হাহাকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখতে পেলাম মালতীকে, কাপালিক-শিষ্যা কপালকুণ্ডলা তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলবার যোগাড় করছে। তার হাত থেকে তাকে তখন রক্ষা করি। তারপর খুঁজতে খুঁজতে মাধবকে একদিন কুড়িয়ে পেলাম এক বনের ছায়ায়—জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে ছিল।'

মালতী ছুটে গিয়ে বাপেব বুকে মুখ লুকাল।

দেখতে দেখতে দুঃখের পদ্মাবতী নগরী ভরে উঠল আবার আনন্দ কলরবে। মন্ত্রী আব ভগবতী কামন্দকীর এক চোখে হাসি—এক চোখে জল। তাঁরা মালতী আর মাধবকে আশীর্বাদ কবে বললেন, 'এত দিনে সত্য রক্ষা হল।'

আবাব সেজে দাঁড়াল বরযাত্রীর হাতীর পাল—ঢং ঢং করে বেজে উঠল গলার ঘণ্টা, নহবৎখানায় আবার নতুন করে উঠল বিয়েব শানাইয়েব মধুব তান।

॥ ভবভূতি রচিত 'মালতী-মাধব' থেকে ॥



আত্মোৎসর্গ

হিমালয় পর্বতের দুর্গম এক অঞ্চলে বিদ্যাধররা বসবাস করত। বিদ্যাধররা ছিল দেবতাদেরই স্বগোত্র।

এই বিদ্যাধরদের রাজা ছিলেন জীমূতকেতু। জীমূতকেতুব কোন ছেলেমেয়ে ছিল না—তাই তাঁর মনে বড় দুঃখ। তাঁর এত ধনদৌলত রাজ্যশ্রী কে ভোগ করবে?

জীমূতকেতুর বাগানে ছিল একটি কল্পবৃক্ষ। এই কল্পবৃক্ষের কাছে যে যা চাইত তাই পেত। মনের দুঃখে জীমূতকেতু একদিন কল্পবৃক্ষের কাছে গিয়ে নিজের বেদনার কথা বললেন। রাজা বললেন, 'হে কল্পবৃক্ষ, একটি গুণবান পুত্র দিয়ে আমার দুঃখ দূর কর।'

কল্পবৃক্ষ বলল, 'রাজা, আপনার বিখ্যাত দানবীর দয়াশীল একটি ছেলে জন্মাবে—আপনি ভাববেন না।'

জীমূতকেতু খুশী হয়ে ঘরে ফিরলেন।

কল্পবৃক্ষের কথা মিথ্যা হবার নয়। রাজা জীমূতকেতুর একটি ছেলে হল—তার নাম রাখা হল জীমূতবাহন। সে যত বড় হতে লাগল ততই তার গুণরাশি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর একদিন জীমূতবাহন যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হল। হল বটে, কিন্তু রাজকুমারের রাজ্যপাটে মন নাই। একদিন সে

জীমূতকেতুর কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা, আমি এই কথাটা ভাল করে বুঝেছি যে, এ সংসারে সব কিছুই অসার। সার শুধু মহাত্মাদের খ্যাতি। সেই খ্যাতিই চিরকাল টিকে থাকে। তাই, পরের উপকার করে আমি যাতে যশ লাভ করতে পারি—তারই চেষ্টা করতে চাই।'

রাজকুমারের ঠিক মতলবটি বুঝতে না পেরে রাজা জীমূতকেতু তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

রাজকুমার বলল, 'আমাদের বাগানে একটা কল্পবৃক্ষ আছে—গরীবদের উপকারে তাকে যদি লাগাতে পারি তাতে আমাদের খ্যাতি চিরকাল টিকে থাকবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি গরীবদের অভাব মোচনের চেষ্টা করি।'

জীমূতকেতু আনন্দিত হয়ে বললেন, 'চল—এক্ষুনি গিয়ে আমরা কল্পবৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করি।'

রাজা আর রাজকুমার কল্পবৃক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জীমূতকেতু বললেন, 'হে কল্পবৃক্ষ, তুমি চিরকাল আমাদের কামনাই পূরণ করে এসেছ। নিজেদের জন্য আমরা আর কিছু চাই না, আজ থেকে তুমি গরীবদের যত অভাব আছে সব মিটিয়ে দাও। আজ থেকে তুমি গরীবদের।'

সেদিন থেকে কল্পবৃক্ষ অজস্র ধনরত্ন বর্ষণ করতে লাগল। এ পৃথিবীতে দরিদ্র আর কেউ রইল না। সকলের সকল অভাব মিটে গেল। জীমূতবাহনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু বিদ্যাধরদের ভিতরে হিংসুকের অভাব ছিল না। জীমূতবাহনের জয়-জয়কার তাহাদের অসহ্য হল। কল্পবৃক্ষটি গরীবদের দান করে দিয়ে জীমূতবাহন নিশ্চয় হীনবল হয়ে পড়েছে—এই ভেবে একদিন তারা একযোগে জীমূতবাহনের রাজ্য আক্রমণ করল।

শত্রুপক্ষের এই অত্যাচারে জীমূতবাহন কিন্তু এতটুকু ভয় পেল না, এতটুকু বিচলিত হল না। বরঞ্চ জীমূতকেতুর কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা আমাদের এই রাজ্যপাট চিরদিন থাকবে না। এ সবই অস্থায়ী, তাই এর জন্য মিছিমিছি যুদ্ধ করে রক্তপাত ঘটিয়ে লাভ কি! আত্মীয়রাই আজ আমার শত্রু। তাই আমি ভাবছি, ওদেরই হাতে এ রাজ্য দান করে আমি বনে চলে যাব।'

জীমূতকেতু তখন বৃদ্ধ। তাঁর বিষয়-বাসনা অনেক আগেই চুকে গেছে। এখন ছেলের কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি যুবক, তোমার এখন ভোগের সময়। কিন্তু তুমিই যদি সব ছেড়ে চলে যেতে চাও তাহলে আমিই বা আব এখানে পড়ে থাকব কেন? আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও।'

জীমূতবাহনের মা-ও বললেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও!'

জীমূতবাহন তখন বাপ-মাকে সঙ্গে নিয়ে মলয় পাহাড়ে চলে গেল। মলয় বাতাস সেখানে চন্দনের বনে চন্দনেব গন্ধ ছড়াচ্ছে, সব সময়ে ঝির ঝির কবে বইছে প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া। সেখানে এক আশ্রম তৈরি কবে জীমূতবাহন বাপ-মায়ের সঙ্গে সুখে কাল কাটাতে লাগল।

তারপব হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। জীমূতবাহন একদিন পাহাড়ের এক প্রান্তে সমুদ্রের ধাবে বেড়াতে গিয়ে দেখল— একটি মেয়ে খুব কাঁদছে আর একটি যুবক তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে। জীমূতবাহন তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কে? কি হয়েছে তোমাদেব?'

যুবকটি বলল, 'আমরা নাগবংশের। আমার নাম শঙ্খচূড়। আর যিনি কাঁদছেন উনি আমার মা।'

জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন—উনি কাঁদছেন কেন?'

যুবক শঙ্খচূড় বলল, 'গোলমালটা শুরু হয়েছিল অনেককাল আগে।

কশ্যপ মুনির ছিল দুই স্ত্রী—বিনতা আর কদ্রু। তাঁদের দুজনের ঝগড়া থেকেই শুরু হল একটা বিশ্রী কাণ্ড।'

জীমূতবাহন মন দিয়ে শুনতে লাগল—শঙ্খচূড় বলে চলল সেই আদ্যিকালের ঘটনা।...

একদিন নাগ-মাতা কদ্রুর সঙ্গে গরুড়ের মা বিনতার সামান্য ব্যাপার নিয়ে গুরুতর কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। বিনতা বললেন—সূর্যের ঘোড়ার রং সাদা। কদ্রু বললেন—না, কালো। দুই সতীনে ঝগড়া বেধে গেল। ঝগড়া শেষ হল এই বলে যে, যার কথা মিথ্যা হবে তাকে অপর জনের কাছে চিরকাল দাসীত্ব করতে হবে।



তারপর নাগ-মাতা কদ্রু একটা ষড়যন্ত্র করলেন। যাতে তাঁরই জয় হয় এইজন্য নিজের ছেলেদের তিনি গোপনে সূর্যের ঘোড়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা ছিল সবাই বিষাক্ত নাগ। তারা

গিয়ে সূর্যের সাদা সাদা ঘোড়াগুলোকে চারিদিক ঘিরে ধরে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তাদের বিষাক্ত নিশ্বাসে সূর্যের ঘোড়ার রং কালো হয়ে গেল। নাগ-মাতা কদ্রুর জয় হল। গরুড়ের মা বিনতা হলেন তাঁর দাসী।

এর কিছুদিন পরে গরুড় কদ্রুর কাছে জানতে এল—কিসে তার মায়ের দাসীত্ব মোচন হবে। কদ্রুর ছেলেরা বলল, 'দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পেয়েছেন—যদি সেই অমৃত খেতে পাই তাহলে তোমার মায়ের মুক্তি।'

শুনে গরুড় চলল—যেখানে সমুদ্র মন্থন হচ্ছে সেখানে গিয়ে সে দেবতাদের সঙ্গে ঘোরতর লড়াই বাঁধিয়ে দিল। তার বীরত্ব দেখে বিষ্ণু খুশী হয়ে তাকে বর চাইতে বললেন। গরুড় বলল, 'এই বব দিন যাতে নাগেরা আজ থেকে আমার ভক্ষ্য হয়।'

বিষ্ণু বললেন, 'তাই হবে।'

আর ইন্দ্র তাঁকে অমৃতের কলসীটি দিয়ে বললেন, 'এই কলসীটি তুমি নাগদের কাছে নিয়ে গিয়ে কুশের ওপরে রাখবে—আমি যেমন করে পারি অমৃতের কলসী আবার উদ্ধার করে আনব।'

তারপর গরুড় অমৃতের কলসী নিয়ে হাজির হল নাগদের কাছে। ইন্দ্রের কথামত কলসীটি কুশগাছার ওপর রেখে গরুড় নাগদের বলল, 'আগে আমার মায়ের মুক্তি দাও তারপর অমৃত খাও।'

অমৃতের কলসী দেখে নাগেরা অধীর হয়ে উঠল। বিনতাকে তারা ছেড়ে দিল। তারপর শুদ্ধ পবিত্র হয়ে অমৃত খাবার জন্য সবাই নদীতে স্নান করতে নামল। সেই সুযোগে ইন্দ্র অমৃতের কলসীটি একেবারে স্বর্গে নিয়ে চলে গেলেন। নাগেরা স্নান করে এসে দেখে—কলসী তো নাই, পড়ে আছে শুধু কুশগাছা। অমৃতের লোভে সাগ্রহে তারা সেই কুশগাছাই চাটতে গেল—যদি অমৃত কিছুটা পাওয়া যায়। আর যেমনি চাটা অমনি কুশের ধারে জিভ চিরে দুখণ্ড। সেই দিন থেকে সাপের জিভ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

কদ্রুর ছেলেরা এইভাবে জব্দ হল। এদিকে বিষ্ণুর বরে গরুড় পাতালে গিয়ে নাগবংশ ধ্বংস করতে লাগল। গোটা বংশটাই লোপ পায় দেখে নাগরাজ বাসুকি একদিন গরুড়কে সন্ধির জন্য ডাকলেন। বললেন, 'তোমাকে আর পাতালে আসতে হবে না। সমুদ্রের ধারে তোমার জন্য রোজ একজন করে নাগকে পাঠিয়ে। দেব।' সেদিন থেকে গরুড়ের জন্য নাগরাজ বাসুকি রোজ একটি করে নাগ পাঠিয়ে দেন।···

গল্প শেষ করে শঙ্খচূড় বলল, 'সেই থেকে এই নিয়ম আজও চলছে। আজ পড়েছে আমার পালা! তাই আমার মা কাঁদছেন।'

শঙ্খচূড়ের কথা শুনে জীমূতবাহন বিচলিত হল। বলল, 'সে কী! বাসুকি কি রকম রাজা হে? প্রজাদের প্রাণ নষ্ট করার আগে তিনি নিজের প্রাণ দিলেন না কেন? কশ্যপ মুনির ছেলে হয়ে গরুড়েরই বা এ কী রকম আচরণ! যাই হোক, শঙ্খচূড়—তোমার কোন ভয় নেই। আজ আমি নিজের দেহ দান করে তোমাকে বাঁচাব।'

শঙ্খচূড় বললে, 'দোহাই আপনার! আমি একজন সামান্য লোক। আমার জন্য আপনার মহামূল্য জীবন নষ্ট হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, আমিও সত্য থেকে ভ্রষ্ট হতে চাই না। সত্য রক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত বহু নাগ মারা গেছে—আমিও আজ মরব। আপনি বাধা দেবেন না।'

তারপর গরুড়ের আসার সময় হয়েছে বুঝতে পেরে শঙ্খচূড় তাড়াতাড়ি অদূরের এক শিব মন্দিরের দিকে শেষ প্রণাম করতে চলে গেল।

জীমূতবাহন এই সুযোগ ছাড়ল না। গরুড় যেখান থেকে রোজ নাগদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়—সেই পাহাড়ের উপরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই পাখার ঝাপট মেরে উঠে এল পক্ষিরাজ গরুড় এবং জীমূতবাহনকেই নাগবংশের একজন মনে করে তাকে

ছোঁ-মেরে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ার উপরে গিয়ে বসল। তারপর গরুড় তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। জীমূতবাহনের কিন্তু কোনও যন্ত্রণাবোধ নেই—মনে বরং আত্মদানের অপূর্ব আনন্দ। জীমূতবাহনের



এই অপূর্ব অপরূপ জীবন উৎসর্গ দেখে স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। তাই দেখে গরুড় খাওয়া ফেলে থমকে গেল ঃ কি ব্যাপার!

এদিকে শঙ্খচূড় শিব-মন্দিরে প্রণাম সেরে ফিরে এসে দেখল—যেখান থেকে গরুড় রোজ নাগদের ছোঁ-মেরে নিয়ে যায়, সেখানে আর একজনের রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। শঙ্খচূড় 'হায় হায়' করে উঠল। সে বুঝতে পারল—তার সামান্য জীবনের জন্য একজন মহাত্মার জীবন আজ শেষ হচ্ছে। শঙ্খচূড় ব্যস্ত হয়ে পক্ষিরাজ

গরুড়কে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল—গরুড় জীমূতবাহনকে খেতে খেতে থমকে বসে আছে। শঙ্খচূড় তখন দূর থেকে চীৎকার করে ডাক দিয়ে বলে উঠল, 'পক্ষিরাজ, ওঁকে খাবেন না। উনি নাগ-সন্তান নন। নাগ-সন্তান আমি। আমার নাম শঙ্খচূড়। আজ আমার পালা। আপনি আমাকেই খাবেন।'

গরুড় অবাক হয়ে জীমূতবাহনকে শুধোলে, 'ব্যাপার কী। আপনি কে—সত্যি করে বলুন ?'

জীমূতবাহন হেসে বললে, 'আমি সত্যিই নাগ-সন্তান—আমাকে খেয়ে শেষ করুন।'

শঙ্খচূড় চীৎকার করে বলে উঠল, 'না না—ওঁকে খাবেন না।'

গরুড় খাওয়া বন্ধ করে আবার শুধোলে, 'কে আপনি—বলুন।'

অগত্যা জীমূতবাহন বলল, 'আমি জীমূতবাহন।'

গরুড় চমকে উঠল। বলল, 'বিদ্যাধরদের সেই খ্যাতনামা ধর্মপ্রাণ রাজা!' গরুড় তারপর নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলল, 'হায় হায়, আমি আজ কি পাপ করলাম! একমাত্র আগুনে পুড়ে মরা ছাড়া এ পাপ থেকে আমার আর উদ্ধার নেই।' এই বলে পক্ষিরাজ গরুড় তখনই আগুনে পুড়ে মরবার জন্য তৈরী হল।

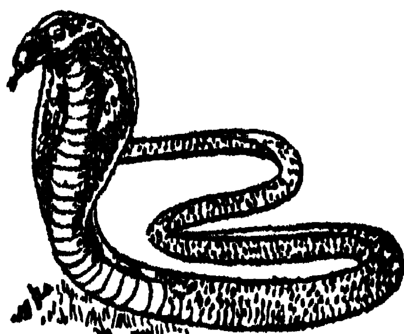
জীমূতবাহন বলল, 'পক্ষিরাজ, তোমার মরবার দরকার নেই। সত্যিই যদি তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাক, তা হলে আজ থেকে আর নাগদের খেয়ো না। আর যদি পার, এতদিন যাদের খেয়েছ তাদের আবার জীবন দান কর। আমার কথা শোন। এই কাজ করলেই তুমি পাপ থেকে মুক্ত হবে।'

গরুড় জীমূতবাহনের কথা মেনে নিলে। মৃত নাগদের বাঁচাবার জন্য গরুড় স্বর্গে অমৃত আনতে ছুটল। অমৃত নিয়ে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল স্বর্গের দুন্দুভি। জীমূতবাহনের ক্ষতবিক্ষত দেহে অমৃত ছিটিয়ে দিতেই তার শরীর আবার আগের মত সুন্দর

হয়ে উঠল। তারপর গরুড় নাগদের কঙ্কালের উপর অমৃত ছিটিয়ে দিল—সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেঁচে উঠল।

জীমূতবাহনের কীর্তি-কথা দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন চারদিক থেকে তাকে দেখবার জন্য সকলে ছুটে এল। এমন কি তার আত্মীয় শত্রুরাও আজ বাদ পড়ল না—জীমূতবাহনের অপহৃত রাজ্য তারা আবার জীমূতবাহনকে ফিরিয়ে দিল, সমস্ত বিদ্যাধর আজ মাথা নত করে মহাত্মা জীমূতবাহনের বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

।। 'কথাসরিৎসাগর' থেকে ।।





রত্নদত্তের সুমতি

সে অনেক—দিন আগে। তক্ষশিলা নগরে কলিঙ্গ দত্ত নামে একজন রাজা তখন রাজত্ব করতেন।

রাজার ছিল জৈনধর্মে খুব বিশ্বাস। এই ধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রজাদের তিনি খুব বোঝাতেন, খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁর রাজ্যে অহিংসাই ছিল পরম ধর্ম। রাজ্য জুড়ে দান খয়রাত লেগেই ছিল। এ দেয়, সে দেয়। এত দেয় যে নেয় কে! সকাল হলেই পশুপাখির যেন ভোজ বসে যায়। সে কত রকমের খাবার! সবাই বলে—আয় আয়, খা খা। খায় কে! কাকে কুকুরে খাবার নিয়ে কামড়া-কামড়ি ঠোকরা-ঠুকরি করে না। চিনি খেয়ে খেয়ে পিঁপড়ের ভুঁড়ি বেড়ে গেল, ধান চাল খেয়ে খেয়ে

ইঁদুরেরা এমনি মোটা হল যে গর্তে আর ঢুকতে পারে না; রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল। বেরালেরা দুধ ক্ষীর খেয়ে 'অ্যাঁও' করে আলস্য ভরে একটা হাই তুললে মাত্র।

পশুপাখির রাজ্যে সাড়া পড়ে গেল। সকলে শুনল, কলিঙ্গ দত্তের রাজ্যে অহিংসা পরম ধর্ম।

এত দান খয়রাত যে সকলের ভালো লাগত—এমন নয়। যেমন রত্নদত্ত। অথচ তার বাবা বিতস্তদত্ত ছিলেন রাজার মত জৈনধর্মে বিশ্বাসী।

বিতস্তদত্ত সওদাগর। সারা জীবনে তিনি ধনরত্ন উপার্জন করেছিলেন অনেক। সাত সমুদ্র তেব নদীতে হাজার দাঁড়ের ময়ুরপঙ্খী ভাসিয়ে কত দেশ-দেশান্তর ঘুরেছেন। নিজের দেশের রেশম পশম আর মিহিন সুতোর বহুমূল্য কাপড়, দামী দামী হাতীর দাঁতের কারুকাজ, ভারত মহাসাগরের মুক্তো—এমনি কত কি, দেশ-দেশান্তরে বিক্রি করে কত ধনরত্ন এনে ঘর বোঝাই করেছেন তার লেখাজোখা নেই। সোনার তাল আর মণিমানিকে ছাতা ধরে যায়—উঠোনের রোদে শুকোতে দেন। পাড়াপড়শীর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এত যে সোনাদানা মণিমানিক, শেষ বয়সে এসে বিতস্তদত্ত সব অতিথি সেবায় লাগিয়ে দিলেন।

ব্যাপারটা রত্নদত্তের ভালো লাগল না। বাপের এত ধন-দৌলত, কোথায় সে ইচ্ছে মত খরচ করবে, রোজ দু'বেলা মাংস খাবে, মাছ খাবে—তা না, শুধু অতিথি সেবা, দান খয়রাত! আর প্রাণিহিংসা একেবারে বারণ! রত্নদত্ত চটে গেল। খাওয়ায় সুখ নেই, খরচে হাত নেই। বিতস্তদত্ত একটি পাই-পয়সা নিজের জন্য বাজে খরচ করেন না। রত্নদত্ত চটে গিয়ে চারদিকে যা তা বলতে লাগল। বাপের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে সে বহু রকমের নিন্দা রটাতে লাগল।

সে-সব কথা একদিন বিতস্তদত্তের কানে উঠল। একদিন তিনি রত্নদত্তকে ডেকে বললেন, 'এ কি শুনি! তুমি আমার ধর্মসেবার নিন্দে কর কেন? ছেলে কি বাপের নিন্দে করে?'

রত্নদত্ত বললে, 'আপনার নতুন ওই ধর্মের সেবা আমার অধর্ম বলে মনে হচ্ছে।'

রত্নদত্তের উদ্ধত উত্তর শুনে বৃদ্ধ সওদাগর তাকে অনেক বোঝালেন। পণ্ডিতেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম বলে গেছেন। জৈনধর্মে হিংসা-দ্বেষ কোনও কিছু নেই। তাই এ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে বিতস্তদত্ত বললেন, 'আমার অনেক ধন-দৌলত। তোমার ইচ্ছে হলে তুমিও এই রকম দানধর্মের সেবা করতে পার।'

রত্নদত্ত অতশত বুঝল না। সে সমানে বাপের ধর্মসেবার নিন্দা করে বেড়াতে লাগল।

বিতস্তদত্ত যখন কোনও রকমেই রত্নদত্তের মতিগতি ফেরাতে পারলেন না, তখন বিরক্ত হয়ে সব কথা রাজা কলিঙ্গদত্তকে জানালেন। কলিঙ্গদত্ত সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে বসে রত্নদত্তের বিচার করে দিলেন।

রত্নদত্ত শুনল—বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। তার বুক ধড়াস করে উঠল।

এদিকে বিতস্তদত্তও মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে এ তিনি কি করে বসলেন! রাজার আদেশ না মানবার উপায়ও নেই। তবু, হালকা ধরনের কোনও দণ্ডের জন্য রাজার কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু কলিঙ্গদত্তের কথার নড়-চড় নেই। তবে, এইটুকু শুধু দয়া দেখিয়ে তিনি বললেন, 'দু-মাস সময় দিলাম। দু-মাস পরে আপনি আবার রত্নদত্তকে রাজসভায় নিয়ে আসবেন। এর মধ্যে যদি ওর মতিগতি ভালো হয় তো তখন দেখা যাবে। এখন প্রাণদণ্ডই বহাল রইল।'

ঘরে ফিরে এসে সওদাগর রত্নদত্তকে আবার অনেক রকমে বোঝাতে লাগলেন। সেদিন আর রত্নদত্ত একটি কথারও প্রতিবাদ করলে না, চুপ করে সব শুনে গেল।

বাপের কথা যেমন সে নীরবে কান দিয়ে শুনে গেল, তেমনি সে নীরবে দিনে দিনে কেবলি শুকিয়ে যেতে লাগল। মরবার ভয়ে তার খাওয়া শোওয়া ঘুম কোথায় চলে গেল। একটি একটি করে দিন কাটতে লাগল আর সে প্রতিদিন হিসেব করতে লাগল—দু-মাসের আর কটা দিন বাকী। তারপর তো সব শেষ। রাজার আদেশ নড়বার নয়—কোথাও পালাবারও পথ নেই। ভাবনায় রত্নদত্ত হয়ে গেল একেবারে কাঠিটি।

তারপর মাস দুই পরে রত্নদত্তকে সঙ্গে নিয়ে বিতস্তদত্ত চললেন রাজার কাছে। রত্নদত্ত কাঁপতে কাঁপতে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কলিঙ্গদত্ত তাকে বললেন, 'কি রত্নদত্ত, তুমি এত রোগা হয়ে গেলে কেন? খাওয়া দাওয়া করতে তো তোমাকে বারণ করিনি।'

রত্নদত্ত কয়েকবার ঢোক গিলে শেষকালে বললে, 'মহারাজ, এ দু-মাস শুধু আমি মরার কথাই ভেবেছি। খাওয়া বলুন, ঘুম বলুন—ও সবের দিকে মন ছিল না। কেবলি ভাবতাম—দু-মাসের আর বেশী বাকী নেই, তারপর আমার মৃত্যু। এই ভেবে ভেবে আমার এই অবস্থা হয়েছে।'

রাজা বললেন, 'তা হলে বোঝ, মৃত্যু কি ভীষণ। তোমারই মত সমস্ত প্রাণী মৃত্যুভয়ে অস্থির। সে যে কত বড় যন্ত্রণা—তা তুমি নিশ্চয়ই টের পেয়েছ। এটা বোঝাবার জন্যই তোমাকে দু-মাস সময় দিয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলাম। এ যন্ত্রণা যদি এড়াতে চাও তা হলে ধর্মে মতি দাও, হিংসা-দ্বেষ ছাড়।'

রাজার কথা শুনে রত্নদত্তের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। সে হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ, অহিংসাই যে বড় ধর্ম, আমি প্রাণ দিয়ে তা বুঝেছি। এবার আপনার ধর্মে আমাকে দীক্ষা দিন।'

রাজা বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। তবে আজ তুমি প্রাণভরে আনন্দ কর। রাজধানীতে আজ একটা উৎসব হচ্ছে—তাতে যোগ দাও গে যাও। কিন্তু বাপু তোমার হাতে একটা তেলের বাটি দিয়ে দেওয়া হবে, পথ চলবে সাবধানে। তোমার পেছনে পেছনে যাবে আমার কয়েকজন ঘাতক, তাদের হাতে থাকবে খাঁড়া। যদি তোমার



বাটি থেকে একটি ফোঁটা তেল মাটিতে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাতকরা তোমার মাথাটি কেটে ফেলবে। যাও।—'

রত্নদত্তের মাথায় আবার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। রাজার আদেশ, উপায় নেই। রত্নদত্ত উৎসব দেখতে চলল—হাতে ভরা-

তেলের বাটি। আর পিছনে ঘাতক—তাদের হাতে খাঁড়া। রত্নদত্তের উৎসব দেখা মাথায় উঠল। বুক কাঁপতে লাগল। চোখ রইল শুধু তেলে বাটির দিকে—যাতে একটা ফোঁটাও না মাটিতে পড়ে। বেচারী রত্নদত্ত—তার চারদিকে রাজধানী জুড়ে তখন উৎসব! কেউ নাচছে, কেউ গান গাইছে, কোথাও কত রকমের বাদ্যি-বাজনা, কত রং-তামাশা। কিন্তু চোখ তুলবার অবসর কোথায় রত্নদত্তের!

কোনও রকমে রাজধানীটা ঘুরে রত্নদত্ত রাজার কাছে তেলেব বাটি হাতে ক'রে ফিরে এল।

তাকে দেখেই রাজা বলে উঠলেন, 'এই যে রত্নদত্ত, উৎসব কেমন দেখলে?'

রত্নদত্ত ভয়ে ভয়ে বললে, 'মহারাজ, বাটির তেল ঠিক রেখে সারাটা পথ প্রাণ বাঁচাতেই অস্থির। পেছনে আছে খাঁড়া হাতে আপনার ঘাতকেরা। তাই উৎসব দেখা আর হয়নি। সমস্ত মন ছিল তেলের বাটির দিকে।'

রাজা বললেন, 'রত্নদত্ত, যেমন করে আজ তুমি তেলের বাটিটির দিকে তোমার সমস্ত মন ও প্রাণ নিযুক্ত করেছিলে, ওই রকম ভাবে যেদিন তুমি অহিংসা ধর্মের দিকে প্রাণমন দিতে পারবে সেই দিনই তোমার দীক্ষা। সেই দিনই তুমি সত্যকার জ্ঞানেব পথে অগ্রসর হবে।'

রত্নদত্ত রাজার উপদেশ শুনে খুশী মনে ঘরে ফিরে গেল। সেদিন থেকে তার সুমতি ফিরে এল।

॥ 'কথাসরিৎসাগব' থেকে ॥



জয়-পরাজয়

মন্ত্রী চাণক্যের কূটবুদ্ধিতে একদিন নন্দবংশ সমূলে উচ্ছেদ হয়ে গেল, মগধের রাজ-সিংহাসনে বসলেন চন্দ্রগুপ্ত।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত রাজা হলে হবে কি, তাঁর বিপদ কাটল না। মহারাজ নন্দের মন্ত্রীর নাম ছিল রাক্ষস। তিনি কিন্তু সহজে ছাড়লেন না। গোপনে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের চারদিকে নানা ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে দিলেন।

প্রথমেই একজন কারিগর দিয়ে এমন একটি তোরণ তৈরী করালেন যে, অভিষেকের দিন চন্দ্রগুপ্ত যেমনি তার তলা দিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে যাবেন অমনি সেটা হুড়মুড় করে চন্দ্রগুপ্তের ঘাড়ে ভেঙে পড়বে। কিন্তু কূট চাণক্য আগে চন্দ্রগুপ্তকে না পাঠিয়ে অন্য আর একজন সামন্ত রাজাকে চন্দ্রগুপ্ত সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাংঘাতিক তোরণ ভেঙে পড়ল তারই ঘাড়ে। ষড়যন্ত্রকারীরাও ধরা পড়ে গেল চাণক্যের গুপ্তচরদের হাতে।

মন্ত্রী রাক্ষস আশা ছাড়লেন না। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চন্দ্রগুপ্তের শোয়ার ঘরের মেঝের তলায় লুকিয়ে রাখলেন কয়েকজন গুপ্ত-ঘাতককে—খাবার-দাবার নিয়ে সেইখানে তারা লুকিয়ে রইল। সুযোগ পেলেই চন্দ্রগুপ্তকে তারা হত্যা করবে। কিন্তু চাণক্যের চোখকে এবারেও ফাঁকি দেওয়া গেল না। চাণক্য দেখতে পেলেন—

মেঝের একটা ফাটল দিয়ে পিঁপড়ের সার বেরিয়ে আসছে মুখে ভাত নিয়ে। আর যাবে কোথায়। চাণক্য বললেন, 'এখানে গুপ্তঘাতক আছে। ঘর বন্ধ করে দাও আগুন লাগিয়ে।'

মন্ত্রী রাক্ষসের গুপ্তঘাতকরা সেইখানে পুড়ে মরল।

মন্ত্রী রাক্ষস তবু হটলেন না। এবার খুব গোপনে নিয়োগ করলেন বিষ-কন্যা। চন্দ্রগুপ্তের পরিচারিকাদের সঙ্গে মিশে থেকে সুযোগ পেলেই সে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে। কিন্তু হায়, কূট চাণক্যের কাছে অমাত্য রাক্ষসের সেখানেও পরাজয় ঘটল। বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের একজন মিত্র রাজা—নাম পর্বতক।

এই ঘটনার পরে মন্ত্রী রাক্ষস আর মগধে থাকতে পারলেন না—চাণক্য এবার হয়তো তাঁকে বন্দী করবেন। তাই তিনি আত্মগোপন করে আর এক মতলব এঁটে চলে গেলেন পর্বতকের ছেলে মলয়কেতুর কাছে। তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করে বললেন, 'কূট চাণক্য তোমার বাবাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। পিতৃহত্যার তুমি প্রতিশোধ নাও।' এই বলে কুমার মলয়কেতুকে তিনি উত্তেজিত করে তুললেন।

ওদিকে মগধে চাণক্যও রটিয়ে দিলেন, 'অমাত্য রাক্ষসই রাজা পর্বতককে হত্যা করে পালিয়েছে।'

এবার শুরু হল দুই মন্ত্রীর বুদ্ধির লড়াই।

কিন্তু ওদিকে অমাত্য রাক্ষসের রাজা নেই, রাজ্য নেই—তাঁর প্রভুর বংশও একেবারে নির্মূল, তাই কোনোখান থেকে কোনও পুরস্কারেরও আশা নেই। তবু তিনি তাঁর প্রভুর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে চললেন।

তাঁর এই নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি দেখে চাণক্য মুগ্ধ হলেন। মনে মনে বললেন—এমন লোককে দিয়ে যদি একবার চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদ

নেওয়াতে পারি তা হলে চন্দ্রগুপ্ত হবেন অদ্বিতীয় রাজা। কিন্তু রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদ নেবেন কী—তিনি তখন মগধ আক্রমণ করবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছেন। চাণক্যও কম যান না। দুই পক্ষে ঘোরতর বিরোধ।

ক্রোধী বামুনের শেষ পর্যন্ত রাগ চড়ে গেল—চাণক্য তো নয়, স্বয়ং দুর্বাসা। শিখা খুলে দিয়ে চাণক্য প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, "যতদিন না ওই রাক্ষসকে কলে-কৌশলে মন্ত্রীপদে ঢোকাতে পারি ততদিন চাণক্য আর এ শিখা বাঁধবে না।'

লড়াই লাগল অস্ত্রশস্ত্রের নয়—বুদ্ধিশাস্ত্রের। চারদিকে চলে গেল চাণক্যেব চর-অনুচর-গুপ্তচর—নানা বেশে, নানা দেশে।

একদিন চাণক্যের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল একজন যমভক্ত গায়েন—হাতে যমের ছবি আঁকা পট। এসেই গলা ছেড়ে গাইতে আবম্ভ কবে দিলে ঃ

'যম ভজ, যম পূজ, যম কর সার।
যমরাজ প্রাণ লন সব দেবতার ॥
যমেরে পূজিলে বাছা মহা পুণ্য হবে।
ধন ধান্য পরমায়ু বহু কিছু পাবে ॥

চাণক্য উঁকি মেরে দেখলেন—চিনতে পারলেন, এ তাঁরই নিয়োজিত চর নিপুণক। চোখের ইশারা করে তাকে ডাকলেন। লোকটি চারদিকে একবার দেখে নিয়ে সুড়ুৎ করে চাণক্যের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মগধ-রাজমন্ত্রীর ঘর তো নয়, ভাঙা কুঁড়ের দৌলত। ওখানে ঘুঁটে, সেখানে গোবর, ঘরের কোণে জড়ো করা ঝুড়ি ঝাড় কুশ আর আম কাঠ। বামুন পণ্ডিতের টোল। আর দৌবারিক আজ্ঞাবাহক বলতে পণ্ডিত চাণক্যের একটি ছাত্র—নাম তার শার্ঙ্গরব।

চাণক্য জিজ্ঞেস করলেন, 'বল নিপুণক, রাজ্যে কে কে এখনও চন্দ্রগুপ্তের বিরোধী ?'

নিপুণক বললে, 'আজ্ঞে এই যমপট হাতে নিয়ে মানুষজনের ঘরের মধ্যেও অবাধে ঢুকে গেছি। প্রায় সবই জেনে এসেছি—কিছু আর বাকি নেই। এক নম্বর বিরোধী হল জীবসিদ্ধি নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী—যে অমাত্য রাক্ষসকে গোপনে বিষ-কন্যা এনে দিয়েছিল।'

কূট চাণক্য গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন।

জীবসিদ্ধি যে চাণক্যেরই একজন ছদ্মবেশী গুপ্তচর, নিপুণক তা জানে না। কূট চাণক্য নিজের কাজ ঠিক মত চালাবার জন্য গুপ্তচরের পেছনে আবার গুপ্তচব লাগাতেন। যাই হোক, নিপুণকের কথা শুনে চাণক্য কপট ক্রোধে শার্ঙ্গরবকে বললেন, 'নগর-রক্ষীদের বলে এস—ওই বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে যেন নগর থেকে দূর করে দেওয়া হয়।'

নিপুণক বললে, 'দু নম্বর বিরোধী হল, অমাত্য রাক্ষসের বন্ধু শকটদাস নামে একজন কায়স্থ।'

চাণক্য বললেন, 'তারপর ?'

নিপুণক বললেন, 'তিন নম্বর শত্রু—মহাশত্রু, নাম তার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস। অমাত্য রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তাঁব বাড়িতেই বাক্ষস তাঁব স্ত্রী পুত্র সবাইকে বেখে গেছেন। তাঁব বাড়ি থেকে এই আংটিটি পেযেছি। এতে রাক্ষসেব নাম খোদাই কবা আছে।'

আংটিটি হাতে নিয়ে কূট চাণক্য ভাবি খুশী। বললেন, 'এ আংটি তুমি পেলে কি করে ?'

নিপুণক বললে, 'শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসেব বাড়িতে যমের গান গাইতে ঢুকেছিলাম। এমন সময় একটি বছর পাঁচেকের ছেলে ছুটে বাইবে বেরিয়ে এল। তাকে ধরবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটে এলেন একজন মাননীয়া মহিলা। তাঁর আঙুল থেকেই হঠাৎ আংটিটা খুলে পড়ল। তাঁর আঙুলে আংটিটা বোধ হয় খুব ঢিলে ছিল। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। রাক্ষসের নামাঙ্কিত দেখে আমি আংটিট কুড়িয়ে নিয়ে সরে পড়লাম।'

চাণক্য বললেন, 'এর জন্য পুরস্কার তুমি যথা সময়েই পাবে—এখন যাও।'

নিপুণককে বিদায় করে দিয়ে রাক্ষসের নামাঙ্কিত আংটিটি নিয়ে চাণক্য ভাবতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, 'এই আংটি আর তোমার ওই দুই বন্ধু শকটদাস আর চন্দনদাস—ওদের দুজনকে দিয়েই তোমায় আমি হার মানাব অমাত্য রাক্ষস।'

তারপর কূট চাণক্য শার্ঙ্গরবকে ডেকে বললেন, 'যাও তো বাপু, গুপ্তচর সিদ্ধার্থককে ডেকে আন।'

সিদ্ধার্থক এসে হাজির হল।

চাণক্য তাকে একখানা চিঠি লিখে আনতে পাঠালেন কায়স্থ শকটদাসের কাছ থেকে। চিঠিতে কি লিখতে হবে বলে দিলেন। আর সাবধান করে দিলেন, 'খবরদার, আমি পাঠিয়েছি—এ কথা শকটদাস যেন কোনও রকমে না জানতে পারে। কে কাকে লিখছে—এসব লেখবার কোনও দরকার নেই।'

দলিল-পত্র চিঠি লেখা কায়স্থ শকটদাসের জীবিকা। সেকালে কায়স্থদেব এই ছিল কাজ। শকটদাস সোজা সরল মনে চিঠিখানি লিখে দিলে—তার মনে কোনও সন্দেহই হল না। কারণ চিঠিতে কারুর নাম-ধামই নেই। শুধু এই খবরটুকু আছে যে—কোন্ কোন্ রাজা সন্ধি করতে চায়—প্রতিদানে কেউ চায় হাতী, কেউ অর্থ, কেউ বা চায় মণিমানিক। তাতে আর শকটদাসের কি!

কিছুক্ষণের মধ্যেই চিঠিখানি লিখিয়ে এনে সিদ্ধার্থক আবার এসে হাজির হল। চাণক্য নিজে চিঠির ওপরে অমাত্য রাক্ষসের নাম খোদাই করা আংটির ছাপ দিয়ে দিলেন।

তার পরে চিঠিখানি সিদ্ধার্থকের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই চিঠিখানি খুব সাবধানে রাখবে। এখন শকটদাসকে নিয়ে তোমায় পালাতে হবে রাক্ষসের আশ্রয়ে। শকটদাসের এখুনি প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হবে। বুঝেছ?'

সিদ্ধার্থক বললে, 'বুঝেছি ঠাকুর। কিন্তু রাক্ষসের আশ্রয়ে গিয়ে আমার কি করতে হবে ?'

চাণক্য বললেন, 'বিশেষ মিত্রভাবে থাকবে। বন্ধু শকটদাসকে রক্ষা করেছ বলে যদি রাক্ষস কোনও পারিতোষিক দেয় তো তা রাক্ষসের নামে মুদ্রাঙ্কিত করে তাঁরই ভাণ্ডারে রেখে দেবে।'

সিদ্ধার্থক বললে, 'কত দিন থাকতে হবে ঠাকুর ?'

চাণক্য বললেন, 'খবর পেয়েছি, রাক্ষস আর মলয়কেতু এক সঙ্গে মিলে পাটলীপুত্র আক্রমণ করতে আসছে। যখন ওরা আমাদের খুব কাছাকাছি এসে পড়বে তখনই পালিয়ে আসবার চেষ্টা করবে। কিন্তু—'

সিদ্ধার্থক শুধোলে, 'কিন্তু কি ঠাকুর ?'

কূট চাণক্য বললেন, 'পালাবার সময় এই চিঠি সমেত মলয়কেতুর লোকের হাতেই তোমাকে চেষ্টা করে ধরা পড়তে হবে। তা হলেই কার্যোদ্ধার। পারবে ?'

সিদ্ধার্থক কূট চাণক্যের পাকা গুপ্তচর। হেসে বললে, 'পারব না কেন ঠাকুর ?'

কুটিল চাণক্যের জটিল রাজনীতি। নানা রকম আদেশ নির্দেশ পরামর্শ নিয়ে গুপ্তচর সিদ্ধার্থক বিদায় হল। তারপর ডাক পেয়ে হাজির হল ভাগুরায়ণ নামে একজন বিশিষ্ট রাজপারিষদ ও কয়েকজন সামন্ত রাজা। চাণক্য তাঁদেরও নানা উপদেশ নির্দেশ দিয়ে বিদায় করলেন। শেষকালে শার্ঙ্গরবকে ডেকে বললেন, 'শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে ডেকে আন দেখি বাপু।'

ওদিকে চাণক্যের ডাক শুনেই রাক্ষসের বন্ধু চন্দনদাস বুঝতে পারলেন—এবার আর নিস্তার নেই। প্রিয় বন্ধু রাক্ষসের পরিজনেরা যে তাঁর বাড়িতেই আছে, কূট চাণক্য নিশ্চয়ই এ খবর কোনও রকমে জানতে পেরেছে। চন্দনদাস তখন তাড়াতাড়ি অন্য একজন বণিকের হাতে রাক্ষসের স্ত্রীপুত্রদের ভার দিয়ে চাণক্যের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

দেখা তো নয়—সাক্ষাৎ মৃত্যু।

চাণক্য চন্দনদাসকে বললেন, 'শেঠজী, তোমার বাড়িতে রাক্ষসের পরিজনেরা আছে—আমার হাতে তাদের সমর্পণ কর।'

চন্দনদাসের বুক কেঁপে উঠল। বললেন, 'তারা তো আমার বাড়িতে নেই। এক সময়ে ছিল বটে।'

চাণক্য ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি ভাল করেই জান, তারা কোথায়। হয় তাদের ধরে দাও—নয় তো তোমার পরিজনেরা আটক পড়বে।'

ঠিক এই সময়ে রাজপথে ভয়ানক একটা গোলমাল শোনা গেল। চাণক্য শার্ঙ্গরবকে শুধোলেন, 'কিসের গোলমাল বাপু?'

শার্ঙ্গরব বললে, 'রাজদ্রোহের অপরাধে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে নগর থেকে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে আর কায়স্থ শকট দাসকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে।'

চাণক্য চন্দনদাসের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'শুনছ তো শেঠজী, রাজদ্রোহের কি শাস্তি। এখন রাক্ষসের স্ত্রীপুত্রকে আমার হাতে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাও। বল তারা কোথায় আছে।'

চন্দনদাস সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমাব বাড়িতে তারা যদি থাকতও তবু আমি তাদের সমর্পণ কবতাম না। আমার প্রাণের মূল্য এমন কিছু বেশী নয়। মরতে আমি প্রস্তুত।'

মনে মনে চাণক্য সাধুবাদ দিলেন—ধন্য চন্দনদাস, অমাত্য রাক্ষসের যোগ্য নিঃস্বার্থ বন্ধু তুমি! মতলব ঠিক করলেন, এই শ্রেষ্ঠীর জীবন দিয়েই অমাত্য রাক্ষসকে হাতের মুঠোয় আনতে হবে। প্রকাশ্যে শার্ঙ্গরবকে কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'দুর্গপালকে আমার নাম করে গিয়ে বল—শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে যেন সপরিবারে কারারুদ্ধ করা হয়। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয়ই ওর প্রাণদণ্ডের আদেশ করবেন।'

চাণক্য কঠোর হাতে চন্দ্রগুপ্তের শত্রুদের দমন করতে লাগলেন। সমস্ত মানুষ ভয়ে জড়সড়।

তারপর দেখতে দেখতে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল নানা দুঃসংবাদ। কোলাহল উঠল নগর-রক্ষীদের মধ্যে, সেনাবারিকে পড়ে গেল সাজ-সাজ রব। চন্দ্রগুপ্তের গুপ্তশত্রুরা সব ধরা পড়েও পড়ল না—অদ্ভুত ভাবে চাণক্যের হাত এড়িয়ে পালাতে লাগল। নগরীর মানুষ শুনে বিস্ময়ে হতবাক। তারা ভাবলে—এবার শুরু হল বুঝি চাণক্যের পরাজয়—অবনতি! রাস্তার মোড়ে মোড়ে তারা নানা কথার জটলা পাকিয়ে তুললে, নগর-রক্ষীরা তাদের তাড়া করতে লাগল।

গোলমাল শুনে চাণক্য বললেন, 'শার্ঙ্গরব, দেখতো কিসের গোলমাল।'

শার্ঙ্গরব ভয়ে ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে, শকটদাসের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা ছিল কিন্তু সিদ্ধার্থক তাকে ঘাতকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।'

মনে মনে চাণক্য খুশী হলেন—যাক, তাঁর পরিকল্পনা মত তা হলে এবার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু মুখে কপট ক্রোধে বললেন, 'কী সিদ্ধার্থকের এত বড় সাহস! যাও, ভাগুরায়ণকে খবর দাও—ওই পাষণ্ড সিদ্ধার্থককে যেন ধরে আনে।'

কিন্তু নগর-রক্ষীরা কিছুক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে এসে খবর দিলে, 'সেই বিশ্বাসঘাতক ভাগুরায়ণও কোথায় পালিয়েছে।'

কপট ক্রোধে চাণক্য আবার বললেন, 'বটে! যাও—আমার নাম করে ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, বলগুপ্ত, রাজসেন—এই সব সামন্ত রাজাদের গিয়ে বল, ভাগুরায়ণকে যেন ধরে আনে।'

কিছুক্ষণ বাদে নগর-রক্ষীরা ছুটতে ছুটতে চাণক্যের পায়ে এসে পড়ল। বললে, রক্ষা কর ঠাকুর—আমাদের কোনও দোষ

নেই। এ ঘোর ষড়যন্ত্র! সামন্ত রাজারাও সব রাতারাতি কোথায় পালিয়েছে।'

চন্দ্রগুপ্তের অনুরাগীরা হায় হায় করতে লাগল—গেল বুঝি রাজা, গেল বুঝি রাজ্যপাট! এত সব কাণ্ডের পরে রাজা চন্দ্রগুপ্তও বোধ করি বিচলিত হয়ে উঠলেন। পণ্ডিত চাণক্যকে ডেকে তিনি কৈফিয়ৎ তলব করে বসলেন, 'কেমন করে এরা সব পালাল—আমাকে বুঝিয়ে দিন। শেষ পর্যন্ত সেই নন্দমন্ত্রী রাক্ষসের ষড়যন্ত্র সার্থক হবে!'

পণ্ডিত চাণক্য অভিমান ভরে বললেন, 'কী, সামান্য ভৃত্যের মত তোমার কাছে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে!' দেখতে দেখতে দুর্বাসা পণ্ডিত রাগে কাঁপতে লাগলেন। উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমার চেয়ে তুমি সেই রাক্ষসকে যদি শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলে মনে কর তা হলে তাঁকেই দাও তোমার মন্ত্রীগিরি। এই আমি তোমার মন্ত্রীগিরি ছাড়লুম।' এই বলে তিনি মন্ত্রীর দণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। তারপর রাক্ষসকে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেলেন।

চাণক্য পণ্ডিতের রাগারাগি চেঁচামেচিতে রাজপুরীর সবাই জেনে গেলে—চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বিরোধ বেধে গেছে। দেখতে দেখতে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে। সবাই বলাবলি করতে লাগল—'রাজ্যপাট মন্ত্রীগিরি ছেড়ে চাণক্য এবার তপোবনে চলে যাবেন।'

ওদিকে এই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গুপ্তচরেরা পাটলীপুত্র থেকে নানা খবরের বোঝা নিয়ে ছুটল তাঁর কাছে। অমাত্য রাক্ষস তখন কুমার মলয়কেতুর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর সমগ্র সেনাবল নিয়ে পাটলীপুত্র আক্রমণের তোড়জোড় করেছেন—আর ছটফট করছেন গুপ্তচরদের খবরের জন্য।

এমন দিনে একজন সাপুড়ে অমাত্য রাক্ষসের বাড়ির সামনে এসে দ্বাররক্ষীদের ধরে পড়লে—অমাত্য রাক্ষসকে সে সাপ খেলা দেখাবে!

রাক্ষসের একজন পার্শ্বচর প্রিয়ংবদক শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হল রাক্ষসের সামনে। সাপুড়েকে দেখেই রাক্ষস চিনতে পারলেন—এ যে তাঁরই নিয়োজিত গুপ্তচর। প্রিয়ংবদককে রাক্ষস বললেন, 'আমি এখন একটু সাপ খেলা দেখব—মাথার ভার হালকা করতে চাই। যাও—বাইরে গিয়ে পাহারা দাওগে, এখন কেউ যেন না এসে আমাকে বিরক্ত করে।' এই বলে প্রিয়ংবদককে তিনি বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সাপুড়েকে বললেন, "তারপর সখা বিরাধগুপ্ত—এবার পাটলীপুত্রের সংবাদ বল।'

সাপুড়ের ছদ্মবেশী বিরাধগুপ্ত বললে, 'জীবসিদ্ধি নামে সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে চাণক্য মগধ থেকে বিতাড়িত করেছে, আর আমাদের বন্ধু চন্দনদাসকে সপরিবারে বন্দী করেছে, আর শকটদাসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়েছে।'

অমাত্য রাক্ষস 'হায় হায়' করে উঠলেন, বললেন, 'আমার এমন বন্ধুদের আমি রক্ষা করতে পারলুম না। আমার দুর্ভাগ্য!'

বিরাধগুপ্ত বললে, 'এই সব ব্যাপারে ভীত ও বিরক্ত হয়ে রাজপারিষদ ভাগুরায়ণ ও কিছু সামন্ত-রাজা রাতারাতি পালিয়ে গিয়ে কুমার মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে।'

রাক্ষস মুহূর্তে খুশী হয়ে বললেন, 'এ তো খুব আনন্দের খবর বন্ধু। এবার তা হলে চন্দ্রগুপ্তের অবনতি আরম্ভ হয়েছে '

বিরাধগুপ্ত বললে, 'বোধ হয় তাই। চন্দ্রগুপ্ত কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন চাণক্যের কাছে, তাতে চাণক্য রেগে চলে এসেছেন। শুনেছি—এবার সব ছেড়ে কূটবুদ্ধি পণ্ডিত নাকি তপোবনে চলে যাবেন।'

রাক্ষস সোল্লাসে বললেন, 'খুব ভালো খবর। সখা বিরাধগুপ্ত তুমি আবার যাও পাটলীপুত্রে—এক্ষুনি। চন্দ্রগুপ্তের বৈতালিকদের মধ্যে কলস নামে আমার একজন লোক আছে, সে কবিও বটে। রাজাকে শোনাবার জন্য তাকে এমন সব কবিতা বা গান

লিখতে বল যাতে মন্ত্রীসর্বস্ব রাজার খুব নিন্দে থাকে। বুঝতেই পারছ—এই সুযোগে আমাদের চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধ বাধিয়ে দিতে হবে।'

উত্তেজিত অমাত্য রাক্ষস সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

এমন সময় প্রিয়ংবদক এসে খবর দিল—সিদ্ধার্থক নামে একটি লোক শকটদাসকে উদ্ধার করে নিয়ে হাজির হয়েছে।

রাক্ষস আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, 'ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। যাও যাও—তাঁকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে এস।'

শকটদাসকে নিয়ে হাজির হল সিদ্ধার্থক। শকটদাস বললে, 'ঘাতকের হাত থেকে এই বন্ধুটি আমাকে প্রায় ছিনিয়ে এনেছে।'

'আপনার এ উপকারের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আজ আমার নেই।'—এই বলে অমাত্য রাক্ষস কিছু বহুমূল্য বসন ভূষণ সিদ্ধার্থককে উপহার দিয়ে দিলেন। এ বসন ভূষণগুলি তিনি সেই-দিনই কুমার মলয়কেতুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

উপহার পেয়ে সিদ্ধার্থক চাণক্যের উপদেশ মত একান্ত বিনীত ভাবে বললে, 'আপনার এ বহুমূল্য পুরস্কার নিয়ে আমি আর কোথায় যাব! চাণক্য পণ্ডিতের লোকের হাতে ধরা পড়লে আমার প্রাণ যাবে। বরং এগুলো আপনার মুদ্রার ছাপ দিয়ে আপনার ভাণ্ডারেই রেখে দিতে বলুন। যখন দরকার হবে ভাণ্ডার-রক্ষীর কাছ থেকে চেয়ে নেব। আর আপনি যদি আমাকে আশ্রয় দেন তো বড় উপকৃত হব।'

রাক্ষস সানন্দে সম্মতি দিলেন। বললেন, 'তোমার মত উপকারী বন্ধু আমার আশ্রয়ে থাকবে—এ আমার সৌভাগ্য।'

এমন সময় প্রিয়ংবদক এসে বললে, 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিও পাটলীপুত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে এসেছেন।'

রাক্ষস বললেন, 'তাঁকেও আশ্রয় দাও।'

প্রিয়ংবদক আবার কিছুক্ষণ বাদে এসে বললে, 'একটি অচেনা লোক কিছু পুরানো গয়না বেচতে এসেছে। ভারি অভাবে পড়েই এসেছে, বলছে, একটা কিছু পেলেই সে খুশী।'

রাক্ষস বললেন, 'কই গয়নাগুলো নিয়ে এস দেখি।'

প্রিয়ংবদক গয়না আনলে। রাক্ষস সেগুলো দেখে বললেন, 'ওঃ, এ যে সব বহুমুল্য অলঙ্কার দেখছি! এগুলো বেখে ওকে দাম দিয়ে দাও—ও যা চায়।'

দাম পেয়ে গয়না বেচতে আসা লোকটি দ্রুত সরে পড়ল। সেও যে চাণক্যের চব—এ কথা রাক্ষস ঘুণাক্ষবেও জানতে পাবলেন না। বরং বিবাধগুপ্তের মুখ থেকে শত্রুপক্ষের ভাঙনের খবর পেয়ে তিনি আনন্দিত। কুমাব মলয়কেতুকে মনের আনন্দে খবর পাঠালেন, 'এবার পাটলীপুত্র আক্রমণেব উদ্যোগ করুন। শত্রুপক্ষের মধ্যে ভাঙন দেখা গিয়েছে।'

হৈ হৈ করে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধেব আযোজন। হাতীব পাল সেজে দাঁড়াল—যেন কালো পাহাড। সেনানী সেজে দাড়াল—যেন সমুদ্র। মলয়কেতুর সৈন্যসামন্ত কম নয়—তার সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ ছেড়ে আসা কয়েকজন সামন্ত-বাজা। সব মিলে এক বিরাট বাহিনী—এগিয়ে চলল পাটলীপুত্রের দিকে।

যুদ্ধের সময়ে অযোদ্ধারা চিরকাল ভয়ে শিবির ছেড়ে পালায়। আর সেই সময়েই হয় যত গুপ্তচরের দৌরাত্ম্য। কুমার মলয়কেতু তাই হুকুম জারি করে দিলেন—ছাড়পত্র ছাড়া কেউ শিবির ছেড়ে যেতে পারবে না।

কিন্তু এই রাজশিবিরের হুকুম অমান্য করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সিদ্ধার্থক আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি। কুমার মলয়কেতুর কাছে শিবিব-রক্ষী আগে ধরে নিয়ে এল সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে।

কুমার মলয়কেতুর পাশে তখন পরম মিত্রের মত বসেছিল চন্দ্রগুপ্তের সেই পলাতক পারিষদ ভাগুরায়ণ। পাটলীপুত্র থেকে সে ও কয়েকজন সামন্ত-রাজা রাতারাতি পালিয়ে এসে মলয়কেতুর আশ্রয় নিয়েছে এবং বিশ্বাসভাজনও হয়ে উঠেছে। কুমার মলয়কেতু তাদের খুবই বিশ্বাস করেন এবং যুদ্ধের আয়োজনে তারা তাঁর বড় শক্তি।

জীবসিদ্ধিকে দেখে মলয়কেতুর পাশ থেকে ভাগুরায়ণ বলে উঠল, 'কি সন্ন্যাসী ঠাকুর, এতদিন অমাত্য রাক্ষসের আশ্রয়ে থেকে আবার কি পাটলীপুত্রে ফিরে চললেন ?'

'না—আর কোনও রাজার আশ্রয়ে নয়।' জীবসিদ্ধি বললে, 'অনেক পাপ করেছি—এবার লোকালয় ত্যাগ করব।'

ভাগুরায়ণ খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সন্ন্যাসীর আবার কি পাপ ঠাকুর ?'

চাণক্যের উপদেশ স্মরণ করে জীবসিদ্ধি একবার কুমার মলয়কেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে গড় গড় করে বলে গেল, 'অমাত্য রাক্ষস আমার পরম মিত্র ছিল—তাকে বিষ-কন্যা আমিই এনে দিয়েছিলাম, যার দ্বারা কুমারের বাবা রাজা পর্বতক মারা যান। এখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি।'

কুমার মলয়কেতু শিউরে উঠে বললেন, 'কী, আমার বাবাকে তাহলে মেরে ফেলেছেন অমাত্য রাক্ষস ! হায়, এও সম্ভব ?'

এমন সময় আর এক প্রতিহারী সিদ্ধার্থককে এনে খাড়া করলে। বললে, 'এর কাছে অমাত্য রাক্ষসের নামাঙ্কিত একটা চিঠি আর কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এও ছাড়পত্র না দেখিয়ে পালাচ্ছিল।'

ভাগুরায়ণ গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'অমাত্য রাক্ষসের কি চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলে দেখি। কার কাছে যাচ্ছিলে ?'

সিদ্ধার্থক চটপট করে চিঠিখানি এগিয়ে দিয়ে চাণক্যের শেখানো কথাগুলি বলে গেল গড়গড় করে, 'মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে। অমাত্য রাক্ষস আমাকে পাঠাচ্ছিলেন।'

'শত্রু চন্দ্রগুপ্তের কাছে অমাত্য রাক্ষসের চিঠি।' কুমার মলয়কেতু বিস্ময়ে স্তব্ধ। ভাগুরায়ণকে বললে, 'দেখতো বন্ধু, কি চিঠি।'

ভাগুরায়ণ চিঠি পড়ে শোনালে। চিঠিটা এই রকম :

'স্বস্তি ॥ কোনও স্থান হইতে কোনও ব্যক্তি কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে যথাস্থানে এই কথা অবগত করিতেছে ॥ যে সব বন্ধুগণের সহিত আপনার সন্ধির কথা হইয়াছিল আশা করি তাহা রক্ষা করিবেন ॥ আমাদের এই বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের শত্রুর রাজকোষ প্রার্থী ॥ কেহ হস্তী কেহবা বিষয়াদি ॥ শত্রুর সহিত যৎকিঞ্চিৎ রাজসম্মান নিবেদন করিলাম—গ্রহণ করিবেন ॥ আপনার তিনখানি অলঙ্কার উপহার পাইয়া ধন্য হইয়াছি ॥ সমস্ত কথা সিদ্ধার্থকের মুখেই শুনিবেন ॥

কুমার মলয়কেতু রাগে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, 'শেষকালে অমাত্য রাক্ষসের ষড়যন্ত্র! বিশ্বাসঘাতক! বিষ-কন্যা দিয়ে সে আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, আবার আমাদের সর্বনাশ করতে চায়?'

ভাগুরায়ণ তাঁকে শান্ত করে বললে, 'থামুন কুমার—দেখা যাক, এ লোকটার কাছ থেকে আরও সাংঘাতিক কিছু জানতে পারা যায় কিনা?' তারপর সিদ্ধার্থককে বললে, 'খোল তোমার পুঁটুলি, দেখি কি আছে।'

পুঁটুলি খুলে দেখা গেল—তাতে আছে মলয়কেতুর বহুমূল্য বসন ভূষণ। কুমার মলয়কেতু এগুলি বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে রাক্ষসকে উপহার দিয়েছিলেন। আবার অমাত্য রাক্ষসও কায়স্থ শকটদাসের উদ্ধারকর্তা সিদ্ধার্থককে মনের আনন্দে দান করে দিয়েছিলেন।

মলয়কেতু শুধালেন, 'এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

সিদ্ধার্থক অম্লান বদনে বলে দিলে, 'মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিবেদন করতে।'

মলয়কেতু রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কী, আমার বন্ধুত্বের উপহার সেই বিশ্বাসঘাতক রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিবেদন করতে পাঠিয়েছে। উঃ।'

ভাগুরায়ণ আরও খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কোন্ কোন্ রাজা রাক্ষসের সঙ্গে যোগ দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়—বল।'

সিদ্ধার্থক গড় গড় করে প্রায় মুখস্থ বলে গেল, 'আজ্ঞে—ভদ্রভট্ট, পুরুষদত্ত, বলগুপ্ত, রাজসেন। প্রথম দুজন চায় কুমারের বিষয়সম্পত্তি, বলগুপ্ত চায় রাজকোষ, রাজসেন—হাতী।'

ভাগুরায়ণ জিজ্ঞেস করলে, 'অমাত্য রাক্ষস আর কি বলে পাঠিয়েছেন?'

সিদ্ধার্থক কপট বিনয়ে বললে, 'অমাত্য রাক্ষস বলেছেন—আপনি যেমন সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ চাণক্যকে বিতাড়িত করে আমার প্রীতি উৎপাদন করেছেন তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ।'

ভাগুরায়ণ একটু মৃদু হেসে মলয়কেতুকে বললে, 'কুমার, এ যেন মনে হচ্ছে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বের দিকেই অমাত্য রাক্ষসের লোভ। আসলে শত্রুতা চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নয়, শত্রুতা চাণক্যের সঙ্গে। তার জন্যই আপনাকে এই বিপদের মুখে কৌশলে টেনে এনেছেন।'

'ঠিক।' মলয়কেতু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে হুকুম দিলেন, 'ধরে আন রাক্ষসকে।'

অমাত্য রাক্ষস এলেন—শান্ত প্রাজ্ঞ ভাল মানুষটি। রাজকুমারের কাছে আসতে হলে যোগ্য বসন ভূষণ চাই! তাই তিনি পরে এসেছেন হাতে বালা বাজু, কানে কুণ্ডল। এই বহুমূল্য পুরানো অলঙ্কারগুলি একদিন তিনি চাণক্যের পাঠানো গুপ্তচরের কাছ থেকেই কিনেছিলেন। রাক্ষস সামনে এসে দাঁড়াতেই মলয়কেতুর চোখে পড়ল প্রথমে—অলঙ্কারগুলি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ জ্বলে উঠল বাঘের মত। হায়, এ অলঙ্কার যে তাঁর বাবার—নিহত রাজা পর্বতকের। মলয়কেতু লাফ দিয়ে উঠলেন।

ভাগুরায়ণ তাঁকে থামিয়ে রাক্ষসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি সিদ্ধার্থককে চন্দ্রগুপ্তের কাছে কেন পাঠাচ্ছিলেন?'

'আমি!' অমাত্য রাক্ষস যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'এ মিথ্যা কথা।'

ভাগুরায়ণ বললে, 'এ চিঠিতে কি লিখেছেন?'

অমাত্য রাক্ষস অবাক—চিঠির বিষয় তিনি কিছুই জানেন না।

ভাগুরায়ণ বললে, 'এ চিঠির লেখাটা কার হাতের?'

রাক্ষসের মুখ শুকিয়ে গেল—হাতের লেখা যে তাঁরই প্রিয়বন্ধু কায়স্থ শকটদাসের। রাক্ষস বলে উঠলেন, 'এ ষড়যন্ত্র—চাণক্যের ষড়যন্ত্র। হায়, প্রিয় বন্ধু শকটদাসও কি চাণক্যের গুপ্তচর? না এ জাল চিঠি!'

ভাগুরায়ণ রাক্ষসের মুদ্রার ছাপ দেখিয়ে বললে, 'বলতে চান—এটাও কি তবে জাল!'

রাক্ষস ক্রোধে ক্ষোভে নিজের মাথার চুল টানতে লাগলেন। বললেন, 'এ ষড়যন্ত্র—কুটিল চাণক্যের ষড়যন্ত্র!'

ভাগুরায়ণ বিদ্রূপ করে বললে, 'চাণক্যের ষড়যন্ত্র—না কুমার মলয়কেতুর বিরুদ্ধে অমাত্য রাক্ষসের ষড়যন্ত্র?'

রাক্ষস স্তব্ধ।

মলয়কেতু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে অলঙ্কার পরেছেন—তা আপনি কোথায় পেলেন?'

রাক্ষস বললেন, 'একদিন একটা লোক এসেছিল বিক্রি করতে—আমি তার কাছ থেকে কিনেছি।'

মলয়কেতু বললেন, 'মহারাজ পর্বতকের অলঙ্কার এতই সস্তা যে, রাস্তার লোক তা ফিরি করে বেড়ায়! মিথ্যাবাদী—বিশ্বাসঘাতক! বিষ-কন্যা প্রয়োগ করে তুমিই আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ। আর ঢাকতে পারবে না। যে তোমার বিষ-কন্যা এনে দিয়েছিল—সে ওই তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে—দেখ।

অমাত্য রাক্ষস ফিরে দেখলেন—ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি। রাক্ষস চীৎকার করে উঠলেন, 'ওঃ, এও চাণক্যের গুপ্তচর! হায় বিধি!'

চারিদিকে সাক্ষী প্রমাণ সব খাড়া। তার মধ্যে হতাশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অমাত্য রাক্ষস। বুঝলেন—এ সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র জাল থেকে তাঁর উদ্ধার নেই।

মলয়কেতু রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'পদলোভী মন্ত্রী, যাও—চাণক্যই তোমার একমাত্র শত্রু, সে আজ বুঝেছি। বিশ্বাস-ঘাতক—চিরদাস। যাও, চন্দ্রগুপ্তের দাসত্ব করগে। আমি তোমাকে সুহৃদের সম্মান দিয়েছিলাম, সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলাম—তা তোমার পছন্দ হল না। দূর হয়ে যাও আমার চোখের সুমুখ থেকে—তোমার প্রাণ নিতেও আমার ঘৃণা হয়।'

অসহায় অমাত্য রাক্ষস—এতদিনে আজ সঙ্গহীন, বন্ধুহীন, সম্বলহীন। আস্তে আস্তে তিনি মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেলেন রাজ-শিবির থেকে অপমানের বোঝা নিয়ে। কেউ তাঁর পথ রোধ করলে না। বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকালেন—চোখের কোণে লাঞ্ছনার অশ্রু নেমে এল। সন্ধ্যা তখন ঘন হয়ে আসছে। অসহায় রাক্ষস সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন পাটলী-পুত্রের দিকে—যেখানে তাঁর অবশিষ্ট একমাত্র প্রিয় বন্ধু চন্দনদাস সপরিবারে কারারুদ্ধ হয়ে আছেন, সেখানে তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিজন কার আশ্রয়ে আছে কে জানে। রাক্ষস এগিয়ে চললেন।

এদিকে মলয়কেতু সেনাপতিদের হুকুম দিলেন, 'পাটলীপুত্র আক্রমণে আজই অগ্রসর হও।'

ভাগুরায়ণ হেসে বললে, 'কাকে আক্রমণ করবেন কুমার? মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশে আপনি শিবিরেই বন্দী। আর এক পা নড়বেন না।'

'তুমি—তুমি—ভাগুরায়ণ!' মলয়কেতু চীৎকার করে উঠলেন, 'তুমিও সেই কুটিল চাণক্যের গুপ্তচর! হায় বিধি!'

মারামারি নেই, কাটাকাটি নেই—পণ্ডিত চাণক্যের একটা যুদ্ধ জয় হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু আর একটা। সে হল রাক্ষসকে দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব নেয়ানো।

চাণক্যের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত অমাত্য রাক্ষস সহায় সম্বল হীন হয়ে আবার ফিরে এলেন পাটলীপুত্রে। চাণক্য ঠাকুরের গুপ্তচর সর্বত্র। অমাত্য রাক্ষসকে তারা দেখতে পেয়েই খবর দিল চাণক্যকে, 'ঠাকুর, তিনি পাটলীপুত্রে এসেছেন। এসেই নানা জনের কাছে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের খোঁজ খবর করছেন।'

চাণক্য মনে মনে বললেন, 'জানি সেই বন্ধুবৎসল আসবেন।' চরদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা চারদিকে রটিয়ে দাও—আজই চন্দনদাসকে মশানে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হবে। অমাত্য রাক্ষসের কাছে কেউ ছদ্মবেশে গিয়ে খবরটা জানিয়ে এস এবং চন্দনদাসকে মশানে নিয়ে যাও।'

চররা ছুটল আবার কাজের নির্দেশ পেয়ে।

ওদিকে বন্ধু চন্দনদাসের প্রাণদণ্ডের খবর পেয়ে রাক্ষস মশানে এসে হাজির হলেম। চণ্ডালরা তখন চন্দনদাসকে হত্যা করতে উদ্যত।

রাক্ষস ছুটে গিয়ে বললেন, 'ওঁকে মেরো না। দোহাই তোমাদের। তোমাদের সেই কুটিল নিষ্ঠুর চাণক্যকে গিয়ে বল—যার জন্য মহাত্মা চন্দনদাসের জীবন নিতে চাচ্ছ—সেই হতভাগ্য রাক্ষস এসে হাজির হয়েছে। আমার জীবন নাও।'

চন্দনদাসের চোখে জল। বললে, 'না না বন্ধু—আমাকে মরতে দাও।'

ঘাতক দু'জন চোখ টেপাটেপি করে বললে, 'ওরে, অমাত্য রাক্ষসকে ধর। আমি চাণক্য ঠাকুরকে খবরটা দিই।'

খবর পেয়ে ছুটে এলেন চাণক্য ঠাকুর, ছুটে এলেন স্বয়ং মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্যের চোখের ইঙ্গিতে ঘাতকরা চন্দনদাসকে নিয়ে চলে গেল।

চাণক্য রাক্ষসকে বললেন, 'তুমি কি সত্যিই চন্দনদাসের জীবন-ভিক্ষা চাও ?'

রাক্ষস সরোষে বললেন, 'সে বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ আছে ? তুমি জটিল নিষ্ঠুর—বন্ধুত্ব ও প্রীতির তুমি কিছুই জান না।'

চাণক্য চটলেন না—হাসলেন। হেসে বললেন, 'তুমি এখনও যেন কথায় কথায় লড়াই করছ বন্ধু। শোন, তুমি সত্যিই যদি চন্দনদাসের জীবন ফিরে পেতে চাও—তা হলে আমার এই মন্ত্রীগিরির দণ্ডটি তোমার হাতে তুলে নিতে হবে।'

রাক্ষস বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তার মানে ?'

চাণক্য বললেন, 'তোমার যোগ্যপদ তুমি গ্রহণ কর—আমাকে এবার ছুটি দাও। তোমার বন্ধুত্ব আজ কামনা করছি।'

রাক্ষস বললেন, 'তুমি কুটিল। তোমার ছলনা বুঝি না—বিশ্বাস করি না! তোমার ও-শাস্ত্রের আমি অযোগ্য।'

চাণক্য হেসে বললেন, 'প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ মন্ত্রী কতখানি অযোগ্য—সে আমিও জানি। তুমি এই মন্ত্রীর দণ্ড গ্রহণ না করলে চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা হবে না।'

রাক্ষস কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন চাণক্যের মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমার মন্ত্রীপদ আমি নেব! এ কি সত্যি! তুমি কি সত্যিই তাই চাও চাণক্য ?'

'তাই চাই বন্ধু—প্রাণ ভরে তাই চাই।' চাণক্য রাক্ষসের দুটি হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'দেখ তোমার সঙ্গে লড়াই করে করে সেনাবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তাদের রাতের ঘুম নেই, দিনের বিশ্রাম নেই—কখন কি হয়। ক'মাসে হাতী ঘোড়াগুলো সব রোগা হয়ে গেছে। তোমার শত্রুতায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন টলোমল। এখন একমাত্র তোমার প্রেমেই তা হতে পারে সুদৃঢ়—ভারতের অদ্বিতীয় রাজ-সিংহাসন। আজ তোমার আমি প্রেম চাই বন্ধু।'

রাক্ষস সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন এই রহস্যময় শীর্ণকায় ব্রাহ্মণটির দিকে।

চাণক্য আবার বললেন, 'গ্রহণ কর ভাই মন্ত্রিত্বের দণ্ড, প্রাণ রক্ষা কর তোমার একান্ত বন্ধু চন্দনদাসের, সুদৃঢ় কর মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ-সিংহাসন, ভুলে যাও পুরানো বিরোধ।'

চাণক্যের কথায় যে আবেদন ছিল তাকে অমাত্য রাক্ষস আর অস্বীকার করতে পারলেন না। আস্তে আস্তে অধোবদনে তিনি বললেন, 'দাও—তবে দাও তোমার মন্ত্রিত্বের দণ্ড।'

চাণক্য আনন্দে রাক্ষসের হাতে মন্ত্রিত্বের দণ্ডটি তুলে দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে বললেন, 'মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, প্রাজ্ঞ মন্ত্রী আজ তোমার সচিব পদ গ্রহণ করেছেন। আর তোমার ভয় নেই—ভাগ্য তোমার সুপ্রসন্ন। রাজ্যে প্রচার করে দাও—আজ থেকে অমাত্য রাক্ষসই সব কিছু পরিচালন করবেন। আমারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল—এখন মুক্ত শিখাটিতে গেরো লাগাই।'

সারা মগধ জুড়ে তখন আবার নতুন করে উৎসবের বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠল।

॥ 'মুদ্রারাক্ষস' থেকে ॥



বন্ধুবিচ্ছেদ

এক সময়ে সুদর্শন নামে এক রাজা পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব করতেন। যেমন ছিল রাজার খ্যাতি-প্রতিপত্তি—তেমনি ছিল তাঁর অগাধ ধনদৌলত। হাতীশালে কত হাতী, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া—কত লোকলস্কর দাসদাসী, তার আর হিসেব নেই। এত কিছুর মধ্যেও রাজার মনে কিন্তু সুখ নেই। কারণ ছেলেগুলি একেবারে আকাট। তারা লেখাপড়া একেবারেই করে না। পণ্ডিত দেখলে কোথায় যে লুকোয় তার ঠিক নেই। অথচ রাজার ছেলে—বড় হয়ে তাদের রাজ্য চালাতে হবে। তাতে কত রকমের বিপদ ঠ্যাকা আছে। কেমন করে এড়িয়ে যেতে হয়, কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কার সঙ্গে শান্তি—এসব আগে থেকে জানা উচিত, পড়া উচিত। তার জন্য শাস্ত্র পুঁথি আছে। কিন্তু কে টানবে রাজকুমারদের শাস্ত্র পুঁথির দিকে। পড়ার কথা শুনলেই তারা পগার পার। এ ছাড়াও আছে আবার নানা রকম বাঁদরামি। রাজার মনে ভারী দুঃখ—কে তাদের মানুষ করে তুলতে পারবে!

একদিন রাজসভার পণ্ডিতদের ডেকে রাজা বললেন, 'আপনাদের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি আমার ছেলে ক'টিকে মানুষ করে তুলতে পারেন?'

পণ্ডিতেরা সভয়ে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলেন।

তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু শর্মা ছিলেন মস্ত পণ্ডিত। তিনি বললেন, 'আমি ওদের ছ' মাসের মধ্যে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলতে পারি।'

শুনে রাজা ভারী খুশী। পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মার হাতেই তাঁর ডানপিটে ছেলেগুলির ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

ছেলেদের ভার তো নিলেন কিন্তু বিষ্ণু শর্মা ভাবতে বসলেন—কেমন করে এদের মতিগতি ফেরাবেন। তিনি ঠিক করলেন—ওদের মজার মজার গল্প বলবেন। কারণ, আগেই তোড়জোড় করে লেখাপড়া শেখাতে গেলে ওরা হয়তো পালাবে—আর পণ্ডিতের ছায়াও মাড়াবে না। এই ভেবে বিষ্ণু শর্মা রাজকুমারদের একদিন ডাক দিলেন। ডেকে বললেন, 'একটা মজার গল্প শুনবে ?'

গল্পের কথায় রাজকুমারেরা পণ্ডিত মশায়কে ছেঁকে ধরলে। বললে, 'বলুন পণ্ডিত মশায়।'

বিষ্ণু শর্মা বললেন, 'তবে শোন। এক সিংহ, বলদ আর দুই শেয়ালের গল্প। দেখ কেমন করে দুষ্টু লোকে সর্বনাশ করে।' এই বলে বিষ্ণু শর্মা গল্প শুরু করলেন ঃ

দাক্ষিণাত্যে সুবর্ণবতী নামে একটি নগর ছিল। সেই নগরে বর্ধমান নামে এক বণিক বাস করত। একদিন বণিক একটা গোরুর গাড়িতে অনেক রকম জিনিসপত্র বোঝাই করে কাশ্মীরের দিকে রওনা হল বাণিজ্যের উদ্দেশে। যেতে যেতে পথে পড়ল এক অরণ্য—ভয়ানক দুর্গম তার পথঘাট। এইখানে গাড়ি টানতে টানতে পড়ে গিয়ে একটি বলদের পা ভেঙে গেল। বণিক বর্ধমান পড়ল মহা বিপদে। যাই হোক, গাড়ি সেইখানে ফেলে রেখে চলে গেল সে ধর্মপুর নামে এক নগরে। সেখান থেকে নতুন একটি বলদ কিনে আনলে এবং তাকে গাড়িতে জুতে আবার কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করলে।

বেচারী খোঁড়া বলদটি পড়ে রইল সেইখানে। তার নাম হল সঞ্জীবক। কয়েক দিন পড়ে থেকে আস্তে আস্তে তার পায়ের ব্যথা সেরে এল। তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তখন সে চারদিকে মনের আনন্দে ঘাস খেয়ে খেয়ে ঘুরতে লাগল। প্রচুর ঘাস খেয়ে খেয়ে তার চেহারা ফিরে গেল—গায়েও হল খুব জোর। তখন

তাকে দেখলে কে বলবে যে সে বলদ। গায়ে চর্বিটর্বি হয়ে এমনই তার চেহারা হল যে, তাকে দেখে হঠাৎ মনে হবে অন্য কোনও জানোয়ার। সঞ্জীবক মনের আনন্দে গাঁক গাঁক শব্দ করে সেই দুর্গম জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের রাজা ছিল এক সিংহ, তার নাম পিঙ্গলক। একদিন যমুনায় জল খেতে গিয়ে পিঙ্গলক শুনতে পেল ভয়ানক এক শব্দ— যেন মেঘ ডাকছে। শব্দ শুনে পিঙ্গলক ভয় পেয়ে গেল। তখন জলটল ফেলে পশুরাজ পিঙ্গলক নিজের গুহায় এসে চুপ করে বসে রইল।

পিঙ্গলকের ছিল দু'জন শেয়াল মন্ত্রী—করটক আর দমনক। কিছুদিন থেকে রাজা তাদের ওপর খুশী ছিলেন না। তারা পশুরাজের খাবার থেকে ভয়ানক মাংস চুরি করত। সেদিন পশুরাজকে মুখ শুকনো করে বসে থাকতে দেখে করটক আর দমনক আলোচনা করতে লাগল।

দমনক বললে, 'ভাই করটক, আমাদের রাজা জল না খেয়েই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলেন কেন বল দেখি?'

করটক রাগ করে বলল, 'জেনে আমাদের লাভ কি? রাজা আমাদের বিনা দোষে অনেক অপমান করেন, অনেক কষ্ট দেন। এখন মরুন গে—কোথায় কি দেখেছেন। ওই রকম রাজার সেবা করতে নেই।'

দমনক বললে, 'ভুল করছ, ভায়া। প্রধান মন্ত্রী হতে হলে তোমাকে তার কাজ ও যোগ্যতা দেখাতে হবে।'

করটক বললে, 'তা হলে তুমি কি করতে চাও?'

দমনক বললে, 'দেখছ না—রাজা ভয় পেয়েছেন। ওই ভয় দিয়েই আমি রাজাকে বশ করব; ব্যাপারটা জানা দরকার—কেন ভয় পেয়েছেন।'

করকট বললে, 'তবে যাও।'

দমনক তখন চলল রাজা পিঙ্গলকের কাছে। গিয়ে রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

পিঙ্গলক বললে, 'কি খবর হে দমনক, কত দিন তুমি আসনি ?'

দমনক তখন অভিমান ভরে বললে, 'মহারাজ তো আর গরীব চাকরদের খোঁজ খবর নেন না! তবে রাজার বিপদে আমরা সব সময়েই সজাগ। আজ দেখলাম আপনি জল খেতে গিয়ে ফিরে এলেন—জল খেলেন না। ব্যাপার কি, মহারাজ ?'

পিঙ্গলক বললে, 'দেখ, এই বনে নতুন কোনও ভয়ঙ্কর জানোয়ার একটা এসেছে। তার ডাকে আকাশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। যার ডাক এমন—না জানি তার গায়ের জোর কত! আমার মনে হচ্ছে—আমাদের সকলেরই এ জঙ্গল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'

দমনক বললে, 'মহারাজ, এ ভয়ের কথাই বটে। আমরাও তার ডাক শুনে ভয়ে কেঁপেছি। তবে বিপদের সময় যে মন্ত্রী সৎ পরামর্শ না দিয়ে চট্ করে পালাতে বলে বা হুট করে যুদ্ধ করতে বলে, সে মন্ত্রী বাজে মন্ত্রী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমরা থাকতে আপনার কোনও বিপদ হবে না। আমি যাচ্ছি—সেই জানোয়ারের হালচালটা আগে বুঝে আসি।' এই বলে দমনক রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করটকের কাছে ফিরে এল।

তারপর দমনকের কাছ থেকে সব শুনে করটক বললে, 'কিছু না জেনেই তুমি রাজাকে ভরসা দিলে কেন ? শেষকালে একটা যদি বিপদ ঘটে যায়!'

দমনক হেসে বললে, 'ভায়া, চুপ কর। আমি জানি আমাদের রাজা একটা বলদের ডাক শুনে মিথ্যে ভয় পেয়েছেন।'

করটক বললে, 'তবে তুমি রাজাকে সে কথা বললে না কেন ?'

দমনক বললে, 'আরে আগেই যদি রাজার ভয় ভেঙে দিই তবে আমাদের আর কি লাভ ? কেমন করে রাজাকে হাতে রাখবে ?'

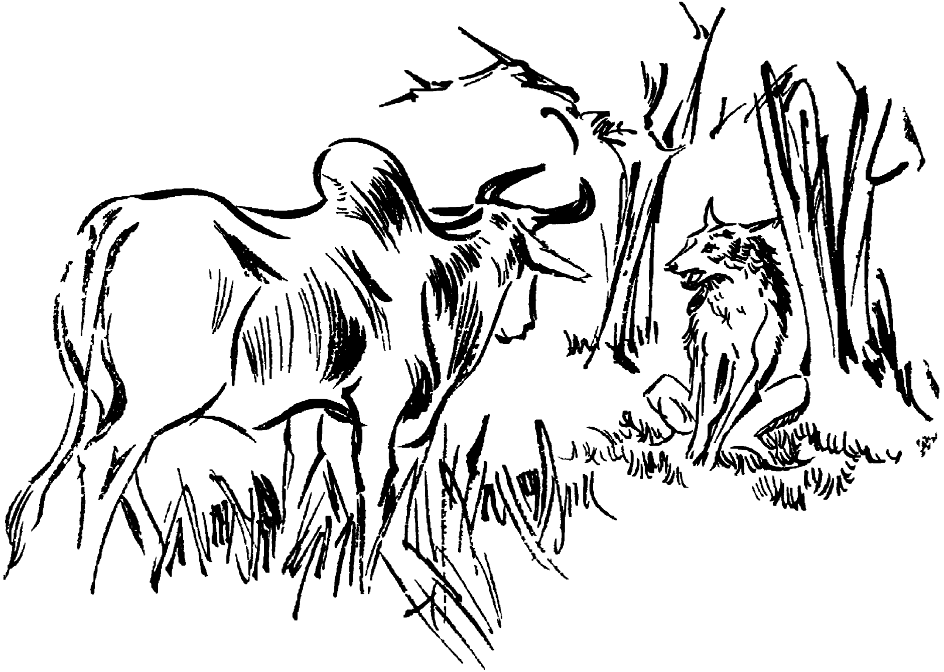
করটক বলে, 'তা হলে এখন কি করবে ?'

দমনক বললে, ‘তুমি এই গাছতলায় সেনাপতির মত গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। আমি বলদটাকে ডেকে আনি।’

তারপর দমনক সঞ্জীবকের কাছে গিয়ে বললে, ‘ওহে বলদ, শোন। রাজা পিঙ্গলকের হুকুমে আমি এই বন রক্ষা করি। আমাদের সেনাপতি করটক তোমাকে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি চল—নয় তো তোমার ভাল হবে না।’

সঞ্জীবক ভয় পেয়ে চলল দমনকের সঙ্গে সঙ্গে।

করটক বলদকে দেখতে পেয়ে গোঁপ পাকিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে



উঠল। বললে, ‘তুমি তো আচ্ছা বলদ! এই বনে থাক অথচ আমাদের রাজাকে প্রণাম করতে যাওনি কেন?’

সঞ্জীবক ভয় পেয়ে জোড় হাত করে বললে, ‘অপরাধ মার্জনা করুন। হুকুম করুন এখন কি করতে হবে!’

করটক বললে, ‘চল রাজাকে প্রণাম করবে।’

সঞ্জীবক ভয়ে ভয়ে চলল ওদের সঙ্গে।

তারপব সঞ্জীবককে আড়ালে রেখে করটক আর দমনক রাজার কাছে গেল।

রাজা ওদের দেখতে পেয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হে, সেই জানোয়ারটার কোনও খবরটবর পেলে নাকি ?'

দমনক বললে, 'তাকে দেখেছি, মহারাজ। সত্যিই সে ভয়ঙ্কর বটে। আপনার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে। এখন আপনি সেজেগুজে সাবধান হয়ে বসুন। তার ডাক শুনে ভয় পাবেন না যেন। আমরা তো আছিই।'

তারপর ওরা দু-জন সঞ্জীবককে ডেকে এনে পিঙ্গলকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে।

রাজা পিঙ্গলক সঞ্জীবকের মহাবলশালী কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল। ইয়া লম্বা লম্বা ছুঁচলো শিং, ড্যাম ড্যাম করে চেয়ে আছে ভাঁটার মত দুটো চোখ, দশটা জয়ঢাকেব মত পেট, মাটিতে প্রায় লুটিয়ে পড়ছে গলাব থলে। ওই থলের মধ্যেই সে পিঙ্গলককে ভরে রাখতে পাববে—পেট পর্যন্ত আর যেতে হবে না। বাজা পিঙ্গলক ভাবলে—এর গায়ে নিশ্চয়ই খুব জোর। ওর সঙ্গে ভাব করাই ভাল।

তারপর বলদের সঙ্গে সিংহের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারা এক সঙ্গে সুখে বাস করতে লাগল। সঞ্জীবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পব বাজা পিঙ্গলক খুশী হয়ে করটক ও দমনকের ওপরে খাবাব ঘরের ভাব ছেড়ে দিলে। করটক আর দমনক সুযোগ পেয়ে হরদম মাংস খেতে লাগল—এমন কি রাজাব ভাগ পর্যন্ত তারা সাবাড় করে দিতে লাগল।

কিছুদিন পরে রাজা পিঙ্গলকের বাড়ি এল তার ভাই স্তব্ধকর্ণ। ভাইকে খেতে দেওয়ার জন্য পিঙ্গলক বেরুল খাবারের সন্ধানে।

সঞ্জীবক বললে, 'মহারাজ আজ আপনি যে এত মাংস এনেছিলেন —তা কোথায় গেল ?'

পিঙ্গলক বিরক্ত হয়ে বললে, 'আর বল কেন। করটক আর দমনক সে মাংস খেয়ে ফেলেছে।'

সঞ্জীবক বললে, 'মহারাজের হুকুম না নিয়ে এমন কাজ করা তাদের অন্যায় হয়েছে।'

স্তব্ধকর্ণ বললে, 'দাদা, তোমার শেয়াল-মন্ত্রীরা যুদ্ধের কাজেই ভাল—খাবার জিনিস তাদের কাছে রাখা ঠিক নয়।'

পিঙ্গলক বললে, 'আরে তারা আমার কথা শোনেই না।'

স্তব্ধকর্ণ পিঙ্গলকের কানে কানে বললে, 'দাদা, আমার বুদ্ধি শোন। এই সঞ্জীবক ঘাস পাতা খায়—মাংস খায় না। একেই তোমরা ভাঁড়ারের ভার দাও—তাহলে মাংস আর নষ্ট হবে না।'

'ঠিক বলেছ।' এই বলে সেই দিন থেকে ভাঁড়ারের ভার দিল সঞ্জীবকের হাতে।

এই ব্যাপারে করটক আর দমনকের মেজাজ গেল বিগড়ে। দমনক ক্ষেপে গিয়ে করটককে বললে, 'দেখলে রাজার কাণ্ড! সঞ্জীবক হল এখন প্রিয়পাত্র। যাই হোক, রাজা যাতে বলদটার ওপর এবারে চটে যায়—তাই করতে হবে। ওদের মধ্যে আমিই বন্ধুত্ব ঘটিয়েছিলাম—আবার আমিই ঝগড়া বাধাব।'

করটক মনের দুঃখে বললে, 'কর ভাই যা করবার। বলদটার জন্য পেট ভরে আর মাংস খেতে পাচ্ছি না।'

এর পর একদিন দমনক পিঙ্গলকের কাছে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, ভয়ানক খবর। সঞ্জীবক সকলের কাছে আপনার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। সে এই বনের রাজা হতে চায়।'

পিঙ্গলকের বুক কেঁপে উঠল। সে ভয়ে চুপ করে রইল।

দমনক বললে, 'মহারাজ, আমরা আপনার অনেক দিনের মন্ত্রী।

আমাদের দূর করে দিয়ে আপনি প্রধান মন্ত্রী করলেন সঞ্জীবককে। তাতেই তার এই আস্পর্ধা।'

পিঙ্গলক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

দমনক বললে, 'এই জন্য শাস্ত্রে বলেছে—রাজা যদি একজন মন্ত্রীকেই রাজ্যের সর্বপ্রধান করেন তা হলে সেই মন্ত্রী ক্ষমতায় আর আর গর্বে অন্ধ হয়ে ওঠে, তাবপর কিছু দিনের মধ্যে সে নিজেই রাজা হয়ে বসতে চায়। তাতে শেষ পর্যন্ত রাজার প্রাণ যায়।'

পিঙ্গলক বললে, 'তার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করেছি অথচ সে আমার অনিষ্ট করবে কেন?'

দমনক বললে, 'মন্দ লোকের স্বভাবই ওরকম। কুকুরের ল্যাজে যতই তেল মালিশ করা যাক—তাকে কি সোজা কবা যায়? আপনাকে সাবধান করে দিলাম—এর পরে যদি বিপদে পড়েন তো, মহারাজ আমাকে দোষ দেবেন না।'

পিঙ্গলক ভেবে ভেবে বললে, 'সে যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে—তা কেমন করে বুঝব?'

দমনক বললে, 'দেখলেই বুঝবেন। তখন দেখবেন শিং উঁচিয়ে সে গর্জন করতে থাকবে, সামনের দু'পায়ে মাটি খুঁড়তে থাকবে। তারপরই আপনাকে সে আক্রমণ করেবে।'

পিঙ্গলক বললে, 'তা হলে উপায়?'

দমনক বললে, 'ওকে ভয় দেখান—শাস্তি দিন। ও যখন আসবে তখন হা করে কটমট করে এমন ভাবে তাকান যাতে ও ভয় পায়। যেন ইচ্ছা করলেই ওকে আপনি এক মুহূর্তে খেয়ে ফেলতে পারেন।'

পিঙ্গলক বললে, 'আচ্ছা—তাই হবে।'

তারপর দমনক মুখ শুকনো করে হাজির হল গিয়ে সঞ্জীবকের কাছে। দমনকের ভাবসাব দেখে সঞ্জীবক বললে, 'কি খবর বন্ধু?'

দমনক বললে, 'আর ভাই—বড় খারাপ খবর। আমাদের রাজা তোমার ওপর হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলেছেন—সঞ্জীবককে মেরে তার

মাংস আমার বাড়ির লোকজনদের খাওয়াব। জানই তো, ওর আবার এক ভাই এসেছে। খবরটা আমি গোপনে জানতে পেরেছি। সাবধান।'

সঞ্জীবক ভয় পেয়ে বললে, 'আমি তো রাজার কোনও অনিষ্ট করিনি, তবে কেন আমাকে তিনি মারবেন?'

দমনক বললে, 'ভাই, রাজা কারুর প্রিয় হয় না। এই রাজাটি মুখে খুব মিষ্টি কিন্তু মনে বিষ ভরা।'

সঞ্জীবক সাত-পাঁচ ভেবে বললে, 'রাজা যদি লড়াই করতে আসেন. তা হলে আমিও লড়াই করব। কিন্তু কখন তিনি কি ভাবে আক্রমণ করবেন তা কেমন করে বুঝব?'

দমনক বললে, 'রাজা যখনি কান খাড়া করে ল্যাজ তুলে হা করে তোমার দিকে কটমট করে তাকাবে তখনি বুঝবে—এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তখনি তুমি গর্জন করে রাজাকে তাড়া করবে।'

তারপর দমনক করটককে গিয়ে বললে, 'আর ভাবনা নেই বন্ধু। সিংহের সঙ্গে বলদের ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি।'

করটক বললে, 'ধূর্তরা এমনি ভাবেই ধনীদের বিপথগামী করে নিজেদের উন্নতি করে।'

দমনক বললে, 'ভায়া, চুপ করে বসে বসে দেখ।'

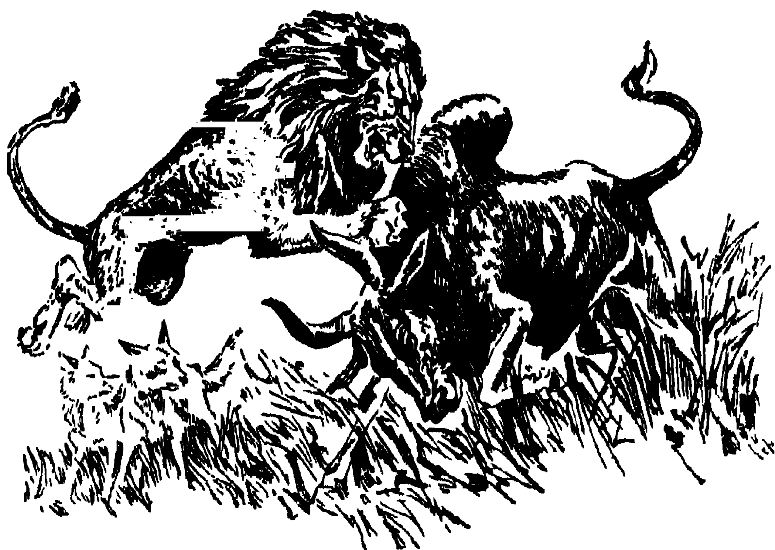
এই বলে ছুটে গেল সে সিংহের কাছে। বললে, 'মহারাজ, তৈরী থাকুন। সেই বদমাস সঞ্জীবকটা এখুনি আসবে।'

তারপর সঞ্জীবক এসেই দেখতে পেল—সিংহ কান খাড়া করে ল্যাজ তুলে হা করে তার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে। অমনি সঞ্জীবক ভয়ানক তর্জন গর্জন করে শিং দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। তাই না দেখে সিংহও রাগে লাফ দিয়ে পড়ল বলদের ঘাড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সঞ্জীবক সিংহের হাতে মারা পড়ল।

বলদ মরে গেলে সিংহ বললে, 'হায় হায়, আমি কি অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।'

দমনক বললে, 'মহারাজ, দুঃখ করছেন কেন? শত্রুকে মেরে ভালই করেছেন, এখন আপনার আর কোনও ভয় রইল না।'

গল্প শেষ করে বিষ্ণু শর্মা বললে, 'দুষ্টু লোকে কেমন করে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া বাধায় তা তো শুনলে।'



রাজপুত্রেরা খুশী হয়ে বললে, 'শুনলাম পণ্ডিত মশায়। আপনি আর একটি গল্প বলুন।'

এই রকম গল্পের ভেতর দিয়ে বিষ্ণু শর্মা রাজপুত্রদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

॥ 'হিতোপদেশ' থেকে ॥



বন্ধুলাভ

এ কাহিনী হল বহু বহু যুগ আগের। বন্ধুত্ব যে কেমন করে গড়ে উঠে—তাই নিয়ে বিষ্ণু শর্মা বললেন আর একটি গল্প।

তখন গোদাবরী নদীর তীরে ছিল বিরাট এক জঙ্গল। সেই জঙ্গলে মস্ত এক শিমুল গাছে একটি বুদ্ধিমান কাক বাস করত। কাকটির নাম ছিল লঘুপতনক। যেমন নাম—তেমনি তার কাজ। লঘুপতনক এমন টুপ করে নেমে এসে ছোঁ-মেরে উধাও হতে পারে যে কেউ টেরও পায় না। একদিন শেষরাতে লঘুপতনকের ঘুম ভেঙে গেল। গাছের আগায় বসে চেয়ে দেখল, একটি ব্যাধ কেমন ভাবে যেন ঘোরাঘুরি করছে। বিপদের ভয়ে সে ব্যাধের পিছনে পিছনে উড়ে চলল। কিছুদূর এসে সে দেখল, ব্যাধটা এক জায়গায় কিছু চাল ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর ফাঁদ পেতে দিল। দিয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে এক ঝাঁক পায়রা সেই দিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। মাটিতে ছড়ান চাল দেখে তাদের খাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু দলের সর্দার ছিল চিত্রগ্রীব—ভারি সেয়ানা। যেমন তার নাম তেমনি তার চেহারা। তার গ্রীবা অর্থাৎ গলার কাছে ময়ূরের মত ঝিকমিক করে। চিত্রগ্রীব সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলল,

'এখানে আমাদের নামা উচিত হবে না। বিপদ হতে পারে। ভেবে দেখ একবার, এই জনহীন জঙ্গলে চাল এল কোথা থেকে?'

কিন্তু কে শোনে সে কথা! একটি লোভী পায়রা বলে উঠল, 'বুড়োদের কথা বিপদে আপদে শোনা উচিত বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার সময়েও যদি শুনতে হয় তা হলে খাওয়ার দফা ইতি।'

এই কথা শুনে আরও ক'টি পায়রা লোভী পায়রাটির সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল। তাদের দেখাদেখি সবাই। চিত্রগ্রীব নিরুপায়। শেষ পর্যন্ত গোটা ঝাঁকটা চালের লোভে মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধের জালে পড়ল। তখন সকলে সেই লোভী পায়রাটির উপর চটে 'মার মার' করে উঠল। বলল, 'ওই হতভাগা পাজিটার কথা শুনেই আমরা এই বিপদে পড়লাম।'

চিত্রগ্রীব সকলকে ঠাণ্ডা করে বলল, 'ওর ওপরে এখন চোট-পাট করে আর লাভ নেই। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। এক কাজ কর—সকলে এক সঙ্গে জাল নিয়ে উড়ে চল।'

চিত্রগ্রীবের উপদেশ মত সকলে একসঙ্গে ঝটপট করে জাল নিয়ে আকাশে উঠল। আর বনের আড়ালে ব্যাধটা কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

পায়রারা বলল, 'সর্দারজী, এখন কি করা উচিত?'

সর্দার চিত্রগ্রীব বলল, 'জাল নিয়ে উড়ে চল গণ্ডকী নদীর ধারে। সেখানে আমার এক ইঁদুর বন্ধু আছে। তার কাছে গেলে সে আমাদের জাল কেটে মুক্তি দেবে।'

পায়রার দল উড়ে চলল।

ইঁদুর বন্ধুর নাম হিরণ্যক। তার নামের মানে যেমন সোনা, সে কাজেও তেমনি সোনা। গণ্ডকী নদীর তীরে মস্ত এক গর্তে তার এক শ' দুয়ারী ঘর। বিপদ দেখলেই যে কোনও একটা দরোজা দিয়ে এক নিমেষে হিরণ্যক সুড়ুৎ।

পায়রার ঝাঁকের ডানার ঝটাপট শব্দে হিরণ্যক ভয়ে সুড়ুৎ করে গর্তের মধ্যে সরে পড়ল।

চিত্রগ্রীব এক শ' দরোজায় ঘুরে ঘুরে তাকে ডাকতে লাগল, 'বন্ধু, হে বন্ধু—!'

চিত্রগ্রীবের গলা চিনতে পেরে হিরণ্যক বাইরে এল। তার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এ কি কাণ্ড বন্ধু! কি বিপদ!' এই বলে সে সাত-তাড়াতাড়ি আগে চিত্রগ্রীবের পায়ের জাল কাটতে গেল।

কিন্তু চিত্রগ্রীব বলল, 'আগে আমার সঙ্গীদের মুক্ত কর।'

হিরণ্যক বলল, 'আমার দাঁতে এত জোর নেই যে জাল কেটে সকলকেই মুক্ত করতে পারি। তাই আগে তোমাকে তো মুক্ত করি।

চিত্রগ্রীব বলল, 'উহুঁ, যারা আমার আশ্রয়ে আছে—আগে তাদের মুক্তি দাও ভাই। না হলে অধর্ম হবে।'

হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের কথা শুনে বলে উঠল, 'বন্ধু, তুমি ধন্য। শুধু এই পায়রাদের নয়, তুমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই তিন লোকের রাজা হওয়ার যোগ্য!' এই বলে হিরণ্যক প্রাণ-পণে দাঁত দিয়ে জাল কেটে কেটে সকলকে মুক্ত করে দিল।

পায়রার দল উড়ে চলে গেল।

কাক লঘুপতনক পায়রাদের পিছনে পিছনে উড়ে এসে একটা গাছে বসে ওদেব ব্যাপার লক্ষ্য করছিল। ইঁদুর হিরণ্যকের কাণ্ড দেখে তার খুব ভালো লাগল। হিরণ্যকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে বলে সে যেমন ঝুপ্ করে তার গর্তের কাছে নামল, অমনি এক শ' দরোজাব এক দরোজা দিয়ে হিরণ্যক সুড়ুৎ।

কাক ডেকে ডেকে বলল, 'হিরণ্যক, তুমি বড় ভালো। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাতাবার বড় সাধ।'

হিরণ্যক গর্তের ভিতব থেকে বলল, 'খুব হয়েছে—সরে পড়। তুমি হলে কাক, ইঁদুর ধরে ধরে খাওয়াই হল তোমার স্বভাব। তোমার আর বন্ধুত্ব পাতাতে হবে না।'

মনের দুঃখে কাক বলল, 'আমাকে অবিশ্বাস কর না। তুমি এত ছোট যে তোমাকে খেয়ে আমার পেট ভরবে না। তুমি যেমন চিত্রগ্রীবের বন্ধু, তেমনি আমারও বন্ধু হও।'

হিরণ্যক গর্তের ভিতর থেকে আবার বলল, 'কাকেরা ভারি চঞ্চল। যারা চঞ্চল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।'

কাক লঘুপতনক বলল, 'তুমি আমার বন্ধু না হলে তোমার দরোজায় আমি না খেয়েই মরব—এই শেষ কথা বলে দিলাম। তোমার গুণে আমি মুগ্ধ। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবই।'

শেষ পর্যন্ত হিরণ্যক গর্ত থেকে বের হয়ে এল। বলল, 'বেশ, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে।'

এর পর একদিন কাক বলল, 'বন্ধু হিরণ্যক, এখানে খাবার জিনিস খুব পাওয়া যায় না। দণ্ডকারণ্যে চল। সেখানে কর্পূরগৌর নামে এক সরোবর আছে। সেই সরোবরে মন্থর নামে আমার এক কচ্ছপ বন্ধু আছে—তার কাছে চল।'

হিরণ্যক রাজি হলে পর লঘুপতনক তাকে সঙ্গে নিয়ে সেই দণ্ডকারণ্যে বন্ধু মন্থরের কাছে চলল। মন্থর নামেও যেমন—কাজেও তেমন, চলে খুব আস্তে আস্তে। লঘুপতনক কচ্ছপকে ডেকে বলল, 'মন্থর, ইনি আমার বন্ধু হিরণ্যক—এঁর মত দয়ালু আর দেখিনি।' এই বলে সে চিত্রগ্রীবের কাহিনী সব বলল।

সমস্ত ঘটনা শুনে মন্থর হিরণ্যকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল।

তারপর তিন বন্ধুতে মিলে সেই সরোবরের তীরে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে লাগল।

এর কিছুদিন পরে একটি হরিণ খুব ভয় পেয়ে একদিন সেই সরোবরের তীরে ছুটে এল। তার নাম চিত্রাঙ্গ। যেমন নাম তেমন তার চেহারা—সারা গায়ে ছিট্ ছিট্ দাগের চিত্তির-বিচিত্তির। তার পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে মন্থর সরোবরের জলে টুব্ করে ডুবল, হিরণ্যক সুড়ৎ করে গর্তে ঢুকল আর লঘুপতনক ফুরুৎ করে একেবারে

গাছের আগায়। সেখান থেকে সে চারদিকে নজর করে দেখল। তারপর বন্ধুদের ডেকে বলল, 'ভয় নেই—তোমরা বেরিয়ে এস।'

ইঁদুর আর কচ্ছপ দুজনে আবার বের হয়ে এল। চিত্রাঙ্গ তখনও হাঁপাচ্ছিল। কচ্ছপ তাকে নির্ভয় হতে বলে বলল, 'চিত্রাঙ্গ, তুমিও আমাদের বন্ধু হলে। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাক, দিব্যি ঘাস জল খাও।'

চিত্রাঙ্গ তখন সভয়ে বলল, 'কলিঙ্গ দেশের রাজা এখানে শিকার করতে এসেছেন। আমি এক ব্যাধের মুখে শুনেছি, রাজা এই সরোবরের তীরে তাঁবু ফেলে থাকবেন। এখন যা ভালো মনে হয় কর।'

এই শুনে কচ্ছপ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তবে এক্ষুনি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোনও জলাশয়ে পালাই চল।'

কাক আর হরিণ বলল, 'সেই ভালো, চল।'

হিরণ্যক ভেবে ভেবে বলল, 'আর একটা জলাশয় পাওয়া গেলে মন্থরেব পক্ষে তো ভালই হয়, কিন্তু ও যাবে কি করে! যেতে যেতে পথেই যদি কোনও বিপদ ঘটে?'

কচ্ছপ কিন্তু সেখানে আর কিছুতেই থাকতে চাইল না। অন্য জলাশয়ে যাবার জন্য আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। কাক, ইঁদুর আর হরিণ করে কি! তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই ঘটল বিপদ। এক ব্যাধ বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কচ্ছপটিকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে কচ্ছপকে চেপে ধরল। তারপর ধনুকের সঙ্গে তাকে বেশ করে বেঁধে ঘরের দিকে চলতে শুরু করল।

কচ্ছপের এই অবস্থা দেখে ইঁদুর কাঁদতে কাঁদতে কাক আর হরিণকে বলল, 'ভাই, আজ আমাদের বন্ধুত্বের পরীক্ষা। কারণ বিপদেই বোঝা যায় সত্যিকারের বন্ধু কে। এখন যেমন করে হোক—ব্যাধ এই বনের বাইরে যাবার আগে আমাদের বন্ধু মন্থরকে উদ্ধার করতেই হবে।'

কাক আর হরিণ বলল, 'তুমি বুদ্ধি বাৎলে দাও।'

ইঁদুর বলল, 'তোমরা এক কাজ কর। চিত্রাঙ্গ, তুমি ওই জলের ধারে গিয়ে মড়ার মত পড়ে থাক। আর লঘুপতনক, তুমি চিত্রাঙ্গের গায়ের ওপর বসে বসে ঠোকরাও। যেন চিত্রাঙ্গ জল খেতে গিয়ে মরে গেছে।'



হিরণ্যকের বুদ্ধি মত চিত্রাঙ্গ জলের ধারে গিয়ে মড়ার মত পড়ে রইল। ব্যাধ তো তাকে দেখতে পেয়ে মহা খুশী। হরিণ-মাংসের লোভে সে তাড়াতাড়ি কচ্ছপটিকে জলের ধারে রেখে ছুরি নিয়ে হরিণের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। যেমনি যাওয়া আর অমনি ইঁদুর হিরণ্যক ছুটে গিয়ে কচ্ছপের বাঁধন কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপ জলের ভেতরে টুব্। আর ওদিকে ব্যাধকে কাছাকাছি আসতে

দেখে কাক লঘুপতনক এক মুহূর্তে ফুরুৎ এবং হরিণ চিত্রাঙ্গও এক লাফে সুড়ুৎ।

ব্যাধটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মনের দুঃখে সে বন ছেড়ে ঘরের দিকে চলে গেল।

এদিকে কাক, ইঁদুর, কচ্ছপ আর হরিণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে মনের সুখে একসঙ্গে বসবাস করতে লাগল। সেদিন থেকে তাদের মধ্যে আর ছাড়াছাড়ি হল না। কোনও কোনও দিন বন্ধু চিত্রগ্রীবও তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে পড়ত সেই সরোবরের তীরে। তখন পাঁচ বন্ধু আর পায়রার দল মিলে নেচে গেয়ে যেন আনন্দের মেলা বসিয়ে দিত।

॥ 'হিতোপদেশ' থেকে ॥



শত্রুজয়

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্য ছিল আড়ে দীর্ঘে বহু যোজন বিস্তৃত। দেশ-দেশান্তরে তাঁর প্রতিনিধিরা রাজ্য পরিচালন করত। তারা ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজাশাসন করছে কিনা দেখবার জন্য রাজা একবার ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন। এদিকে রাজপুরী রাজাশূন্য। তাই দেখে বিক্রমাদিত্যের বন্ধু দেবরাজ ইন্দ্র রাজপুরী রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন একজন যক্ষকে।

একদিন নিশুতি রাতে যক্ষ রাজপুরী পাহারা দিচ্ছে—এমন সময় রাজা বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে রাজপুরীতে এসে ঢুকলেন।

যক্ষ শুধালো, 'কে! তোর নাম কি?'

রাজা মুচকি হেসে বললেন, 'আমি বিক্রমাদিত্য!'

কিন্তু যক্ষ চেনে না বিক্রমাদিত্যকে। তাই বিক্রমাদিত্য রাজপুরীতে ঢোকবার চেষ্টা করতেই লেগে গেল যক্ষের সঙ্গে লড়াই। রাজা ছিলেন মস্ত বীর—যক্ষ তাঁর সঙ্গে পারবে কেন। রাজা যক্ষের বুকের ওপরে চেপে বসলেন।

যক্ষ বললে, 'এবার বুঝেছি—তুমি রাজা বিক্রমাদিত্য বটে। কারণ বিক্রমাদিত্য ছাড়া কেউ আমাকে হারাতে পারে না। যাক, এবার আমাকে ছেড়ে দাও! আমি তোমায় প্রাণদান দিচ্ছি।'

রাজা হেসে বললেন, 'ওরে যক্ষ—আমি তোর বুকের ওপরে বসে আছি, আর তুই আমায় প্রাণদান দিবি কি? আমি ইচ্ছে করলে তোকে এখুনি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি।'



যক্ষ বললে, 'মহাবাজ, আগে আমাব কথা শোন। তোমার একটা খুব বড় বিপদ আসছে। তাতে তোমার মৃত্যু নির্ঘাত। আমাকে ছেড়ে দাও—আব আমি যা যা বলি, মন দিয়ে শোন।'

রাজা যক্ষকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বল—কি বিপদ?'

যক্ষ বললে, 'মহারাজ, তুমি যেদিন যে শুভলগ্নে জন্মে সসাগরা ধরণীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য হয়েছ—ঠিক সেই দিন সেই

সময়ে আরও দু'জন জন্মেছিল—একজন রাজা চন্দ্রভানু, আর একজন শান্তশীল নামে এক যোগী। এই যোগী জন্মেছিল এক কুমোরের ঘরে। যোগী রাজা চন্দ্রভানুকে বধ ক'রে তাকে বেতালভূত বানিয়ে এক শ্মশানের ধারে শিরীষগাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখন যোগীর লক্ষ্য—তোমার প্রাণ বধ করা, তাহলেই তার সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে—জগতে হবে তার অতুল প্রভাব ও প্রতিপত্তি। যদি তুমি তার হাত থেকে নিস্তার পাও তাহলে বহুকাল তুমি শত্রুহীন হয়ে রাজ্য ভোগ করতে পারবে।' এই বলে যক্ষ মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিক্রমাদিত্য ভাবতে ভাবতে রাজপুরীতে ঢুকলেন। রাতটা কাটল নানা চিন্তায়। তারপর সকাল উঠে তিনি রাজকার্যে মন দিলেন। এমনি করে এক দিন গেল—দু' দিন গেল। রাজা প্রায় ভুলে গেলেন যক্ষের কথা।

কিছুদিন পরে তাঁর রাজসভায় জটাধারী এক সন্ন্যাসী এসে হাজির। রাজা তাকে দেখে চমকে উঠলেন—কে জানে, এ সেই ভয়ঙ্কর যোগী কিনা।

যোগী রাজার হাতে একটি পাকা বেল দিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করলে। তারপর অনেক ধর্মকথা শুনিয়ে যোগী চলে গেল। রাজা হাতে বেল নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবলেন এ বেল খাওয়া উচিত কি-না। শেষ পর্যন্ত বেলটি না খেয়ে কোষাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটি সাবধানে রাখবে।'

তারপর থেকে যোগী রোজ আসতে লাগল আর রাজাকে আশীর্বাদ করে একটি করে পাকা বেল দিয়ে যেতে লাগল। রাজাও সেগুলি না খেয়ে কোষাগারে জমিয়ে রাখলেন।

এক দিন হঠাৎ একটি বেল রাজার হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে বেলটি ফেটে চৌচির। তার ভেতর থেকে বেরুল এক অপরূপ রত্ন। তার আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

রাজা যোগীর দিকে অবাক চোখে চেয়ে বললেন, 'এই রত্নভরা বেল আমায় দিলেন কেন?'

যোগী বললে, 'মহারাজ, শাস্ত্রে আছে—রাজা, গুরু আর চিকিৎসকদের কাছে শুধু হাতে যেতে নেই। আপনাকে আমি যতগুলি বেল দিয়েছি—সবগুলোর মধ্যেই ওই রকম অমূল্য সব রত্ন আছে।'

রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে বললেন, 'তোমাকে যতগুলো বেল রাখতে দিয়েছি—সবগুলো নিয়ে এস।'

বেল আনা হল—ভেঙে দেখা গেল সবগুলো, প্রত্যেকটিতেই ওই রকম একটি করে রত্ন আছে বটে।

রাজা তখন মণিকার ডাকিয়ে বললেন, 'এই রত্নগুলির দাম কত—বলে দাও।'

মণিকার রত্নগুলি পরীক্ষা করে অনেক ভেবে চিন্তে হিসেব করে শেষকালে তার চোখ কপালে উঠল। মণিকার বললে, 'মহারাজ, এ রত্নের এক একটির দাম কোটি টাকারও বেশী। এসব রত্ন অমূল্য।'

মণির দাম শুনেই রাজা ভয়ানক খুশী। যোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমায় এ অমূল্য রত্ন সব দিলেন কেন? আপনি সম্মানীয় যোগী—কেমন করে আমি আপনার ঋণ থেকে মুক্ত হব বলুন।'

যোগী বললে, 'আপনার লোকজনকে এখান থেকে চলে যেতে বলুন—আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে চাই।'

রাজা পাত্র-মিত্র সকলকে বিদায় করে দিলেন। তারপর যোগীর দিকে চেয়ে বললেন, 'বলুন—আপনার কি উপকার আমি করতে পারি? আপনি যে সব রত্ন দিয়েছেন—তার প্রতিদানে আমি কি দেব, কি করব—ভেবে পাচ্ছি না।'

যোগী বললে, 'মহারাজ, আমি যোগী—সাধনা করি। সিদ্ধিলাভই আমার লক্ষ্য। আপনি একদিন আমার কুটিরে সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত থাকবেন। আপনি একা কাছে থাকলেই আমার সিদ্ধিলাভ হবে।'

রাজা বললেন, 'নিশ্চয়ই যাব। কবে বলুন।'

যোগী বললে, 'আগামী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে।'

রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ঠিক যাব।'

তারপর একদিন এল সেই কৃষ্ণাচতুর্দশী। সন্ধ্যে হতেই যোগী শ্মশানে বসল যোগাসন করে। রাজাও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সাহসে ভর করে কোমরে তরোয়াল বেঁধে হাজির হলেন যোগীর কাছে।

রাজাকে দেখে যোগী খুশী হয়ে বললে, 'মহারাজ, এবার বুঝতে পেরেছি—যাঁরা ভাল লোক তাঁরা যেমন করে হোক প্রতিজ্ঞা পালন করেন। যাই হোক, এসেছেন যখন—তখন আমায় এবার একটু সাহায্য করুন।'

রাজা বললেন, 'বলুন—কি করতে হবে?'

যোগী বললে, 'ক্রোশ দুই দক্ষিণে আর একটি শ্মশান আছে। সেখানে গেলে দেখতে পাবেন একটা মস্ত শিরীষগাছ। সেই গাছে একটা মড়া ঝোলান আছে। সেই মড়াটা আমার কাছে এনে দিন।'

রাজা চললেন সেই দক্ষিণ শ্মশানে। চারদিকে ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার। একে কৃষ্ণাচতুর্দশী—তার ওপরে আবার এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মেঘে মেঘে অন্ধকার। তারই মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য চললেন সাহসে ভর করে।

শ্মশানে গিয়ে রাজা দেখতে পেলেন সেই শিরীষগাছ আর সেই ঝোলান মড়া। রাজা খুশী হলেন। গাছে উঠে তরোয়ালের এক কোপে মড়া ঝোলান দড়িটা কেটে ফেললেন। মড়াটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মড়াটা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

রাজা গাছ থেকে নেমে এসে মড়াটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে? কেন তোমার এমন অবস্থা হয়েছে বল?'

সঙ্গে সঙ্গে মড়াটা আবার খলখল করে হেসে উঠল। তারপর দেখতে দেখতে মড়াটা আগের মত তেমনি আবার দড়িতে বাঁধা হয়ে গাছে ঝুলতে লাগল।

রাজা বুঝতে পারলেন—যক্ষ যে চন্দ্রভানুর কথা বলেছিল, এ নিশ্চয়ই তাঁর মৃতদেহ। যোগী একে বেতালভূত বানিয়ে রেখেছে। রাজা মনে মনে বললেন—দেখাই যাক, কি হয়। এই বলে তিনি আবার সাহসে ভর করে গাছে উঠে দড়ি থেকে মড়াটা খুললেন এবং সেটাকে কাঁধে তুলে গাছ থেকে নামলেন। তারপর চললেন বরাবর সেই যোগীর কাছে।

কিছুটা আসতে না আসতেই মড়াটা আবার কথা বলে উঠল। বললে, 'মহারাজ, যাচ্ছি বটে কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে।'

রাজা বললেন, 'বল—তোমার শর্ত।'

মড়া বললে, 'আমি কতকগুলো বিচাবের গল্প বলব। তার ঠিক ঠিক উত্তব দিতে হবে। যদি আপনার বিচার ঠিক হয় তাহলে আমি গাছে গিয়ে আবার ঝুলে থাকব। আর যদি আপনি ঠিক বিচার জেনেও না বলেন, তা হলে কিন্তু আপনার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

রাজা দেখলেন—দু' দিকেই বিপদ। ঠিক বিচার করলে মড়া আবাব গাছে গিয়ে ঝুলবে, তাতে যোগীব কাছে তাকে আর নিয়ে যাওয়া হয় না। আবার ঠিক বিচার জেনেও যদি না বলেন তা হলে বেতালভূতের হাতে আজ প্রাণ যায়। কিন্তু বাজা বিক্রমাদিত্যের সাহসের সীমা নেই। রাজা বললেন, 'বল, তোমার বিচারের গল্প।'

বেতাল গল্প বলতে লাগল। একটা দুটো নয়—একেবারে পঁচিশটা। পঁচিশবারই রাজা ঠিক বিচারটি করে বেতালের প্রশ্নের জবাব দিলেন। আর যতবারই জবাব দেন ততবারই সঙ্গে সঙ্গে বেতালভূত গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল। রাজাও দমবার পাত্র নন। বেতালভূতের পেছনে পেছনে রাজাও গাছে উঠে তাকে বারবার কাঁধে করে নামাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত বেতালভূত হার মেনে বললে, 'মহারাজ, আমি আপনার সাহস দেখে অবাক হয়েছি। যাক, এখন যা বলি শুনুন। যে যোগী আপনাকে মড়া নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে তার নাম হল শান্তশীল। এই শান্তশীল লোকটি যোগী হয়ে অনেক কৌশল করে রাজা চন্দ্রভানুকে মেরে ফেলেছিল। এখন আপনাকে মারবার পালা।'

রাজা বললেন, 'তা হলে উপায় ?'

বেতাল বললে, 'মহারাজ, যোগী তার পুজো শেষ করে আপনাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে বলবে। তখন খবরদার, আপনি যেন প্রণাম করবেন না। বরং বলবেন—আমি রাজা, আমি তো কখনও দণ্ডবৎ প্রণাম কারুকে করি নি, তাই আপনি দেখিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তারপর ?'

বেতাল বললে, 'তারপর যোগী যেমনি দণ্ডবৎ প্রণাম দেখাতে যাবে অমনি আপনি তরোয়াল দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেলবেন।'

রাজা বললেন, 'একেবারে কেটে ফেলব ?'

বেতাল বললে, 'সে খুনী—রাজা চন্দ্রভানুকে সে হত্যা করেছিল। তাকে মেরে ফেললে পাপীর শাস্তিই হবে। যাক, তাকে মেরে ফেলে আর একটি কাজ করবেন। দেখতে পাবেন—একটু দূরে উনুনে বসানো আছে মস্ত বড় একটা ফুটন্ত তেলের কড়াই। আপনি যোগী আর চন্দ্রভানুর এই মৃতদেহ সেই তেলের কড়াইতে ফেলে দেবেন। ভুলবেন না।' এই বলে বেতাল সেই মড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল।

রাজা নানা কথা ভাবতে ভাবতে মড়া কাঁধে নিয়ে হাজির হলেন সেই যোগী শান্তশীলের কাছে।

যোগী রাজার খুব গুণগান করল। তারপর রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে তাকে বলি দিল। বলি দিয়ে পুজো করতে বসল। পুজো শেষ করে যোগী রাজা বিক্রমাদিত্যকে বললে,

'মহারাজ, দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করুন। আপনার প্রতাপ বৃদ্ধি হবে এবং যা চাইবেন তাই পাবেন।'



রাজা বললেন, 'যোগিবর, আমি তো দণ্ডবৎ প্রণাম জানি না। আমাকে একবার দেখিয়ে দিন।'

যোগী তখন দণ্ডবৎ প্রণাম দেখাবার জন্য যেমনি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল অমনি রাজা বিক্রমাদিত্য তরোয়ালের এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

তারপর দেখতে পেলেন—অদূরে একটা ফুটন্ত তেলের কড়াই; তাইতে মৃতদেহ দুটো ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু-জন বিকটাকার বীরপুরুষ তেলের কড়াই থেকে বেরিয়ে রাজার সামনে জোড়হাত করে দাঁড়াল। তাদের একজন তাল, আর একজন হল বেতাল। তারা বললে, 'মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়?'

রাজা বললেন, 'আমি আজ থেকে মনে মনে যখনই তোমাদের ডাকব তখনই তোমরা এসে হাজির হবে।'

'যে আজ্ঞা মহারাজ।' বলে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর থেকে রাজা বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনে একেবারে শত্রুশূন্য হয়ে গেলেন। আর প্রবল প্রতাপে, ন্যায় ও ধর্মের সাহায্যে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

॥ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' থেকে ॥



বিদ্যের জাহাজ

রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন মস্ত রাজা। যেমন ছিল তাঁর রাজ্যপাট তেমনি ছিল তাঁর সুবিচার। তাঁর বিচারে কোথাও এতটুকু অন্যায় থাকত না। এইজন্য সারা দেশের লোক 'ধন্য ধন্য' করত। এই বিচারশক্তির পরীক্ষা দিয়ে তিনি বেতালভূতের হাত থেকেও উদ্ধার পেয়ে গেলেন। যোগী শান্তশীলের ঘোর চক্রান্তও ব্যর্থ হয়ে গেল।

বেতালভূত রাজার বিচার শক্তি পরীক্ষার জন্য যে পঁচিশটি গল্প বলেছিল। তার একটি হল জীয়নমন্ত্রের।

সেদিন চারদিকে ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার। আর সেই মহাশ্মশান। কিন্তু রাজার ভয় ডর নেই। বেতালভূতের মড়াটি যেই কাঁধে তোলা অমনি বেতালভূত বললে, 'শুনুন মহারাজ···

বিষ্ণুস্বামী নামে একজন খুব ধার্মিক ব্রাহ্মণ জয়স্থল নগরে বসবাস করতেন। ব্রাহ্মণের ছিল চার ছেলে—চারটিই ভয়ানক পাজী। একটা কেবল পাশা খেলে, বাজি ধরে আর হারে। এই ভাবে সে বাপের অনেক পয়সা নষ্ট করল। আর একটা একেবারে বাঁদর। তার দুর্নামে একেবারে দেশ ভরে গেল। আর দু'টিও তেমনি। বড় দুই দাদার স্বভাব দেখে তারাও একেবারে

বিগড়ে গেল। এই চার মূর্তিমানের জ্বালায় বিষ্ণুস্বামী একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। পাড়ায় আর মুখ দেখাতে পারেন না। একদিন তিনি চারজনকে একসঙ্গে পেয়ে খুব বকলেন। বড়জনকে তো বলে দিলেন, 'তোর নাক কান কেটে গাধার পিঠে চাপিয়ে এ দেশ থেকে একেবারে বের করে দেওয়া উচিত।' আর সকলকে বললেন, 'তোরা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ। তোদের মরা-বাঁচা দু'ই সমান। আমি তোদের আর মুখ দেখতে চাইনে।'

বিষ্ণুস্বামী চারজনকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

বাপের তাড়া খেয়ে চার ভাইয়ের মনে ভয়ানক ঘৃণা হল। ভাবতে লাগল, তাই তো—জীবনটা তাদের বৃথাই গেল!

বড় বলল, 'হায়, ছেলেবেলায় যদি লেখাপড়া করতাম তা হলে আমাদের অবস্থা আজ এমন হত না।'

মেজ বলল, 'এখন কি করা যায়, তাই বল।'

বড় বলল, 'এখন বিদেশে গিয়ে আমাদের সকলেব কোনও বিদ্যা শেখা উচিত। আর ফাঁকি নয়।'

অন্য তিন ভাই রাজি হল। তখন চারজনে একসঙ্গে একদিন বিদেশের দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

তারপর অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে অনেক গুরু ধরে চার ভাই নিজেদের পছন্দ মত সব বিদ্যা শিক্ষা করল। কেউ শিখল কঙ্কালী বিদ্যা, কেউ বা মাংস-জোড়ানী বিদ্যা, কেউ বা চামড়া-জোড়ানী বিদ্যা। একজন শিখল জীয়নমন্ত্র। এই সব বিদ্যা শেখার পর তারা ভাবল—আর কি, এবার আমাদের মূর্খ নাম ঘুচল। এবার দেশে ফেরা যাক। দেশের লোককে বিদ্যার কায়দা দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিতে না পারলে আর কি হল!

চার ভাই এক পথের পথিক—এক মতে মত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিদ্যার জাহাজ হয়ে চারজনে তল্পি-তল্পা বেঁধে নানান দেশের নানান জিনিস্ সংগ্রহ করে একদিন দেশের পথ ধরল।

ফিরবার পথে ঘটল এক কাণ্ড। চারভাই এক জায়গায় এসে দেখতে পেল—একজন মুচি একটা মরা বাঘের চামড়া ছাড়াচ্ছে। চার ভাই একটা গাছতলায় বসে দেখতে লাগল। মুচি বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কাটতে লাগল। তারপর মাংস আর চামড়া পোঁটলায় বেঁধে মুচিটি চলে গেল। পড়ে রইল শুধু কিছু হাড়গোড়।

সেই হাড়গোড়গুলির দিকে চেয়ে চেয়ে এক ভাই বলল 'আমি হাড় জোড়া লাগানোর বিদ্যা জানি।'

আব এক ভাই বলল, 'আমি মাংস জোড়া লাগানোর বিদ্যা জানি।'



আর এক ভাই বলল, 'আমি চামড়া জোড়া দেওয়ার বিদ্যা জানি।'

আর এক ভাই বলল, 'আমি জীয়নমন্ত্রে বাঘটাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারি।'

তখন সব ক'টি ভাই বলে উঠল, 'তবে এস—আমাদের বিদ্যার পরীক্ষা করা যাক। দেখি একবার—ঠিক ঠিক শেখা হয়েছে কিনা।'

চার ভাই পর পর বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগল। হাড় জোড়া দেওয়া বিদ্যায় বাঘের কঙ্কাল ঠিক হয়ে গেল, মাংস জোড়া দেওয়া বিদ্যায় বাঘের গায়ে মাংস লাগল, চামড়া জোড়া দেওয়া বিদ্যায় বাঘের গায়ে চামড়া লেগে গেল। তারপর জীয়নমন্ত্রে বাঘ প্রাণ ফিরে পেল। প্রাণ ফিরে পেয়ে বাঘটা 'হালুম' করে একটা লাফ দিল। তারপর চার ভাইকে সেইখানে কড়মড় করে খেয়ে ফেলল।

গল্প বলা শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, 'মহারাজ, এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কে—বল দেখি?'

রাজা বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, 'বোকা সব ক'টাই—আর কিছু পেলে না, বাঘের ওপরে তাদের বিদ্যে জাহিরের শখ হল। তার মধ্যে আবার সবচেয়ে বোকা হল ওই ভাইটা—যে জীয়নমন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে দিলে।'

ঠিক ঠিক উত্তর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বেতালভূতের মড়া আবার শিরীষ গাছে গিয়ে ঝুলতে লাগল।

॥ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' থেকে ॥



উদার চরিত

রাজাও চিরকাল থাকে না—রাজ্যও চিরকাল থাকে না। একদিন ত্রিভুবনের বিখ্যাত মহারাজ বিক্রমাদিত্যও মারা গেলেন। তাঁর সিংহাসনে বসবে কে? সে আবাব যে সে সিংহাসন নয়—স্বর্গ থেকে স্বযং দেবরাজ ইন্দ্র সেই অতুলনীয় সিংহাসনটি বিক্রমাদিত্যকে উপহার দিয়েছিলেন। মন্ত্রীরা ভাবনায় পড়লেন—এ সিংহাসন নিয়ে এখন করেন কি। এমন সময় একদিন এক দেবদূত আকাশ থেকে বললেন, 'এ সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করবাব যোগ্য রাজা এখন আর নেই। এ সিংহাসন কোনও ভালো জায়গায় ফেলে দিয়ে এস।'

মন্ত্রীরা তাই কবলেন। জনহীন এক প্রান্তরে সিংহাসনটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে এলেন।

তারপর সে কাল চলে গেল—চলে গেল সেকালের মানুষ। সবাই ভুলে গেল সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই সিংহাসনের কথা।

এমনি করে কেটে গেল অনেক কাল; সিংহাসনের ওপরে কত মাটি পড়ল, কত মাটি জমল। জমতে জমতে সেখানটা হয়ে গেল একটা ঢিপির মত।

অনেক কাল পরে এক ব্রাহ্মণ সেই ঢিপির চারদিক ঘিরে করলে তার যব-ছোলার খেত। যব-ছোলা হতেও লাগল প্রচুর। এমন

শস্য আর কারুর হয় না। খবর পেয়ে উড়ে এল পাখির ঝাঁক। ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে তারা শস্যের খুব ক্ষতি করতে লাগল। ব্রাহ্মণ তখন ক্ষেতের মাঝখানে সেই ঢিপির ওপরে একটা মঞ্চ তৈরি করে সেই মঞ্চে বসে বসে সারা দিন পাখি তাড়াত।

ব্রাহ্মণ এমনি একদিন পাখি তাড়াচ্ছিল—এমন সময় সেখানে বেড়াতে বেড়াতে দলবল নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং ভোজরাজ। তাঁকে দেখতে পেয়ে ব্রাহ্মণ মঞ্চের ওপর থেকে বলে উঠল, 'আমার আজ কি সৌভাগ্য মহারাজ—কারণ স্বয়ং আপনি আজ আমার অতিথি! ক্ষেতে আমার ফসল পেকে উঠেছে—আপনি আপনার লোকলস্কর নিয়ে যেমন খুশী উপভোগ করুন, ঘোড়াগুলোকে ছোলা খেতে দিন।'

এই শুনে ভোজরাজ খুব খুশী হয়ে তাঁর দলবল নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেন।

ব্রাহ্মণও রাজাকে অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি ঢিপির সেই মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল। যেমনি নামা—অমনি তার অন্য এক মূর্তি। ব্রাহ্মণ বললে, 'মহারাজ, কেন আপনি অধর্ম করছেন! সামান্য এক গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষেত কেন নষ্ট করছেন! অন্য কেউ অন্যায় করলে আপনার কাছে নালিশ করে, কিন্তু আপনি স্বয়ং যদি অন্যায় করেন তাহলে কার কাছে আর নালিশ করব?'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থতমত খেয়ে তাঁর দলবল নিয়ে অগত্যা চললেন ক্ষেতের বাইরে।

তখন ব্রাহ্মণও আবার পাখি তাড়াবার জন্য ঢিপির ওপরের সেই মঞ্চে উঠল। ঢিপিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার অন্য মূর্তি। অতি মহৎ—অতি উদার। ব্রাহ্মণ ভোজরাজকে ডেকে আবার বললে, 'মহারাজ, আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? এই ক্ষেতে ফলমূলও রয়েছে অনেক। আসুন—খান। ঘোড়াগুলোকে যবের গাছ দিন।'

ভোজরাজ দলবল দিয়ে আবার ক্ষেতের মধ্যে ঢুকলেন—বামুনও তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য তাড়াতাড়ি মঞ্চ থেকে নেমে

এল। যেমনি নামা—অমনি আবার অন্য মূর্তি। ব্রাহ্মণ আবার হাঁ-হাঁ করে উঠল। বললে, 'এ কি মহারাজ, গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষেতটি নষ্ট করতে এসেছেন আপনি!'

ভোজরাজ দেখলেন—এ তো ভারি মজার ব্যাপার। বামুন ঢিপির ওপরে মঞ্চে উঠলে এক রকম—ঢিপি থেকে নেমে এলেই আর এক রকম। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য তিনি নিজে এক-বাব উঠলেন ঢিপির ওপরে। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের ভাবও বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর মনে যত মহৎ যত উদার ভাবনা সব ভিড় করে এল। তাঁর মনে হল—পীড়িতের সেবা, গরীবের দুঃখ দূব, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করা উচিত। এমন কি, সেই মুহূর্তে কারুর জন্য তিনি প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন।

ভোজরাজ বুঝতে পারলেন, এটা নিশ্চয়ই ঢিপির গুণ। নিশ্চয়ই ঢিপির মধ্যে কিছু আছে। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এই ক্ষেতটির দাম কত হতে পারে?'

ব্রাহ্মণ আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, 'সে আব কত হবে!'

রাজা বললেন, 'আমি এটা কিনব।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'আপনি যা ভালো মনে করেন—তাই করুন।'

ভোজরাজ বামুনকে অনেক ধনরত্ন দিয়ে খুশী করে বিদায় দিলেন। তারপর একদিন তাঁর লোকলস্কর নিয়ে এসে সেই ঢিপি খুঁড়তে আরম্ভ কবলেন।

এক-মানুষ গর্ত হতেই কোদালে ঠন্ করে হল একটা শব্দ। রাজা দেখলেন—অপরূপ এক পাথর। তার তলায় চন্দ্রকান্ত শিলায় তৈরী অপূর্ব এক সিংহাসন, তাতে কত রত্ন খচিত! বত্রিশটা সুন্দর সুন্দর পুতুল ধরে আছে সিংহাসনের পা-দানি। সিংহাসন দেখে ভোজরাজের আনন্দ ধরে না। তাঁর লোকলস্কর সিংহাসনটা তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু শত টানা-হেঁচড়াতেও সে আর ওপরে ওঠে না।

রাজা বললেন, 'মন্ত্রী, সিংহাসন উঠছে না কেন?'

মন্ত্রী ভেবে ভেবে বললেন, 'বোধ হয় এ সিংহাসন দেবতার বলে, হোম আর পুজো করলে উঠতে পারে।'

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সে সবের ব্যবস্থা করলেন। সিংহাসনও একটু একটু করে উঠতে লাগল। তারপর রাজা মহোৎসব করে সেই সিংহাসনটি নিয়ে চললেন রাজপুরীতে। রাজসভার এক পাশে বসানো হল সেই সিংহাসন। রাজসভা ঝলমল করতে লাগল। যেন দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা।

একদিন অনেক দান ধ্যান পূজাপার্বণ করে শুভক্ষণ শুভলগ্ন দেখে সেই সিংহাসনে রাজা বসতে গেলেন। কিন্তু যেমনি তার পা-দানিতে



পা দেওয়া অমনি ঘটে গেল এক কাণ্ড। পা-দানিটা ধরে ছিল সুন্দর সুন্দর বত্রিশটি পুতুল—তারা একে একে সবাই কথা বলে উঠল ঃ

'মহারাজ, কোথায় যান? যদি আপনার বিক্রমাদিত্যের মত উদারতা থাকে, বীরত্ব থাকে এবং সহিষ্ণুতা থাকে—তবেই আপনি এ সিংহাসনে বসতে পারেন।'

রাজা বললেন, 'যে সব গুণের কথা বললে—সে সব গুণই আমার আছে।'

কিন্তু অত সহজে রাজার নিস্তার নেই। বত্রিশ পুতুলের বত্রিশ কথা—বত্রিশটা গল্প। ভোজরাজকে বত্রিশবার তারা সে সব গল্প শোনালে। সব গল্পই সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণের কথায় ভরা। একটি পুতুল বললে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের শত্রুর প্রতি উদারতার কথা—যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েই তিনি মারা যান।

যেমনি ভোজরাজ সিংহাসনে বসবার জন্যে পা-দানিতে পা দিয়েছেন অমনি সেই পুতুলটি বলে উঠল, 'মহারাজ, বিক্রমাদিত্যের মত যাঁর উদারতা আছে তিনিই এ সিংহাসনে বসবার যোগ্য।'

ভোজরাজ বললেন, 'বেশ, তুমি তাঁর উদারতার কথা বল।'

পুতুলটি গল্প বলতে লাগল।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের মধ্যে পুরন্দরপুরী নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে বাস করত খুব বড় ধনী এক সওদাগর। মরার আগেই একদিন সওদাগর তার ছেলেকে ডেকে বললে, 'দেখ বাপু, আমার মরার পর হয়তো তোমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতে পাবে—এক সঙ্গে তোমরা না-ও থাকতে পার। তাই আমার যা ধনদৌলত আছে তা আমি তোমাদের চার ভায়ের নামে ভাগ করে দিয়ে গেলাম! সব পুঁতে রাখলাম আমার খাটের তলায়। আমার মরার পর যে যার ভাগ বুঝে নিও।'

কিছুদিন পরে সওদাগর মারা গেল। অমনি চার ভাই লেগে গেল খাটের তলায় মাটি খুঁড়তে। অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করে পেল চারজনের নামে চারটি হাঁড়ি। হাঁড়ি খুলে দেখে—কোথায় ধনদৌলত, কোথায় কি! বড় ভাইয়ের হাঁড়িতে আছে মাটি, মেজ ভাইয়ের হাঁড়িতে আছে খড়কুটো, সেজ ভাইয়ের হাঁড়িতে আছে কয়েকটা

হাড়গোড়, আর ছোট ভাইয়ের হাঁড়িতে আছে কিছু কয়লা। চার ভাই ভাবতে বসল—বাবার এ ভাগের মানে কি?

শেষ পর্যন্ত তারা ছুটল রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায়। কিন্তু সেখানেও কেউ ওই ভাগের মানে বের করতে পারলে না। তখন চার ভাই ছুটল প্রতিষ্ঠা নগরে—সেখানকার বড় বড় মহাজনদের কাছে জিজ্ঞেস করলে মাটি, খড়, হাড় আর কয়লার মানে। কিন্তু তারাও কেউ বলতে পারলে না। বললে শেষ কালে সেই নগরীর একজন কুমোর বাড়ির লোক—নাম তার শালিবাহন।

শালিবাহন বললে, 'এ তো সোজা কথা। বড় পেয়েছে মাটি—অর্থাৎ বাপের ভূসম্পত্তি। মেজ পেয়েছে খড়কুটো অর্থাৎ যতো মজুদ ধানচাল আছে সব। সেজ পেয়েছে হাড় অর্থাৎ পশুধন—গোরু ঘোড়া মহিষ ইত্যাদি। আর ছোট পেয়েছে কয়লা অর্থাৎ সোনার যা কিছু সব তার।'

শালিবাহনের কথা শুনে চার ভাই ভারি খুশী। তারা আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরল। তারপর মুখে মুখে এই মজার ভাগের কথা উঠল গিয়ে বিক্রমাদিত্যের কানে। রাজা শুনে খুব অবাক হলেন। অবাক হলেন শালিবাহনের বিচক্ষণতায়। তখুনি তিনি প্রতিষ্ঠা-নগরের মহাজনদের কাছে এই বলে চিঠি লিখলেন যে, তারা যেন পত্রপাঠ শালিবাহন নামে লোকটিকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

চিঠি পেয়ে মহাজনরা গেল শালিবাহনের কাছে। তারা তাকে রাজার চিঠি শুনিয়ে বললে, 'আপনি এক্ষুনি রাজার কাছে চলে যান।'

শালিবাহন বললে, 'কে তোমাদের রাজা—তাঁর কাছে গিয়ে আমার কি লাভ? তাঁর দরকার থাকলে তিনিই আসুন।'

মহাজনরা শালিবাহনকে জব্দ করবার জন্য তার সব কথা রাজার কাছে লিখে পাঠাল।

শালিবাহনের ব্যাপার দেখে বিক্রমাদিত্য ভয়ানক চটে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে

প্রতিষ্ঠা নগরে এসে হাজির হলেন। তারপর শালিবাহনের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন তাকে ডেকে আনবার জন্য।

কিন্তু শালিবাহন দূতকে বললে, 'আমি একা একা রাজার সঙ্গে দেখা করব না। তোমাদের রাজাকে বলে দিও—হাতী ঘোড়া রথ পদাতিক সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধক্ষেত্রেই দেখা হবে।'

দূত তো চলে গেল অবাক হয়ে।

শালিবাহনের রথ কোথায়, ঘোড়া কোথায়, হাতী কোথায়—পদাতিক সৈন্য-সামন্তই বা কোথায় ? সে তো সামান্য এক কুমোর।

কিন্তু দেখতে দেখতে মন্ত্রবলে সব হয়ে গেল। আসলে এই শালিবাহন হল শেষনাগের ছেলে—জন্মেছে কুমোর বাড়িতে মানুষরূপে। তার মন্ত্রবলে কুমোব বাড়ির মাটির তৈরী হাতী, ঘোড়া, রথ, সৈন্য—সব যেন প্রাণ পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে লেগে গেল শালিবাহনের ঘোরতর যুদ্ধ। কত হাতী ঘোড়া সৈন্যসামন্ত যে মারা গেল তার ঠিক নেই। বয়ে গেল রক্তের নদী। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখে পশুপাখি ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাল। শেষ দিকে শালিবাহন হারতে লাগল। বিক্রমাদিত্যের সেনাবাহিনী জগতে অজেয়। শালিবাহন তখন বিপদে পড়ে তার বাবা শেষনাগকে মনে মনে ডাকতে লাগল। শেষনাগ ছেলের বিপদে পাঠিয়ে দিলে হাজার হাজার সাপ। সাপগুলো ছুটে এল ফণা তুলে—কামড়াতে লাগল বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদের। সাপের কামড়ে একে একে মরতে লাগল তারা। দেখতে দেখতে বিক্রমাদিত্যের সেনাবাহিনী সাপের কামড়ে শেষ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে সম্পূর্ণ হেরে রাজপুরীতে ফিরে এলেন একা। দুঃখে ভরে আছে মন। এত সৈন্যসামন্ত, হাতী ঘোড়া—সব শেষ হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য তাঁর মৃত সৈন্যদের আবার বাঁচিয়ে তোলবার জন্য সর্পরাজ বাসুকির তপস্যা শুরু করে

দিলেন। সে তপস্যাও আবার তু-এক দিনের নয়—একেবারে একটানা ন'বছরের তপস্যা। রাজা এই ন'বছর ধরে জলে ডুবে ডুবে বাসুকি-মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত টলে উঠল বাসুকির আসন। একদিন বাসুকি এসে বললেন, 'মহারাজ, বর চাও।'



রাজা বললেন, 'হে সর্পরাজ, যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তা হলে আমার সৈন্যরা যাতে বেঁচে ওঠে তার জন্য আমাকে অমৃত-ঘট দান করুন।'

সর্পরাজ বাসুকি রাজাকে অমৃত-ঘট দান করলেন।

বিক্রমাদিত্য আনন্দিত মনে চললেন সেই অমৃত-ঘট নিয়ে—অমৃত ছিটিয়ে সাপের বিষে মরা তাঁর সৈন্যসামন্তদের বাঁচাবেন।

কিছুদূর যেতে না যেতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ব্রাহ্মণ—রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'জগতের বিখ্যাত দানবীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে আমি একটি জিনিস চাই।'

রাজা বললেন, 'কি চাই—বলুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'যদি আপনি তা দেন তা হলে বলব।'

রাজা বললেন, 'বলুন। আপনি যা চাইবেন—আমি তাই দেব।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমাকে আপনার অমৃত-ঘটটি দান করুন।'

রাজা চমকে উঠলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনাকে পাঠিয়েছে সত্যি করে বলুন দেখি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমাকে পাঠিয়েছে শালিবাহন।'

রাজা বললেন, 'বুঝেছি।'

রাজা ভাবতে লাগলেন—অমৃত-ঘট দেবেন কি-না। ওদিকে সাপের বিষে জর্জরিত হয়ে মরে পড়ে আছে তাঁর সৈনিকেরা।

রাজাকে ভাবতে দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারাজ, কি ভাবছেন? যাঁরা সজ্জন—তাঁদের কথার কখনও হেরফের হয় না। তাঁরা যে কথা একবার দেন—তার কখনও নড়চড় হয় না।'

রাজা বললেন, 'ঠিক—আপনি ঠিকই বলেছেন। অমৃতের এ কলসী আমি আপনাকেই দিচ্ছি—এই নিন।' এই বলে রাজা ব্রাহ্মণের হাতে অমৃত-ঘটটি তুলে দিয়ে ফিরে এলেন তাঁর রাজ্যে।

গল্প শেষ করে পুতুলটি বললে, 'রাজা বিক্রমাদিত্যের এমনি ছিল উদারতা।'

॥ 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা থেকে' ॥



বিশ্বাসঘাতক

বিশালা নগরীতে এক সময়ে নন্দ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। যেমন ছিল তাঁর রাজ্যপাট—তেমনি ছিল প্রতাপ। আর বিচারও ছিল বড় কড়া। যিনি কি-না রাজপুরোহিত, রাজার হিত চিন্তাই যাঁর কাজ, সেই রাজপুরোহিতকেই তিনি একবার সন্দেহ করে বধের আদেশ দিলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'যাও, ওকে মেরে ফেল।'

মন্ত্রী রাজপুরোহিত শারদানন্দকে বধ করবার জন্য নিয়ে চলল দক্ষিণ মশানে।

শারদানন্দ হা-হুতাশ করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন গুণী বিদ্বান মানুষ—মস্ত পণ্ডিত। কিন্তু হলে কি হবে, রাজার কোপের কাছে সব মিথ্যা। শারদানন্দ বলতে বলতে চললেন, 'হায়, রাজা যার ওপরে চটেন সে নিষ্পাপ হলেও পাপী, পটু হলেও অপটু, বীর হলেও ভীরু, দীর্ঘ পরমায়ু থাকলেও অপঘাতে মরে।'

তার দুঃখের কথা শুনে মন্ত্রীর প্রাণ গলল। মন্ত্রী তখন শারদানন্দকে একটা চোরা-কুঠুরির মধ্যে লুকিয়ে রেখে রাজাকে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনার আদেশে শারদানন্দকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

রাজার রাগ পড়ল।

তারপর যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। রাজ্যের নানা কাজে, আনন্দে, উৎসবে রাজা শারদানন্দের কথা একেবারে ভুলেই গেলেন।

একদিন রাজপুত্র জয়পাল শিকারে বের হলেন। কিন্তু বের হবার সময় নানারকম দুর্লক্ষণ সব দেখা গেল। শুরু হল অকাল বৃষ্টি, উল্কাপতন, বজ্রাঘাত, মড়া-কান্না।

মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিসাগর ছিল রাজপুত্রের খুব বন্ধু। বুদ্ধিসাগর চারদিকে অমঙ্গল দেখে বলল, 'রাজপুত্র, শিকারে আজ যাবেন না।'

রাজপুত্র বলল, 'কেন ?'

এই 'কেন'র উত্তর দিতে পারতেন শারদানন্দ থাকলে। তিনি ঠিক ঠিক বলে দিতে পারতেন—কি ঘটবে না ঘটবে। কিন্তু তিনি নেই।

তবু রাজপুত্রকে কেউ ঠেকাতে পারল না। রাজপুত্র অনেক লোকলস্কর নিয়ে শিকারে বের হয়ে গেল।

তারপর রাজপুত্র বনে গিয়ে অনেক শিকার করল। তাতে মন ভরল না। একটা কৃষ্ণসার হরিণ দেখে তার পিছু ধাওয়া করল। হরিণ ছুটল গভীর মহাবনে—ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপুত্রও ছুটল তার পিছনে। এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল—তার লোকলস্কর নেই, তারা সব নগরে ফিরে গেছে। ঠিক এই সময়ে হরিণটাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজপুত্র তখন একা একা ফিরতে লাগল। কিছুটা এসেই একটি সরোবর। জল খাবার জন্য রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাজপুত্র অঞ্জলি ভরে জল খেল। তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় এসে বসল।

যেমনি বসা অমনি একটা মস্ত বাঘ হুঙ্কার দিয়ে রাজকুমারের সামনে এসে পড়ল। দড়ি ছিঁড়ে ঘোড়াটা কোথায় ছুটে পালাল। রাজকুমারও তাড়াতাড়ি কোনও রকমে একটা গাছে গিয়ে উঠল।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। এই গাছের উপরে আগে থেকেই একটা ভালুক উঠে বসে ছিল। তার দিকে চোখ পড়তেই রাজপুত্রের বুক ধড়াস্ করে উঠল।

রাজকুমারের ভয় দেখে ভালুক বলল, 'রাজপুত্র, ভয় কর না। আজ তুমি আমার শরণাগত, তাই তোমার আমি কোনও অনিষ্ট করব না। ভালো করে গাছে উঠে বস। বাঘকে ভয় পেও না।'



ভালুকের কথা শুনে রাজপুত্রের ধড়ে প্রাণ এল, গাছের উপর ভালো করে জেঁকে বসল।

ওদিকে বাঘটাও গাছের তলা আগলিয়ে বসে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে রাত্রি হল। রাজপুত্রের ভয়ানক ঘুম পেতে লাগল। সারাদিন ছুটোছুটি করে ভয়ানক ক্লান্ত—

ঘুম তো পাবেই। রাজপুত্র ঢুলতে লাগল। আর গাছের নীচে বাঘটার জিভ দিয়ে জল পড়তে লাগল।



ভালুক তখন রাজপুত্রকে ডেকে বলল, 'গাছ থেকে পড়ে যাবে র‍্যাজপুত্র। এস—আমার কোলে এসে ঘুমোও।'

এই কথা শুনে রাজপুত্র ভালুকের কাছে সরে গেল আর ভালুকের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে নামল গভীর ঘুম।

তখন গাছের তলা থেকে বাঘ বলল, 'ওহে ভালুক, এবার রাজপুত্রকে দাও নীচে ফেলে।'

ভালুক বলল, 'যে শরণাগত, তাকে এমনি করে মেরে ফেললে ভয়ানক পাপ হয়।'

বাঘ বলল, 'ভালুক, লোকটা আমাদের শত্রু। মানুষের মত খারাপ আর কেউ নেই। ও আবার যেদিন শিকার করতে আসবে সেদিন আমাদের সকলকেই মেরে ফেলবে। কেন তাকে কোলে নিয়ে সারা রাত বসে আছ? তার চেয়ে দাও ওকে টপ্ করে ফেলে —আমিও গপ্ করে খেয়ে চলে যাই।'

ভালুক একই ভাবে বলল, 'এ লোকটা যেমনি হোক, শরণাগতকে আমি ছাড়তে পারি না।'

বাঘ আর কি করে, মন খারাপ করে বসে রইল। গাছতলা ছাড়ল না।

এদিকে রাজকুমার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার পর জেগে উঠল। ভালুক বলল, 'রাজকুমার, এবার আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, তুমি জেগে থাক। খবরদার, কারুর কোনও কথা শুনো না।'

ভালুক তো ঘুমোল, রাজপুত্র জেগে রইল।

বাঘ তখন আবার বলল, 'ওগো রাজকুমার, তুমি বুদ্ধিমান মানুষ —খবরদার, ওই ভালুকটাকে বিশ্বাস কর না। ও তোমাকে নখে চিরে ফেলবে। জানই তো, শাস্ত্রে আছে—যে সব জন্তুর বড় বড় নখ, তাদের বিশ্বাস করতে নেই। তাই বলছি, ভালুকটাকে দাও টপ করে ফেলে—আমিও গপ্ করে খাই। তারপর আমি চলে যাই বনে—তুমি চলে যাও নগরে।'

বাঘের কথা রাজপুত্রের মনে ধরল। কতক্ষণ আর আপদ কোলে করে গাছের উপর বসে থাকা যায়! রাজপুত্র এই ভেবে দিল ভালুককে গাছ থেকে ফেলে।

বেচারী ভালুক। যাই হোক গাছ থেকে পড়তে পড়তে কোনও রকমে সে একটা গাছের ডাল ধরে ফেলল। তারপর অকৃতজ্ঞ রাজপুত্রের দিকে চেয়ে রাগে তার সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল। রাজপুত্র তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

ভালুক বলল, 'কি পাপিষ্ঠ, এখন ভয় পাচ্ছ কেন! যাও, আজ থেকে তুমি স-সে-মি-রা এই কথা বলে বলে পিশাচ হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

ভালুকের অভিশাপে রাজপুত্র পিশাচ হয়ে গেল এবং স-সে-মি-রা এই কথা বলতে বলতে সারা বন ঘুরে বেড়াতে লাগল। খাদ্যাখাদ্যে বিচার নেই—একটা বর্বর পাগল।

ওদিকে রাজপুরীতে হুলুস্থুল। শিকার থেকে সবাই ফিরে এল কিন্তু রাজপুত্র তো ফেরেনি! রাজা ভাবতে বসলেন, মন্ত্রী ভাবতে বসলেন—রানী কাঁদতে লাগলেন। তারপর একদিন মন্ত্রী সেই বনে এলেন রাজপুত্রকে খুঁজতে। খোঁজাখুঁজি আর কি, রাজপুত্রকে সহজেই পাওয়া গেল। সে তখন পিশাচ হয়ে ঘুরছে আর মুখে এক কথা—যার মাথা নেই, মুণ্ড নেই, 'স-সে-মি-রা ·· স-সে-মি-রা'।

যাই হোক, রাজপুত্রকে কোনও রকমে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনা হল। তারপর কত বদ্যি কত ওষুধ দিল, কত তুক্‌তাক্ করা হল, রাজপুত্র সারল না। মুখে তার এক কথা—'স-সে-মি-রা।'

রাজা একদিন দুঃখ করে মন্ত্রীকে বললেন, 'হায়, এমন দুর্দিনে যদি শারদানন্দ থাকত, তা হলে রাজকুমারকে এক মুহূর্তে সারিয়ে দিত।'

শুনে মন্ত্রীর মনে আনন্দ হল কিন্তু কিছু বললেন না। কে জানে, শারদানন্দকে মন্ত্রী বাঁচিয়ে রেখেছে শুনলে রাজা আবার হয়তো মন্ত্রীর উপরেই চটে যাবেন। মন্ত্রী তাই চুপ করে রইলেন।

রাজা বললেন, 'যাক, শারদানন্দ যখন নেই আর কি করা যাবে! এখন রাজ্যে ঘোষণা করে দাও—যে আমার ছেলেকে ভাল করে দেবে তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেব।'

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মন্ত্রী সোজা ঘরে ফিরলেন। শারদনান্দকে রাজার সব কথা বললেন।

শারদানন্দ বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন। রাজাকে গিয়ে বলুন যে, আপনার মেয়ে মন্ত্রটন্ত্র কিছু জানে—সে পর্দার আড়াল থেকে রাজকুমারকে একবার দেখবে—সারান যায় কিনা।'

মন্ত্রী কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, 'তারপর?'

শারদানন্দ বললেন, 'পর্দার আড়ালে আমি থাকব। রাজকুমারকে কেমন করে সারানো যায়—সে আমি দেখবো।'

শারদানন্দের পরামর্শ মত মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে সব বললেন। তখন রাজা তাঁর পাত্রমিত্রদের নিয়ে রাজপুত্রকে সঙ্গে করে মন্ত্রীর বাড়িতে এলেন। যেন মন্ত্রীর বাড়িতেই রাজসভা বসে গেল। সকলের মাঝখানে বসে রাজপুত্রের মুখে সেই এক কথা—'স-সে-মি-রা।'

শারদানন্দ আগে থেকে পর্দার আড়ালে বসে ছিলেন। মস্ত পণ্ডিত মহাজ্ঞানী শারদানন্দ। তিনি রাজপুত্রের পিশাচ হয়ে যাবাব সমস্ত ঘটনা ধ্যানবলে জানতে পেরেছিলেন। রাজপুত্রের 'স-সে-মি-রা' শুনে তিনি প্রথম অক্ষর 'স' দিয়ে দু'পদ শ্লোক বললেন:

সদ্ভাবে যে বন্ধু হল, ঠকিয়ে কি লাভ তায়?
কোলে যে জন ঘুমিয়ে তারে মেরে কি ফল হায়।

এই শ্লোকটি বলবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার প্রথম অক্ষর 'স' ছেড়ে বলতে লাগল, 'সে-মি-রা—সে-মি-রা।'···

তখন শারদানন্দ পর্দার আড়াল থেকে আবার ছোট একটি শ্লোক বললেন। এবার আদ্য অক্ষর হল 'সে' ঃ

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অথবা গঙ্গাস্নানে
ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়,
কিন্তু যে বন্ধুর সাথে শঠতা বঞ্চনা করে
তার পাপ নাহি হয় ক্ষয়।

এবার রাজপুত্র 'সে' অক্ষর ছেড়ে শুধু বলতে লাগল, 'মি-রা·· মি-রা'।

শাবদানন্দ তখন তৃতীয় শ্লোক বললেন,—তার প্রথম অক্ষর হল 'মি' ঃ

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক যেই জন,
এ তিনের মুক্তি নাই—নবকে কাটায় আজীবন।

শ্লোক শুনে রাজপুত্র 'মি' অক্ষব ছেড়ে এবার শুধু বলতে লাগল 'রা-বা-বা'।

শাবদানন্দ তখন শেষ শ্লোকটি বললেন, তার প্রথম অক্ষর হল.'বা' ঃ

রাজা তোমার ছেলের যদি সত্যিকারের সুকল্যাণ চাও
দেবতাদের পূজা কর—ব্রাহ্মণদের দান অর্ঘ্য দাও।

এবার রাজপুত্র আর কিছুই বলল না। শাপমুক্ত হয়ে চুপচাপ বসে রইল। পাত্রমিত্ররা অবাক। মন্ত্রীর মেয়ে কেমন করে এত সব জানল! রাজারও কেমন সন্দেহ হল। তিনি জোর করে সামনের পর্দাখানি সরিয়ে দিলেন। এবার দেখা গেল রাজপুরোহিত শারদানন্দকে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা রাজপুরোহিত শারদানন্দকে প্রণাম করলেন। তাঁর কাছে জোড় হাতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

॥ 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' থেকে ॥



রানী ময়নামতী

রাজা তো রাজা—মানিকচন্দ্র রাজা। তাঁব কালের বাঙলা দেশেব সুখের আর অন্ত ছিল না। যাব কোনও রকমে দিন চলে তার দুয়ারেও ছিল ঘোড়া বাঁধা। দাসী বাঁদী তসর পবে, কারও পুকুরেব জল কেউ খায় না। ছেলেরা খেলা করে সোনার ভাঁটায়। চোর নেই, বাটপাড় নেই—সোনাদানা পড়ে থাকে উঠোনের ধুলোয়।

এমন রাজার রাজ্য—সেখানে এল দক্ষিণ থেকে এক মন্ত্রী। তার লম্বা লম্বা দাড়ি। সে এসে সুখের রাজ্য একদিন ছারখার করে দিলে। বাড়িয়ে দিল প্রজাদের খাজনা। খাজনা আদায়ের দাপটে প্রজারা অস্থির। কারও বিকিয়ে গেল লাঙল-গোরু, কারও বিকিয়ে গেল দুধের ছাওয়াল। প্রজারা 'হায় হায়' করে দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল—গাঁয়ের ক্ষেতখামার হয়ে উঠল জঙ্গল।

আর তো সয়না এ পোড়া কপাল। ছোট প্রজা বড় প্রজা সব এক হয়ে মণ্ডলের বাড়ি গেল পরামর্শ করতে—কি করে

না করে। সেখানে তারা কিছুই ঠিক করতে পারল না। গেল শিবঠাকুরের কাছে। তাদের দুঃখের কথা শিবঠাকুরের কাছে নিবেদন করে বললে—'রাজার রাজ্যে পাপ ঢুকেছে। কি করি উপায়?'

শিবঠাকুর বললেন, 'কোনও ভয় নেই—রাজা মাত্র আর ছ'মাস বাঁচবে। কিন্তু আমার এ কথা খবরদার রানী ময়না-মতীর কানে যেন না যায়। সে তন্ত্রমন্ত্র জানে—তার জোরে সে আমার কৈলাসপুরী লণ্ডভণ্ড করে দেবে।'

প্রজারা মুখ বুজে ঘরে ফিরে এল। এসে গঙ্গার ধারে আয়োজন করল ধর্মপুজোর। একদিন রবিবারে উপোস করে ধর্ম ঠাকুরের কাছে বলি দিল শ্বেত পাঁঠা। খাঁচা ভরে হাঁসপায়রা এনে হাঁসগুলোকে ছেড়ে দিল জলে, পায়রাগুলো উড়িয়ে দিল আকাশে। গঙ্গার ঘাটে ধর্মপুজোর মন্দিরে দিল ধূপ আর দীপ।

রবিবারের পুজো শেষ হল—সোমবার হল রাজার জ্বর, মঙ্গলবারে রাজা কাহিল, বুধবারে ছাড়লেন অন্নজল। সাত দিন পরে চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে দেখলে—রাজা আর মাত্র ছ'মাস বাঁচবে। গোদা-যম নামে এক যমদূতকে সেইদিনই চিঠি লিখে দিল এই বলে যে, রাজা মানিকচন্দ্র অধার্মিক হয়ে গেছে—তার গলা আর হাত বেঁধে যমালয়ে হাজির করতে হবে। দিনে দিনে রাজার আয়ু হল ক্ষয়। এমনি করে কেটে গেল একে একে ছ'টি মাস। রানী ময়নামতী তখন স্বামীর কাছে ছিল না। রাজার অসুখের কথা কেউ তাকে জানাতেও যায়নি। ছ'মাসের শেষ মাসে রাজার যখন মর মর অবস্থা—তখন রাজার ভাই নেঙ্গা গেল ময়নামতীর কাছে খবর নিয়ে।

খবর পেয়ে ময়নামতী ছুটে এল রাজার কাছে। রাজাকে বললে, 'আমি মহাজ্ঞান মন্ত্র জানি মহারাজ—আমার কাছ থেকে সেই মন্ত্র আপনি শিখে নিন। তা হলে আপনি আর মরবেন না।'

রাজা মানিকচন্দ্র বললেন, 'আমার মন্ত্রের দরকার নেই—আমার এখুনি মরণ হোক। স্ত্রীর কাছে শেষকালে মন্ত্র শিখব?'

অতি দর্পে হত লঙ্কা। রাজা মানিকচন্দ্রও অতি দর্পে স্ত্রীর কাছ থেকে মন্ত্র শিখলেন না—মরণের দিকে এগিয়ে চললেন।

ওদিকে যমপুরীতে চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে দেখলেন—রাজার ছ'মাসের পরমায়ু আজ শেষ। চিত্রগুপ্ত তখন ডাক দিলেন দু'জন যমদূতকে। একজনের নাম ভাড়ুয়া যম। ডেকে বললেন, 'অধার্মিক রাজা মানিকচন্দ্রকে এবার নিয়ে এস যমালয়ে।'

লোহার ডাণ্ডায় চামড়ার দড়ি বেঁধে গোদা-যম চলল মানিকচন্দ্রের রাজপুরীতে। ভাড়ুয়া যমও রাজার শিয়রের কাছে গিয়ে হাজির। বেলা তখন দুপুর। সেই ভর দুপুর বেলা ভাড়ুয়া যম রাজাকে তৃষ্ণা ছুঁড়ে মারল। যেই মারা অমনি রাজা 'জল জল' করে চীৎকার করে উঠল। ময়নামতী ছুটে এল কাছে।

রাজা বললে, 'জল দাও ময়নামতী—তেষ্টায় প্রাণ গেল।'

রানী ময়নামতী মহাজ্ঞান মন্ত্রের জোরে দেখতে পেলে—ভাড়ুয়া যম দাঁড়িয়ে আছে রাজার শিয়রে। ময়নামতী রাজাকে বললে, 'মহারাজ—এখন অন্য কোনও রানীর হাতে জল খান। আমি জল আনতে গেলেই ভাড়ুয়া যম আপনাকে নিয়ে চলে যাবে।'

রাজার কুমতি হল। রাজা বললে, 'না, তোমার হাতেই জল খাব। তা না হলে আমার তেষ্টা মিটবে না। তুমি জল আনতে যাও—আর আমাকে একটা খাঁড়া দিয়ে যাও। যমদূত এলে আমি তাকে কেটে ফেলব।'

রাজার কথামত ময়নামতী চলল জল আনতে। যেমনি ঘরের বার হওয়া অমনি সাত-সাতটা যমদূত রাজার ঘাড়ে এসে পড়ল। রাজাকে তারা বাঁধল চামড়ার দড়ি দিয়ে—তারপর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে লাগল।

রাজা চীৎকার করে উঠল, 'ওগো তোমরা কে মারছ আমায়? একটু জল খেয়ে নিই।'

যমদূতরা বললে, 'তোমার রানী গোরক্ষনাথের বরে পেয়েছেন মহাজ্ঞান মন্ত্র। সে আমাদের একবার হাতের মুঠোয় পেলে আর আমাদের রক্ষা রাখবে না। এই বেলা তোমাকে না নিয়ে গেলে আমাদের বিপদ।' এই বলে তারা রাজাকে চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে গেল যমালয়ে।

ময়নামতী তখন গঙ্গার তীরে—কাঁখে সোনার কলস। গঙ্গাকে ডেকে ময়নামতী বললে, 'রাজা মানিকচন্দ্র তোমায় এত দিন অনেক পুজো করেছেন। আজ তাঁকে এক কলসী জল দাও—যাতে রাজা প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠেন।'

গঙ্গা বললেন, 'কলস ভরে কার জন্য জল নিয়ে যাবে ময়নামতী—তোমার স্বামী যে আর বেঁচে নেই।'

শুনে ময়নামতী ডাক পেড়ে কেঁদে উঠল—গঙ্গায় দিল ঝাঁপ। গঙ্গার কথা ঠিক কি-না জানবার জন্য সাত হাত জলের তলায় বসল যোগাসন করে। তখন দেখল—কপালের সিঁদুর তার মলিন, হাতে দুধের বরণ শাঁখা দেখল কালো হয়ে গেছে।

তারপর ময়নামতী কাঁদতে কাঁদতে চলল যমালয়ের দিকে। যেতে যেতে পথে পড়ল দুরন্ত এক নদী। এ নদী পার হতে লাগে ছ'মাস—তাতে উঠছে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ! ময়নামতী গোরক্ষনাথের নাম স্মরণ করে নিজের পরনের শাড়ি কিছুটা ছিঁড়ে পেতে দিলে জলের ওপরে। তার ওপরে বসে ময়নামতী পার হয়ে গেল সেই দুরন্ত নদী অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে।

নদীর ওপারে যমালয়।

ছত্রিশ কোটি যমদূত তখন বসেছে সভা করে। যেমনি তারা ময়নামতীকে দেখতে পেলে অমনি কে কোন্ দিকে ছুটে পালাল। তার মধ্যে গোদা-যম ভয়ে নিজের ঘরে গিয়ে লুকাল।

ময়নামতী ধ্যান করে বুঝতে পারল—গোদা-যম ঘরের কোণে লুকিয়ে আছে। অমনি ময়নামতী ফুলওয়ালী মালিনীর রূপ ধরে

ঢুকে গেল গোদা-যমের বাড়িতে। তাই দেখে গোদা-যম বাঁশের বেড়া ভেঙে ছুটে পালাল ঘরের কোণ থেকে। পেছনে পেছনে ময়নামতী ছুটলে 'মার মার' করে।

ময়নামতীর তাড়া খেয়ে গোদা-যম চট করে চিংড়ী মাছের রূপ ধরে জলে গিয়ে লুকাল। সঙ্গে সঙ্গে ময়নামতী ধ্যানে তা জানতে পারলে—অমনি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড মহিষের রূপ ধরে। তারপর গোদা-যমকে ঠেসে ধরলে জলের ভেতরে। তাতে তার ডানদিকের পাঁজরের একটা হাড়ই গেল ভেঙে। গোদা-যম তখন পুঁটি মাছ হয়ে জলের মধ্যে তর তর করে পালাতে লাগল। অমনি ময়নামতী পানকৌড়ি হয়ে তাকে তাড়া করল। গোদা-যম সঙ্গে সঙ্গে পাঁকাল মাছ হয়ে পাঁকের মধ্যে লুকিয়ে গেল। ময়নামতীও ছাড়বার মেয়ে নয়। সেও সঙ্গে সঙ্গে রাজহাঁসের রূপ ধরে পাঁক ঠুকরে চলল। আর নিস্তার নেই দেখে গোদা-যম একেবারে পাতালে গিয়ে লুকাল। পেছনে পেছনে ময়নামতীও গিয়ে হাজির। শেষ পর্যন্ত গোদা-যম ধরা পড়ে গেল। ময়নামতী তাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললে ওপরে—তাকে মারতে লাগল কিল চড় ধাক্কা। একে তো গোদা-যমের ডান পাঁজর একখানা ভেঙে গেছে—এখন ময়নামতীর মার খেয়ে আর সে তিষ্ঠোতে পারল না। চট করে পায়রার রূপ ধরে উড়ে গেল আকাশে। পেছনে ময়নামতীও ছুটল বাজপাখির রূপ ধরে। ছুটে গিয়ে ধরল পায়রার টুঁটি। তারপর সমানে চলল গোদা-যম আর ময়নামতীর পাল্লা। গোদা-যম হল ইঁদুর তো ময়না হল বেরাল। শেষকালে গোদা-যম বৈষ্ণব রূপ ধরে গোঁসাইদের মধ্যে গিয়ে মিশে গেল। অমনি ময়নামতী মাছি রূপ ধরে তাকে কামড়ে অস্থির করে তুললে।

বৈষ্ণব গোঁসাইরা বৈষ্ণব মূর্তি গোদা-যমকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'এ লোকটার গায়ে অত মাছি বসে কেন? নিশ্চয়ই ও অপবিত্র। দাও ওকে তাড়িয়ে!'

যেমনি তারা গোদা-যমকে তাড়া করলে অমনি ময়নামতী নিজ মূর্তি ধরে গোদা-যমের চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে এল এক তে-মাথা রাস্তায়। বাঁধল তার কোমরে দড়ি। ময়নামতী হাতে নিলে একটা হেঁতালের বাড়ি। তাই দিয়ে পিটোতে পিটোতে নিয়ে চলল গোদা-যমকে। বেচারী গোদা-যম তখন মর-মর।

ময়নামতী বললে, 'আমার স্বামীকে ফিরে দাও গোদা-যম, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।'

গোদা-যম বললে, 'ছেড়ে দিতে আমি পারব না। তোমার স্বামী অধার্মিক হয়ে গেছল। তার আর পরমায়ু নেই।'

ময়নামতী কেঁদে উঠল, 'আমার স্বামী ফিরে দাও যম, আমার ঘর যে খালি।'

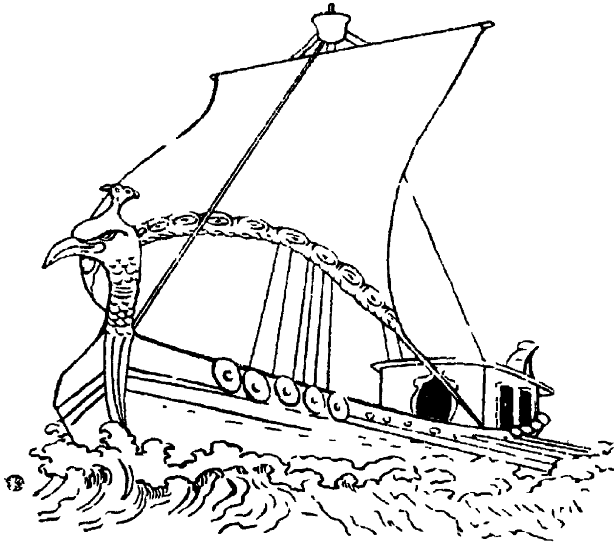
গোদা-যম কথা বললে না।

ময়নামতী তখন মহাজ্ঞান মন্ত্রবলে সমস্ত দেবতাকে ডেকে আনল—ডেকে আনল তার দেবতা গোরক্ষনাথকে। নারদ মুনি এলেন ঢেঁকিবাহনে। রামলক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব—সবাই এসে হাজির হলেন ময়নামতীর ডাকে।

ময়নামতী ছুটে গিয়ে গোরক্ষনাথের পায়ে মাথা কুটতে লাগল। কেঁদে কেঁদে বললে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর গোরক্ষনাথ—যম আমার স্বামী ফিরিয়ে দিচ্ছে না।'

কিন্তু যে রাজা অধার্মিক—তাকে আর ময়নামতী ফিরে পেল না। দেবতারা তাকে আশীর্বাদ করে বর দিলেন, 'ঘরে ফিরে যাও ময়নামতী। তোমার ছেলে হবে রাজরাজেশ্বর—মহাজ্ঞানী ভুবনবিখ্যাত।'

॥ 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' থেকে ॥



পুনর্মিলন

এক যে ছিল সওদাগর—তার নাম ধনেশ্বর সাধু। সাধুর ছিল অনেক ধনরত্ন, ঘোড়াশালে ঘোড়া আর দুয়ারে বাঁধা হাতী। এক সময়ে সওদাগরকে ধরল জুয়াখেলার নেশায়। জুয়ায় বাজি ধরে একে একে সওদাগর তার সমস্ত ধনরত্ন হাতীঘোড়া হারাল। সর্বস্বান্ত হয়ে শেষে এক ছেলে এক মেয়ের হাত ধরে ধনেশ্বর পথে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির নাম কাজলরেখা—ছেলের নাম রত্নেশ্বর। মেয়েটি বড়।

একদিন এক সন্ন্যাসী এসে সওদাগরকে একটি শুক পাখি আর একটি অপরূপ আংটি দিয়ে বলল, 'এই শুকটি হল ধর্মমতী শুক। এই শুকপাখির কথামত চললে তোমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।' এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেল।

দুঃখের সাগরে পড়ে একদিন সওদাগর শুককে বলল, 'বল পাখি, কিসে আমার দুঃখ ঘুচবে। আমার রত্ন-মন্দির ঘর গেল, হাতী গেল, ঘোড়া গেল—জল খাওয়ার ঘটিটুকুও নেই। এখন বল, কেমন করে ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঁচাই।'

ধর্মমতী শুক বলল, 'এবার তোমার দুঃখ শেষ হবে। তুমি বাজারে গিয়ে আংটিটা বেচে এস। সেই টাকায় আবার নৌকো গড়, বাণিজ্য করতে যাও।'

শুকের কথা মিথ্যা নয়। সাধু আংটি বেচে নৌকো গড়ল, বাণিজ্যে গেল—তারপর অনেক ধনরত্ন নিয়ে ঘরে ফিরল। টাকার দুঃখ ঘুচল সাধুর কিন্তু আর এক দুঃখ গেল না। সুন্দরী কাজলরেখার বর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সওদাগর শুককে আবার একদিন মনের দুঃখের কথা খুলে বলল।

শুক বলল, 'কাজলরেখার বিয়ে হবে মরা এক রাজকুমারের সঙ্গে। ওই মেয়েকে আর ঘরে না রেখে বনবাসে দিয়ে এস। তোমার এ দুঃখ ঘুচতে এখনও অনেক দেরি।'

শুকের কথা শুনে সওদাগর 'হায় হায়' করে কাঁদতে বসল। তারপর সন্ন্যাসীর উপদেশ মনে করে একদিন শুকের কথামত নৌকো ভাসিয়ে কাজলরেখাকে বনবাসে দিতে চলল।

নৌকো চলল উজান ঠেলে। অনেক দূরে এসে দেখল এক মহাবন—জনমানবের চিহ্ন নেই। সওদাগর সেইখানে নৌকো থামিয়ে কাজলরেখাকে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল। কাজলের ভয় করতে লাগল। সে ভাবতে লাগল—বাবা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা অনেক দূর এসে পড়ল। মাথার ওপর দুপুরের রোদ তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কাজলরেখা আর চলতে পারে না। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে যায়। এমন সময় সামনে দেখা গেল একটা পুরানো মন্দির। তার কবাট বন্ধ। সওদাগর মেয়েকে নিয়ে সেই মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে পড়ল।

কাজলরেখা বলল, 'বাবা, একটু জল খাব।'

সওদাগর গেল জলের সন্ধানে। গেল তো গেলই।

কাজলরেখা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মন্দিরটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে কবাটে লাগল তার হাতের ছোঁয়া। অমনি কবাট

খুলে গেল। কাজলরেখা মন্দিরের ভিতরটা দেখতে ঢুকল। যেই ঢোকা অমনি কবাট বন্ধ হয়ে গেল। শত টানাটানিতেও সে দরজা আর খোলে না। ভয় পেয়ে কাজলরেখা কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সওদাগর ওদিকে জল নিয়ে ফিরে এসে মন্দিরের ভেতর কাজলরেখার কান্না শুনতে পেল। দরজায় ধাক্কা দিয়ে সওদাগর ডাকল, 'কাজল, কবাট খোল।'

কে খুলবে সে কবাট! সওদাগর সেটাকে ভাঙবার চেষ্টা করল—পারল না। কাজলরেখা বন্দিনী হয়ে রইল।

সওদাগর শুধাল, 'কাজল, মন্দিরের ভেতর কি আছে?'

কাজলরেখা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'একজন মরা রাজকুমার—সর্বাঙ্গে তার ছুঁচ ফোটানো। তার মাথার কাছে জ্বলছে ঘিয়ের বাতি।'

তার কথা শুনে সওদাগর চমকে উঠল। মনে পড়ল শুক পাখির কথা। সওদাগর বলল, 'মাগো কাজলরেখা, ওই মরা রাজকুমার তোমার এ জন্মের স্বামী। যেমন করে পারিস—স্বামীকে তোর বাঁচিয়ে তুলিস। তুই রইলি তোর কপাল নিয়ে।' এই বলে সওদাগর মহা দুঃখে ঘরে ফিরে গেল।

কাজলরেখা সেই মরা রাজকুমারের মাথার কাছে বসে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কবাট খুলে গেল। কাজলরেখা দেখল—মন্দিরে একজন সন্ন্যাসী ঢুকছে। কাজলরেখা ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা কুটতে লাগল।

সন্ন্যাসী তাকে আশীর্বাদ করে বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই মা। ওই মরা রাজকুমারকে আমিই এ বনের মধ্যে এনে রেখেছি। ও জন্ম থেকেই অমনি মরে আছে—আমার মন্ত্রের জোরে ও বড়ও হয়ে উঠেছে। এখন তোমার হাতের ছোঁয়ায় ও প্রাণ পাবে।'

কাজলরেখা অবাক হয়ে সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল।

সন্ন্যাসী কতকগুলো কি পাতা ছিঁড়ে এনেছিল। সেইগুলো কাজলরেখার হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি রাজকুমারের গায়ের ছুঁচগুলো সব তুলে ফেল—সব শেষে তুলবে চোখের ছুঁচ। তারপর চোখে এই পাতার রস ঢেলে দেবে। তাহলেই রাজকুমার বেঁচে উঠবে। কিন্তু খবরদার, নিজে যেচে তোমার পরিচয় দিতে যেয়ো না। তাহলেই রাজকুমার আবার মরে যাবে। তোমার বাপের সেই শুক পাখিটি এসে রাজকুমারকে যতদিন না তোমার পরিচয় দেয় ততদিন তোমার দুঃখের শেষ হবে না।' এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেল।



তারপর কাজলরেখা সন্ন্যাসীর কথামত একভাবে বসে বসে রাজকুমারের গায়ের ছুঁচ তুলতে লাগল—আহার নাই, নিদ্রা নাই। কোনদিক দিয়ে কেটে গেল সাত দিন সাত রাত। যখন দু'চোখের দু'টি ছুঁচ শুধু তুলতে বাকী, তখন কাজলরেখা গেল স্নান করতে। মনে ভাবল—স্নান করে শান্ত পবিত্র হয়ে শেষ ছুঁচ তুলে রাজকুমারের জীবন আনব।

মন্দিরের অল্প দূরে মস্ত এক সরোবর। কাজলরেখা স্নানে নামল। অমনি ঘাটে একজন লোক একটি মেয়েকে নিয়ে এসে

হাজির। সে বলল, 'আমার মেয়েটিকে দাসী রাখবে, মা? পেটের জ্বালায় ওকে বেচতে বেরিয়েছি।'



কাজলরেখা ভাবল—হায়, এক বাপ তাকে দিয়েছে বনবাসে, আর এক বাপ এসেছে অভাগী মেয়েটিকে বেচতে। মেয়েটির দুঃখে কাজলের চোখে জল এল। সে হাতের কাঁকন দিয়ে মেয়েটিকে কিনে নিল। কাঁকন দিয়ে কিনল, তাই তার নাম হল কাঁকন দাসী। কাঁকন দাসীর বাপ মেয়ে বেচে চলে গেল।

কাজলরেখা কাঁকন দাসীকে বলল, 'তুমি ওই মন্দিরের মধ্যে যাও। ওখানে একজন মরা রাজকুমার আছে—চোখে তার ছুঁচ ফোটানো। তাকে দেখে ভয় পেয়ো না। তার মাথার কাছে কতকগুলো পাতা আছে। তুমি গিয়ে তার রস করে রাখ। আমি গিয়ে চোখের ছুঁচ তুলে চোখে রস ঢেলে দেব। তাহলেই রাজকুমার বেঁচে উঠবেন।'

কাঁকন দাসীর মন কুটিল। সে মন্দিরে গিয়ে রাজকুমারের চোখের ছুঁচ তুলে ফেলল, চোখে দিলে সেই পাতার রস। অমনি রাজকুমার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। কাঁকন দাসীকে বলল, 'মিতু

যেই হও—আজ তুমি আমায় প্রাণ দিয়েছ, তোমার চেয়ে আপন আমার আর কেউ নেই। আজ থেকে তুমি হলে আমার রানী।'

এমন সময় কাজলরেখা স্নান শেষ করে ফিরে এল। রাজকুমার তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে!'

কাঁকন দাসী বলল, 'ওকে আমার কাঁকন দিয়ে কিনেছি—ওর নাম কাঁকন দাসী।'

শুনে কাজলরেখার কান্না পেল। তবু সন্ন্যাসীর কথা মনে করে সে নিজের পরিচয় দিল না। সেদিন থেকে কাঁকন দাসী হল রাজরানী, আর কাজল হল কাঁকন দাসী।

তারপর রাজপুত্র একদিন ফিরে চলল নিজের রাজ্যে। কাজল তাদের সঙ্গে গেল দাসীর মত। দেশে ফিরে রাজকুমারের নাম হল ছুঁচ-রাজা।

কাজলরেখা রাজবাড়িতে দাসীর মত থাকে—দাসীর মত খায়। জল তোলে, বাসন মাজে, নকল রানীর সেবা করে। তবু রানীর মন পায় না। এমনি করে দিন কাটতে থাকে।

এদিকে রাজকুমারের কেমন সন্দেহ হয়। নকল রানীর ব্যবহার বড় খারাপ—দাসী-চাকরানীর মত তার কথাবার্তা, চালচলন। আর কাজলরেখার গুণের সীমা নেই। যেমন রূপ তেমনি তার মিষ্টি স্বভাব। ওদের দুজনকে পরীক্ষা করার জন্য রাজকুমার একদিন নকল রানীকে বলল, 'আমি দেশভ্রমণে যাব—তোমার জন্য কি আনব, বল।'

নকল রানী দাসী-চাকরানীর মতই বলল, 'বেতের বাক্স, বেতের কুলো, তেঁতুল কাঠের ঢেঁকি, পিতলের নথ আর কাঁসার মল।'

রাজকুমার তো অবাক। তারপর সে কাজলরেখাকে শুধাল, 'তোমার জন্য কি আনব, বল?'

কাজল বলল, 'আমার কিছু দরকার নেই—আপনার ঘরে আমি সুখে আছি।' কিন্তু রাজকুমার খুব পীড়াপীড়ি করাতে বলল, 'তবে আমার জন্য একটা ধর্মমতী শুক কিনে আনবেন।'

রাজকুমার দেশভ্রমণে গেল। নকল রানীর জিনিস পাওয়া গেল সহজেই। কিন্তু কাজলরেখার ধর্মমতী শুক আর কোথাও পাওয়া যায় না। খুঁজে খুঁজে গেল সে ধনেশ্বর সাধুর দেশে। ঢোল শহরৎ করে জানিয়ে দিল—যত টাকা লাগে ধর্মমতী শুক তার চাই।

ধনেশ্বর সাধু সে কথা শুনে চমকে উঠল—কে চায় এই ধর্মমতী শুক! নিশ্চয়ই কাজলরেখা। সাধু রাজকুমারকে শুকপাখি দিয়ে বিদায় দিল। রাজকুমার খুশী মনে নিজের রাজ্যে ফিরে চলল।

ঘরে ফিরে রাজপুত্র মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করতে বসল। কেমন করে পাওয়া যায় রানীর আর দাসীর পরিচয়।

মন্ত্রী বলল, 'আপনি যখন ছিলেন না তখন দু'জনকেই আমি রাজ্যের কাজকর্মের কথা জিজ্ঞেস করেছি। দেখেছি—রানীর বুদ্ধি নেই, কিন্তু দাসী খুব বুদ্ধিমতী।'

রাজপুত্র ভাবতে লাগল।

মন্ত্রী বলল, 'আপনি আর একটা পরীক্ষা করুন। আপনার বন্ধুদের খেতে নেমন্তন্ন করুন। দু'জনকেই রাঁধতে দিন, কে কেমন রাঁধে তাতেই জানতে পারবেন দু'জনের গুণ।'

মন্ত্রীর কথামত রান্নার ভার পড়ল দু'জনের ওপর। যে যেমন লোক—সে তেমন রাঁধল। নকল রানী রাঁধল—চালতার টক, টক-ঝাল আর মুখ কুটকুট-করা কচু শাক। আর দুঃখিনী কাজলরেখা রাঁধল পরমান্ন, পঞ্চাশ তরকারি— দুধ ক্ষীরের ছড়াছড়ি।

ছুঁচ-রাজা সব দেখল। তারপর আবার একটা পরীক্ষা করল। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন দাসী আর নকল রানীকে ডেকে বলল, 'আমার বন্ধুরা আসবে—যে যত সুন্দর করে পার আলপনা আঁক।'

নকল রানী আঁকল—কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, ধানের ছড়া, হাঁড়ি-পাতিল। আর কাজলরেখা আঁকল সকলের আগে বাপ-মায়ের চরণ, মঙ্গল কলস, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, আর কত দেবদেবী, বিদ্যাধর, কত নদ-নদী-পর্বত। শেষে আঁকল মন্দিরের মাঝখানে সেই মরা রাজকুমার। শুধু আঁকল না নিজেকে। আলপনা এঁকে কাজল ঘিয়ের বাতি জ্বেলে দিল।

নকল রানীর আলপনা দেখা সেরে সবাই অবাক হয়ে এসে দাঁড়াল কাজলের আলপনার সামনে। সবাই বুঝতে পারল—এ কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে না হয়ে যায় না।

তাই দেখে নকল রানী জ্বলতে লাগল আর কাজলরেখা ঘর বন্ধ করে মনের দুঃখে কাঁদতে বসল।

কান্না শুনে শুক পাখি বলল, 'কেঁদো না কাজল। তোমার দুঃখের দশ বছর কেটেছে—বাকী আরও দু' বছর। ধৈর্য ধর। তোমার দুঃখের শেষ একদিন হবেই।'

কিন্তু কোথায় দুঃখের শেষ! নকল রানীর অত্যাচাব বেড়ে গেল। সে অনেক রকম ষড়যন্ত্র করে ছুঁচ-রাজার মন বিষাক্ত কবে তুলল। মনের অশান্তিতে ছুঁচ-রাজা একদিন বিরক্ত হয়ে আদেশ দিলেন, 'যাও, দাসীকে বনবাসে দিয়ে এস।'

হায়, আবাব বনবাস! নৌকো চলল কাজলরেখাকে নিয়ে কত দেশ কত নদী পার হয়ে। কাজলরেখা চলল কাঁদতে কাঁদতে।

পথের মাঝখানে ছুঁচ-রাজার এক বন্ধু বলল, 'তোমার কান্না থামাও কন্যে। আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমি কাঞ্চনপুরের এক কোটিপতির ছেলে। চল আমার সঙ্গে—তোমার কোনও ভয় নেই।'

কাজল বলল, 'না। রাজকুমার আমাকে বনবাসে দিতে বলেছেন—বনবাসই দাও।'

এদিকে নৌকো গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। কিন্তু এমনি কপালের দোষ, সমুদ্রেও যেন চড়া পড়ে গেল। নৌকো চড়ায় বসে গেল।

তখন দাঁড়ি-মাঝিরা বলল, 'এই মেয়েটা পোড়াকপালী ডাইনী। ওকে এই চড়ায় রেখে পালাই চল।'

কাজলরেখাকে সেই চড়ায় নামিয়ে দিয়ে তারা চলে গেল। চড়ায় শুধু নলখাগড়ার বন। কাজলরেখা সেই নলখাগড়ার রস খেয়ে বেঁচে রইল।

একদিন খুব বড় একটা ঝড় উঠল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় কোথা থেকে ভেসে চড়ায় এসে ঠেকল এক সওদাগরের নৌকো। সকালে ঝড় যখন থামল, তখন নৌকো থেকে বের হয়ে এল সওদাগর রত্নেশ্বর সাধু—কাজলরেখার ভাই। ছোটবেলাতেই কাজলরেখার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি। তারপর বার বৎসর কেটে গেছে। ধনেশ্বর সাধু মারা গেছে—ছেলে রত্নেশ্বর এখন হয়েছে সওদাগর। রত্নেশ্বর দেখল—চরের উপরে অপরূপ এক সুন্দরী কন্যা। ভাইবোন কেউ কাউকে চিনতে পারল না। তবু সাধু রত্নেশ্বর ঘরে ফিরবার সময় দুঃখিনী কাজলরেখাকে চর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলল।

ঘরে ফিরে কাজলরেখা সব চিনতে পারল। চিনতে পারল বাপের ঘরের খুঁটিনাটি সব কিছু। বাপ-মা দুজনেই মারা গেছেন। তাঁদের কথা মনে করে কাজলরেখা মনের দুঃখে মাথা কুটে কুটে কাঁদতে লাগল।

রত্নেশ্বর শুধাল, 'কার কন্যা তুমি—কোথায় তোমার ঘর। তোমার পরিচয় বল।'

কাজল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার যে পরিচয়—আমি বলতে পারি না। বলা নিষেধ। ছুঁচ-রাজার দেশে আছে ধর্মমতী শুক—সে-ই' জানে আমার পরিচয়। তাকে যদি আনতে পার—তা হলেই জানতে পারবে সব।'

রত্নেশ্বর লোকলস্কর পাঠাল ছুঁচ-রাজার দেশে।

এদিকে ছুঁচ-রাজার তখন পাগল হতে বাকী। কাজলরেখাকে বনবাসে পাঠিয়ে তার দুঃখের সীমা নেই। নকল রানীর ব্যবহারে তার জীবন জ্বলে পুড়ে খাক্। এমন সময় শুক পাখির খোঁজে এল সওদাগর রত্নেশ্বরের লোকলস্কর। নকল রানী টাকার লোভে শুক পাখিটা কি-না-কি ভেবে বেচে দিল। রত্নেশ্বরের লোকলস্কর ফিরে চলল শুক পাখি নিয়ে। তাদের পিছনে পিছনে ছুঁচ-রাজাও চলল পাগলের মত।

তারপর সওদাগর রত্নেশ্বরের ঘরে একদিন যেন হাট বসে গেল। শুক পাখি কাজলরেখার দুঃখের কথা বলবে—সে কথা শুনবার জন্য কত লোক ছুটে এল। তারা জানত—কাজলরেখা জলপরী—সাধু রত্নেশ্বর তাঁকে সমুদ্র থেকে ধরে এনেছে। জলপরীর পরিচয় শুনবার জন্য দেশের লোক ভেঙে পড়ল। তাদের সকলের পিছনে বসে রইল ছুঁচ-রাজা।

সকলের সামনে সোনার খাঁচায় করে ধর্মমতী শুককে আনা হল। ধর্মমতী শুক তখন বলতে লাগল দুঃখিনী কাজলরেখার দুঃখের কাহিনী। বলল—কেমন করে কাজলরেখা ছুঁচ-রাজার প্রাণদান করেছে, কেমন করে কাঁকন দাসী তাকে ঠকিয়ে নিজে রানী হয়ে বসেছে। শেষকালে দিল ভাই আর বোনের পরিচয়। শুক বলল, 'আজ কাজলরেখার দুঃখের বারটি বছর শেষ হল।' এই বলে শুক স্বর্গের দিকে উড়ে চলে গেল।

রত্নেশ্বর ছুটে গিয়ে দিদির হাত মুঠা করে ধরল। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল।

তারপর ছুঁচ-রাজার সঙ্গে কাজলরেখার বিয়ে হয়ে গেল। দেশে ফিরে ছুঁচ-রাজা নকল রানী কাঁকন দাসীকে মাটিতে পুঁতে ফেলল।

॥ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' থেকে ॥



সূয্যি মামার বিয়ে

সে এক আদ্যিকালের কথা। সূয্যি ঠাকুরের ঘুম আর কিছুতে ভাঙে না। জগত ঘুটঘুট্টি অন্ধকার—আকাশ ভরে ঝরছে না জানি কোন শ্রাবণের ধারা। জনপ্রাণী পোক্-পাখালির দু চোখ প্রায় অন্ধ, হাত-পা বন্ধ। সূর্য ওঠে না—জগত হাসে না। সূয্যি মামার ঘুম ভাঙবে—তবে জগত হাসবে। ফুল ফুটবে—পাখি ডাকবে। কিন্তু সেদিন সব ঘোর ঘোর, থম্ থম্। কে জানে আকাশের কোনখানে ছেঁড়া মেঘের কাঁথা মুড়ি দিয়ে সূয্যি মামা ঘুমোয় তো ঘুমোয়। মর্ত্যের মানুষ-জন ডাক পেড়ে সাধাসাধি করে—'গা তোলো, গা তোলো সূর্যাই'—

কত স্তব স্তুতি খোসামোদ করে বলে—

"সূর্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য ওঠে আগুন বর্ণ॥
সূর্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য ওঠে রক্ত বর্ণ॥"

'গা তোলো—গা তোলো সূর্যাই।' সূয্যি ঠাকুরের ঘুম তবু ভাঙে না। নানা আয়োজন চলে ঘুম ভাঙাবার। বামুনের মেয়ে বড় বুদ্ধিমান—আগে ভাগে পৈতের সুতো কেটে রাখে চরখায়। মনে মনে বলে—ওঠ সূর্যাই বামুনের ঘরের কোণ ছুঁয়ে।

কাঁসারির মেয়ে বড় বুদ্ধিমান—সূর্য উঠলে পুজোয় বসবে, তাই সাত তাড়াতাড়ি করে রাখে পুজোর বাসন-সাজ। মনে মনে বলে—ওঠ সূর্যাই কাঁসারির ঘরের কোণ ছুঁয়ে।

দেখাদেখি মালীর মেয়ে মুনির মেয়ে ফুল তোলে—সন্ধ্যা-আহ্নিকের জোগাড় করে রাখে।

শুধু কলুর মেয়ের বড্ড রাগ—তার বুঝি সরষে শুকোয় না, তেল হয় না, ঘানি ঘোরে না। ফলে বুঝি পেট চলে না দুঃখী বাপের। ঘড়া উপুড় করে সিধে হুড় হুড় করে জল ঢালে সে কলসী কলসী—সূয্যি মামার মুখ ধোয়ার জল। বলে—"মুখ ধোও মুখ ধোও সূর্যাই। সূর্য ওঠ কলুর ঘরের কোণ ছুঁয়ে।"

মর্ত্যে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি—নানা তুক্‌তাক্। কিন্তু সূয্যি মামা সেই যে এক ভাবে ভোঁ হয়ে ঘুমোচ্ছে, সাড়া শব্দ নেই। ওদিকে স্বর্গে সূয্যি ঠাকুরের মা ডাকে গায়ে ঠাণ্ডা চন্দনের ছিটে দিয়ে—"গা তোলো—গা তোলো সূর্যাই।" কাঁসর বাজে—করতাল বাজে ঘন ঘন। অত বাজনাবাদ্যি হুট-চাপোটে শেষ পর্যন্ত আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল মামা।

মা এগিয়ে দিলে তেলের বাটি—স্নানের গামছা।

মামা স্নানে চলল দুধ সায়রের দিকে—সোনার বাটিতে অগুরু চন্দন—রূপোর বাটিতে তেল। কিন্তু সূয্যি মামা বড় আলাভোলা মানুষ। মামার গামছা গেল ভেসে—তেলের বাটি নিলে কাকে।

এদিকে স্বর্গে মর্ত্যে পুজোর আয়োজন—হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি। কী,—না সূয্যি মামা ঘুম ভেঙে উঠেছে। ধূপের গন্ধে স্বর্গমর্ত্য একাকার। কাঁসর বাজে—ডগর বাজে—ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং। কাঁদি কাঁদি কলা আর মণ মণ চাল, কত নৈবেদ্যের সারি। মামা একটু পেটুক। খাওয়ার আয়োজন দেখে ভারি খুশী। মামা পুজো নিতে বসল। ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে বামুনের মেয়ে অর্ঘ রচনা করে। কিসানের মেয়ে ছুটে আসে ভোগের খাঁটি দুধটুকু নিয়ে। গোয়ালার

মেয়ে ছুটে আসে ঘিয়ের ভাঁড় নিয়ে। গাছের পান সুপারি নিয়ে ছুটে আসে বারুই বাড়ির মেয়ে। হায়, সূর্য না উঠলে মেয়েদের বড় জ্বালা। ধানপান শুকোয় না, কাপড় কাঁথা শুকোয় না—শুকোয় না মাথার চুল। মর্ত্যের মেয়েরা ডালি ভরে ভরে সাজায় সুয্যি মামার ঘুষ।

পুজোর ভোগ খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে সুয্যি মামা উঠল এবার আকাশে—অগ্নিবর্ণ। জগতে ছড়িয়ে পড়লো অঙ্গের কিরণ।

তারপর আকাশ থেকে শুনতে পেলে বুঝি মর্ত্যের মিষ্টি সুর—কারা যেন গায় তার মঙ্গল গান। মামা একটু খোসামোদপ্রিয়। আসন টলল সুয্যি মামার—মর্ত্যের দিকে মুখ করে চলতে লাগল ধীরে ধীরে।

কিন্তু থমকে এসে দাঁড়াল স্বর্গের কিনারে—মস্ত এক নদীর ধারে। বড় বড় তুফান তার খরতর স্রোত। নদীর এপারে স্বর্গ—ওপারে মর্ত্যলোক। সেই নদীতে খেয়া দেয় স্বয়ং বিশ্বকর্মা। কিন্তু তার টিকির দেখাটিও নেই ধারে পাশে কোথাও।

সুয্যি মামা হাঁক পাড়তে লাগল, "বিশাই—বিশাই হে! মর্ত্যে যাব—খেয়া পার কর।"

বিশ্বকর্মা বড় কড়া। মামার কাছ থেকে আগে পারের কড়ি গুণে নিয়ে তবে উঠতে দিলে নৌকোয়, মামা গিয়ে নৌকোর মধ্যে জেঁকে বসল। বিশ্বকর্মা নৌকো বেয়ে চলল ওপারে মর্ত্যে।

মামা নৌকোয় বসে আছে—কিছুটা অন্যমনস্ক। বোধ কার মন পড়ে আছে মর্ত্যের মানুষের মঙ্গল গানে। আলাভোলা মানুষ—মিষ্টি কথায় তুষ্ট। সুয্যি মামার এই ভাবভঙ্গী দেখে বিশ্বকর্মা রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ বিরাট তুফানের মুখে একবার কাৎ করে দিলে নৌকোখানা। মামা আচম্বিতে গড়াগড়ি—মুখ দিয়ে বেরুল 'গেল গেল' রব। বিশ্বকর্মা নৌকো আবার সামনে নিলে। মাঝি তো নয়—স্বয়ং বিশ্বকর্মা।

সূয্যি মামা বললে, 'বুঝলাম বিশাই—তুমি দুপুরের ডাকাত।'

হাসতে হাসতে বিশাই সূয্যি মামাকে পৌঁছে দিলে মর্ত্যের তীরে। মামা তীরে উঠে তাকালে একবার চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে, তারপর যেদিক থেকে ভেসে আসছে মঙ্গলগানের সুর—সেই দিকে পা চালিয়ে দিলে।

সূয্যি ঠাকুর দেখা দিয়েছে জগত আলো করে—গাঁয়ে গাঁয়ে উঠেছে তার মঙ্গল গান। সূয্যি মামা এ গাঁয়ে যান—সে গাঁয়ে যান। ঘুরে ঘুরে গান শোনেন খুশী মনে। ঘুরতে ঘুরতে থমকে দাঁড়াল এসে ছোট্ট এক অচিন নদীর ধারে।

নদীর ওপারের দিকে চেয়ে সূয্যি মামার চোখে আর পলক পড়ে না। ওপারে এক কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। সে কোন্ অচিন গাঁয়ের দুঃখী। বামুনের মেয়ে। শাড়ির রঙে ওপার রঙীন—মলের রমঝমে বুঝি বাতাস নিঝ্ঝুম্। সূয্যি মামার সাধ হল—ওই মেয়ে সে বিয়ে করবে।

মামা নদী পার হল। কিন্তু নদী পার হয়ে সূয্যি মামা খুঁজে পায় না আর সেই কনক বরণ কন্যাকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে—বাড়ি বাড়ি খোঁজে। শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে সূয্যিমামা সন্ধ্যাবেলা ফিরে গেল ঘরে। মুখে কথা নেই, পেটে ক্ষিদে নেই—চোখে ঘুম নেই। সূয্যি মামার মন পড়ে রইল সেই অচিন নদীর ধারে—যেখানে দেখেছিল সেই কুঁচবরণ কন্যা যার মেঘবরণ চুল।

শেষ পর্যন্ত স্বর্গ থেকে ঘটক গেল সেই অচিন মেয়ের খোঁজে। ঘটক তো ঘটক-চূড়ামণি। অসাধ্যি তার কিছুই নেই। গাঁ ঘুরে ঘুরে, বাড়ি ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে খুঁজে বার করলে সেই কনকবরণ কন্যাকে। মেয়ের সন্ধান নিয়ে এল সূয্যি মামার বাড়িতে।

ছুটে এল পাড়াপড়শী—ছুটে এল সূয্যি ঠাকুরের মা। তারা শুধোলে, 'কি দেখলে—কি শুনলে বল ঘটক ঠাকুর।'

ঘটক বললে,

'হাত দেখলাম পাও দেখলাম দেখলাম দীঘল চুল।
প্রদীপের রোশনাইতে দেখলাম বধূর চন্দ্রমুখ।'

সূয্যি ঠাকুরের শুকনো মুখে হাসি ফুটল। স্বর্গের ঘটক-চূড়ামণির জয় জয়কার। মর্ত্যের অচিন মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে ঘটক-চূড়ামণি। নাম তার গৌরী। তার হাজার টাকা পণ।

সূয্যি মামার বিয়ে—নানা আয়োজন, নানা ধুমধাম। ঠিক হল শুভদিন শুভলগ্ন। 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল স্বর্গে। আলাভোলা মানুষ মামা—সবাই ডেকে ডেকে উপদেশ দেয়, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কি করবে না কববে। বিশেষ করে বাসর ঘরে। সেখানে জামাই ঠকানোর জন্য সবাই ওৎ পেতে আছে। মামা সব শোনে আর ভোলে।

ওদিকে মেয়ের বাড়িতে ধুমধামের আর অন্ত নেই। মেয়ের বিয়ের জোগাড়ে গৌরীর মা একশ' খান। কোথায় সাত সমুদ্র চুঁড়ে এসেছে কোন্ বণিকের ছেলে—গৌরীর মা তার কাছ থেকে কিনে আনে গৌরীর বিয়ের চন্দন। কোথায় কোন্ সুন্দর তাঁতির ছেলে নিয়ে যায় রাজকাপড়ের পসরা—গৌরীর মা তাকে ডেকে কাপড় কেনে। কোথায় কোন্ সুন্দর মালির ছেলে নিয়ে যায় গন্ধ ভুর্ভুর্ রঙীন ফুলের সাজি। তার কাছ থেকে গৌরীর মা কেনে ফুলের মুকুট—ফুলের কঙ্কন বাজু চন্দ্রহার। তারপর বিয়ের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসে—মেয়ের মায়ের এক চোখে নামে জলের ধারা, এক চোখে আনন্দ। জামাই তো নয়—দুঃখী বামুনের বাড়িতে স্বয়ং সূয্যি ঠাকুর।

বিয়ের দিন সূয্যি ঠাকুর এসে পৌঁছল। পাড়াপড়শীর হুড়োহুড়ি—উলু আর শঙ্খধ্বনি। দুঃখী বামুনের ঘর আলো। গৌরীর মা গৌরীকে বললে, 'যাও জামাইকে প্রণাম করে এস।'

তারপর জ্বলে ওঠে বিয়ের প্রদীপ—ঘরের কোণে হলুদ বরণ কাপড় পরে সেজে দাঁড়ায় কলা বৌ। উলু আর শঙ্খধ্বনিতে পাড়া

ঝম্‌ঝম গম্‌গম্। তিনটে কাঠের ওপর নতুন হাঁড়ি বসিয়ে খড়ের জ্বাল দিয়ে দিয়ে তৈরী হয় পরমান্ন। বিয়ের নানা আয়োজন।

আর চারদিকে শুভলক্ষণের ছড়াছড়ি। গৌরীর কী কপাল। সূয্যি হেন বর। দেখ—তাই আম গাছ নুয়ে পড়েছে ফলের ভারে, বাঁকা তেঁতুলে তেঁতুল গাছের পাতা আর দেখা যায় না। অতটুকুন নারকোল গাছ আর কলা গাছ—তাতে নেমেছে বড় বড় কাঁদি। গৌরীর মা দেখে আর চোখে জল মোছে। সূয্যি ঠাকুর মেয়ের পণ দিয়েছে হাজার টাকা। চোখের জল মুছতে মুছতে দুঃখিনী গৌরীর মা পণের টাকা আঁচলে বাঁধে।

ওদিকে বর-কনে তখন ছাঁদনা তলায় এসেছে। উঠল উলু আর শঙ্খের রোল।

পরের দিন গৌরী যাবে শ্বশুরবাড়ি। সূয্যি ঠাকুরের নৌকো বাঁধা আছে নদীর ঘাটে—ভাঙা নাও মাদারের বৈঠা। সেখানে বাদ্যি বাজনার রোল—শানাই ধরেছে করুণ সুরের তান। আর গৌরীর দুঃখী বাপের ঘর অন্ধকার। বাজনা-বাদ্যির লেশ সেখানে নেই—চোখে শুধু জল। পিসী কাঁদে পড়শী কাঁদে—মা-বাপের তো কথাই নেই।

গৌরী ঘোরে শুধু মায়ের পেছনে পেছনে—মাত্র বারো বছরের মেয়েটি। সেই সকাল থেকে মায়ের আঁচল চেপে ধরে আছে। মায়ের মন পোড়ে ভেতরে ভেতরে। হেঁসেল ঘুরে এসে কাঁদতে বসে—হায় কে খাবে আর এই বাসি পান্তা আর মচমচে পুঁটি মাছের ভাজা! গৌরী যে খেতে বড় ভালোবাসত। মায়ের মন বলে, 'নাই বা গেল গৌরী।'

কিন্তু সূয্যি ঠাকুর বসে আছে বাইরের ঘরে—হাসিখুশী। শুভক্ষণে বাড়ি ফেরার জন্য তৈরী। সেও আর বেশী দেরি নয়।

গৌরীর মা এবার ডাক পেড়ে কাঁদতে বসে ঃ হায়, কোন নিষ্ঠুর অতিথিকে থাকতে দিয়েছে সে বাইরের ঘরে—তার সাধের গৌরীকে সে আজ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! টাকা নয়—কড়ি নয় যে কৌটোয় লুকিয়ে রাখবে কুঁড়ে ঘরের কোথাও।

ওদিকে গৌরী তখন সেজে বেরিয়েছে শ্বশুরবাড়ি—চোখের জলে ভেসে গেছে চন্দনের ফোঁটাগুলি।

গৌরীর মা আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির ওপরে।

গৌরীর দুঃখী বাপ কাঁদে গামছা মুড়ি দিয়ে।

ছোট ভাইটি খেলার জিনিসগুলি নিয়ে কাঁদে ভেউ ভেউ করে।

শেষ বারের মত গৌরী ডুকরে উঠে বলে, 'মা গো! রাখবে না তোমার ঘরে?'

বাপ বলে, 'পরের ঘরের জন্য যে তোর জন্ম মা।'

মায়ের অবোধ মন বলে, 'হায়—কি কুক্ষণে নিয়েছিলাম সেই হাজার টাকা পণ।'

কাঁদতে কাঁদতে গৌরী চলল শ্বশুরবাড়ি।

দুঃখী বাপের ঘর অন্ধকার। পাড়া কাঁদে—পড়শী কাঁদে—কাঁদে মা-বাপ-ভাই।

গৌরী গিয়ে উঠল সুয্যি ঠাকুরের নৌকোয়। নৌকো ছেড়ে দিল। গৌরী কান পেতে শোনে মা-বাপ, ভাই-বোনের কান্না—দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে। হায়, পলকে পলকে দূরে চলে যাচ্ছে বাপের ঘর—বাপের গ্রাম। বারো বছরের ছোট্ট মেয়েটি তাকায় একবার ভয়ে ভয়ে সুয্যি ঠাকুরের মুখের দিকে—একবার মাঝিদের দিকে। নিষ্ঠুর মাঝিরা কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তাকে! কাঁদতে কাঁদতে সে মাঝিদের বললে, 'আস্তে আস্তে বাও মাঝি ভাই—আমার মা-বাপ, ভাই-বোনের কান্না একটু শুনি।'

নিষ্ঠুর মাঝিরা থামে না। ছপ্ ছপ করে পড়ে জোর বৈঠা। বাপের গাঁ পড়ে থাকে পেছনে, বাপ-মা, ভাই-বোনের কান্নার সুরও আর শোনা যায় না। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় কোথায়। গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে গৌরী।

সূয্যি ঠাকুর নানা কথা বলে তার কান্না থামাতে চায়—মন ভোলায় নানা মিষ্টি কথায়। কিন্তু গৌরীর মন শান্ত হয় না। কোথায় কোন অচিন দেশে যাচ্ছে সে—কি আছে সেখানে কিছুই জানে না। ভয় করে তার। অবোধ মেয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'তোমার দেশে গিয়ে সূর্যাই কাপড়ের দুঃখ পাব—সেখানে কি তাঁতি আছে?'

সূয্যি ঠাকুর বললে, 'নগর জুড়ে তোমার জন্য তাঁতি বসিয়ে দেব।'

অবোধ মেয়ে আবার শুধোয়, 'আমার শাঁখা? সিঁদুর? মাথার তেল? সব যে ছিল আমার বাপের দেশে। সে দেশ বড় ভালো।'

সূয্যি ঠাকুর প্রবোধ দিয়ে বললে, 'আমি নগর জুড়ে শাঁখারী বসাব, বসাব কলু আর সিঁদুরআলা বেনে। ভয় কি তোমার?'

গৌরী বললে, 'খাব কি? চাল পাব কোথায়?'

সূয্যি ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'দেশ জুড়ে আমি কিসান বসাব।'

এবার আসল দুঃখের কথা বলে গৌরী। কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, 'তোমার দেশে যাব সূর্যাই—মা বলব কাকে?'

সূয্যি ঠাকুর বললে, 'ঘরে আছে আমার মা—মা বলবে তাঁকে।'

গৌরীর কান্না থামে না। বললে, 'তোমার দেশে যাব সূর্যাই—বাবা বলব কাকে?'

সূয্যি ঠাকুর বললে, 'কেন, ঘরে আছে আমার বাবা—বাবা ডাকবে তাঁকে।'

গৌরীর মন তবু ভরে না। বললে, 'ভাই বলব কাকে? বোন বলব কাকে?'

সূয্যি ঠাকুর বললে, 'কেন, ঘরে আছে আমার ভাই-বোন—তাদের ডাকবে নিজের ভাই-বোন বলে।'

গৌরীর সে এক নতুন জীবন—বাপ-মা, ভাই-বোনের নতুন আর এক সংসার। বাংলা দেশের ছোট্ট মেয়েটি চলল নতুন সেই সংসার করতে; মন কি তবু প্রবোধ মানে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তারপর আস্তে আস্তে কান্নার সে সুর দূরে হাওয়ায় কোথায় মিলিয়ে গেল।

॥ প্রাচীন ছড়া ॥

